রিহলাহ ইবনে বতুতা

[ইবনে বতুতার বিশ্বভ্রমণের আদ্যোপান্ত বিবরণ]

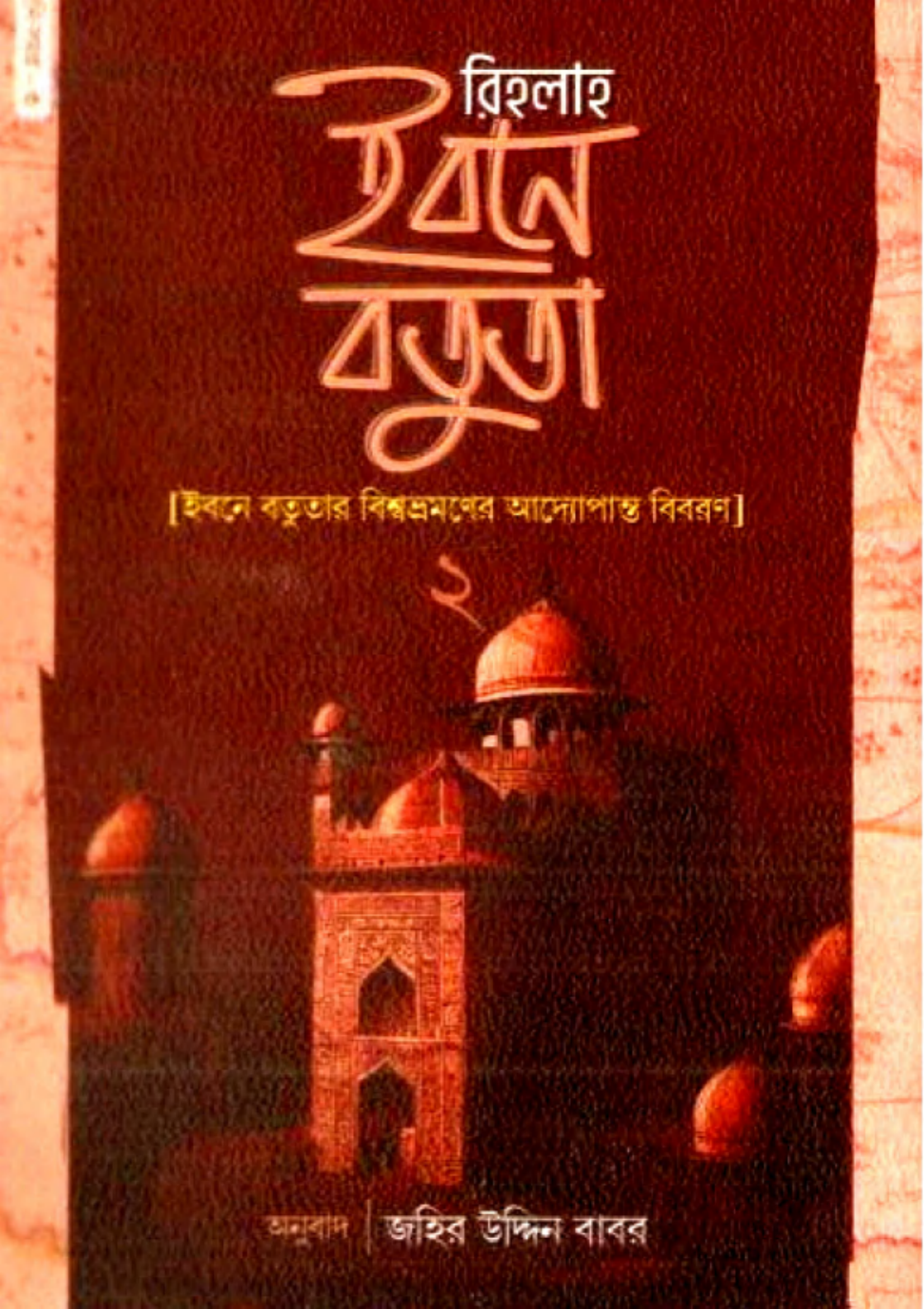

অনুবাদ | জহির উদ্দিন বাবর

রিহলাহ ইবনে বতুতা

[বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতার
বিশ্বভ্রমণের বিস্ময়কর বিবরণ]

Edited by @FR

[২য় খণ্ড]

(تحفة النظار في غرائب
الأمصار وعجائب الأسفار)

জহির উদ্দিন বাবর
অনূদিত

মাকতাবাতুল আযহার

সূচি

দ্বিতীয় খণ্ড সম্পর্কে কিছু প্রাককথা ১৫
সিন্ধের সীমানায় প্রবেশ
ডাকের সুব্যবস্থা, বিস্ময়কর প্রাণী গণ্ডার, সিন্ধের কয়েকটি শহর ১৯
পর্যায়ক্রমে দ্রুতগামী বাহনের দ্বারা বার্তা পাঠানোর ব্যবস্থা ১৯
বিদেশি ও মুসাফিরদের সঙ্গে সুলতান মুহাম্মাদ শাহ তুঘলকের সদাচার ২১
বিস্ময়কর প্রাণী গন্ডার ও তা শিকার ২২
সেহওয়ান শহর ২৪
সিন্ধের একটি প্রাচীন বন্দর 'লাহারি' ২৬
ভাক্কার নাকি সাক্কার? ২৯
উছ ২৯
মুলতান ৩০
সেনাদের কর্তব্য, বীরত্ব ও বাহাদুরির প্রকাশ ৩২
শাহানশাহ মুহাম্মাদ তুঘলকের চাকরির জন্য বিশিষ্টজনদের ভিড় ৩২
খাবারের আদব, দস্তরখানের প্রশস্ততা, বাহারি ধরনের খাবার ৩৩
মুলতান থেকে দিল্লির দিকে রওনা ৩৪
আম, আমের আচার, কাঁঠাল, জাম ইত্যাদির আলোচনা ৩৫
তরকারি, শস্য, মটরশুঁটি, চীনাবাদাম, মসুর ডাল ইত্যাদি ৩৬
হিন্দু ডাকাতদের সঙ্গে মোকাবেলা ও এর দাস্তান ৩৭
আজুদাহান অর্থাৎ পাকপাট্টান
হযরত শায়খ ফরিদুদ্দিন আত্তার রহ.-এর শহর ৩৮
সতিদাহ প্রথার হৃদয়বিদারক দৃশ্য, আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম ৩৯
সরসা শহরে প্রবেশ ৪১
হানসি শহর, সেখানকার সৌন্দর্য, প্রাসাদ ও উঁচু প্রাচীর ৪১
মাসুদাবাদ ও পালেমে আমাদের প্রবেশ ৪২
দিল্লি ৪৩
মসজিদে কুওয়াতুল ইসলাম ও কুতুব মিনার ৪৫
শামসি হাউজ, আলায়ি হাউজ, বিনোদন কেন্দ্র,

সেখানকার মসজিদ ও নামায ৪৬
দিল্লিতে আল্লাহওয়ালাদের মাজারসমূহ ৪৭

দিল্লিতে মুসলিম শাসন
দিল্লির শাসক ও সুলতানরা ৫১
কুতুবুদ্দিন আইবেক ৫২
সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ ৫৩
সুলতান রুকনুদ্দিন ৫৪
সুলতানা রাজিয়া ৫৫
সুলতান নাসিরুদ্দিন ৫৬
সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন ৫৬
সুলতান মুইজুদ্দিন কায়কোবাদ ৫৯
জালালুদ্দিন ফিরোজ খিলজি ৬১
সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি ৬২
সুলতান শিহাবুদ্দিন খিলজি ৬৫
সুলতান কুতুবুদ্দিন খিলজি ৬৬
খসরু খান ৭০
সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুঘলক ৭৪

আবুল মুজাহিদ সুলতান ইবনে মুহাম্মাদ শাহ তুঘলক ৭৮
দৃশ্যপটের দুটি দিক ৭৯
প্রথম দিক [দান-অনুদান, দয়া-অনুগ্রহ, মানবিকতা, দরিদ্রবান্ধব ও সহমর্মিতার বিস্ময়কর ও বিরল উদাহরণসমূহ] ৭৯
মহান বাদশাহ ৮০
কাসারে সুলতানি : হাজার স্তম্ভের একটি দৃষ্টিনন্দন মহল ৮১
বাদশাহর দরবার ৮২
ঈদ উৎসব ৮৫
কুরবানির ঈদের দিন বাদশাহ কীভাবে কুরবানি করেন? ৮৬
ঈদের দিনে রাজমহল ৮৬
সফর থেকে ফেরা ৮৮
শাহি দস্তরখান ৮৯
তুঘলকের দান-খয়রাতের দাস্তান ৯০
কথায় কথায় এক বিদেশিকে সম্পদে ভরপুর করে দিলেন ৯১
আব্বাসী খলিফার দূতের সঙ্গে সদাচারের বিস্ময়কর উদাহরণ ৯২

মিষ্টভাষী এক বক্তাকে বিপুল পরিমাণ উপহার প্রদান ৯৩
আব্বাসী খেলাফতের প্রতি ভক্তি ৯৪
প্রতি পঙ্‌ক্তির জন্য এক হাজার আশরাফির অতুলনীয় অনুদান ৯৫
না দেখেই এক বিশিষ্টজনকে ১০ হাজার রুপি পাঠিয়ে দিলেন ৯৫
কাজী মাজদুদ্দিনের জন্য দশ হাজার রুপি পাঠিয়ে দিলেন ৯৫
এক বিদেশি বক্তাকে চল্লিশ হাজার দিনার অনুদান ৯৫
ইরানের এক শাহজাদার সঙ্গে সদাচার ৯৬
খলিফাতুল মুসলিমিনের ছেলে দিল্লিতে ৯৭
এক গরিব দেশের আমির ১০২
খাজা জাহাঁর মেয়েদের বিয়ে ১০৭
দীনদার বাদশাহ ১০৮
জামাতে নামায না পড়লে বাদশাহর ধার্যকৃত শাস্তি ১০৮

দৃশ্যপটের দ্বিতীয় দিক ১১১
রক্তপিপাসু নিষ্ঠুর বাদশাহ ১১২
সৎ মা ও ভাইকে হত্যা ১১২
ফকির ও বাদশাহর লড়াই ১১৩
দুই সিন্ধি আলেমকে হত্যা ১১৬
শায়খজাদা হুদকে হত্যা ১১৮
নিহত ব্যক্তির ছেলেদের হত্যা, হুকুম তামিলকারী কাজিকে হত্যা ১২০
উড়িয়ে দেওয়া হলো কাজি সাহেবের গর্দান ১২১
শায়খ আলী হায়দারকে হত্যা ১২১
ফারগানার সর্দারকে হত্যা ১২২
সওদাগরের শিশু সন্তানকে হত্যা ১২২
দিল্লি শহর কীভাবে বিরান হলো? ১২৩
গিয়াসুদ্দিন বাহাদুরের অবাধ্যতা ১২৫

তুঘলকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ ও আন্দোলন ১২৬
তুঘলকের ভাতিজা ১২৬
কিসলু খানের বিদ্রোহ ১২৭
হিমালয়ে অভিযান ১২৯
শরিফ জালালুদ্দিনের বিদ্রোহ ১৩০
লাহোরের গভর্নরের বিদ্রোহ ১৩২
মালিক হোশেঙ্গের বিদ্রোহ ১৩২

ইবনে বতুতার শ্যালক সাইয়েদ ইবরাহিমের বিদ্রোহ ও তাকে হত্যা ১৩৩
আইনুল মালিকের বিদ্রোহ ১৩৫
আলী শাহের দুর্ভাগ্য ১৪২
বিদ্রোহীর পদোন্নতি, আমির বখত শারফুল মুলকের কাহিনি ১৪৩

ইবনে বতুতা ও তুঘলক ১৪৫
বাদশাহর পক্ষ থেকে মুসাফিরের সম্মান ও মূল্যায়ন ১৪৬
বাদশাহর মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং সম্মান প্রদর্শন ১৪৭
শাহি মেহমান হিসেবে ১৪৯
বাদশাহর আগমন ১৫৩
শিকারের জন্য বাদশাহর বিদায় ১৬২
আমার পক্ষ থেকে বাদশাহকে একটি আকর্ষণীয় উপহার ১৬৫
আমার নতুন দায়িত্ব
কুতুবুদ্দিন খিলজির সমাধিস্থল তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা ১৬৫
আমরুহা ও হাযারা সফর ১৭০
আমার ওপর রাজদরবারের অভিযোগ ১৭২
চীনের দূত হিসেবে আমার নিযুক্তি ১৭৩
'বায়ানা' শহরে আমাদের অবস্থান ১৭৫
'কুল' এ আগমন, হিন্দুদের সঙ্গে জিহাদ, বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা ১৭৫
কালিনদী ও কানৌজ ১৮০
হানুল, উজিরপুর, বাজালাসা ও মুরিতে প্রবেশ ১৮১
আলাপুর শহর ও সেখানকার শাসকের পরিণতি ১৮১
গোয়ালিয়ারে এক হিন্দুকে আমি প্রাণে রক্ষা করি ১৮২
দাহহার: সত্য ভালোবাসার কাহিনি, একই কবরে প্রেমিক-প্রেমিকা ১৮৩
দৌলতাবাদ : সেখানকার সৌন্দর্য, বাজার ও মারাঠা নারীরা ১৮৪
নজরবারে আগমন, শরিয়তের দণ্ড কায়েম ১৮৬
কাম্বাইতে অবস্থান, একটি বিস্ময়কর দাস্তান ১৮৭
গাবি ও কান্দাহারে আগমন ১৮৭
পশ্চিম ঘাট ১৮৯
সামুদ্রিক সফরের সূচনা, বিভিন্ন স্থানে অবতরণ ১৮৯
বায়রাম দ্বীপে প্রবেশ এবং সেখানে ভ্রমণ ১৮৯
কাফেরবেশী এক মুমিনের সঙ্গে সাক্ষাতের বিস্ময়কর দাস্তান ১৯০
হিনওয়ার, হিন্দুস্তানে শাফেয়ীদের কেন্দ্র ১৯১

হানুরের সুলতানের গুণ ও সৌন্দর্য ১৯২

মুলাইবার ১৯৪
মুলাইবারের রাজার ইসলাম গ্রহণ, আরবিদের সম্মান ও প্রভাব ১৯৪
মুলাইবারের হিন্দু ও মুসলিমদের সঙ্গে তার আচরণ ১৯৪
মুলাইবারের শহর ও স্থানগুলো, আবি সারুর ও মানজারুর ইত্যাদি ১৯৭
মসজিদের অসম্মানে খোদায়ি সাজা, হিন্দুদের দুর্গতি ১৯৮

কালিকোট
আরব ব্যবসায়ীদের উত্থান কাহিনি ২০০
মালদ্বীপ : দুনিয়ার এক বিস্ময় ২০০

চীন সফর ২০২
চীনা জাহাজ, সামুদ্রিক সফর, জাহাজ ডুবে যাওয়া, ফিরে আসা ২০২
চীনা জাহাজের নির্মাণপদ্ধতি ও ভেতরের অবস্থা ২০২
ভয়ংকর তুফানে পড়ে জাহাজ ধ্বংস হয়ে যাওয়া ২০৩
আমার জাহাজ ও আমার সাথীদের হৃদয়বিদারক পরিণতি ২০৪
কুচিনের একটি শহর কাওলামে মুসলিম ব্যবসায়ীদের সম্পদ ২০৫
গোয়ার জিহাদে আমার অংশগ্রহণ, মুসলিমদের জয় ২০৬
আমার দাসী, সাথীসঙ্গী ও দাসদের পরিণতি ২০৯

মালদ্বীপ ২১০
মুসাফিরদের আদর-আপ্যায়ন ২১০
নারিকেলের রশি ও পাত্র ইত্যাদি ২১১
মালদ্বীপের নারীরা এবং তাদের চালচলন ২১২
মালদ্বীপের অধিবাসীদের ইসলাম গ্রহণ ২১৩
মালদ্বীপের রানি ও তার অবস্থা ২১৪
মালদ্বীপের রাত-দিন ২১৫
মারাঠি বাঁদির বিপরীতে মালদ্বীপের বাঁদি প্রত্যাখ্যান করলাম ২১৭
দিল্লি থেকে মালদ্বীপে বেশি আভিজাত্য ২১৭
যে কারো সঙ্গে হোক বিয়ে হতে হবে ২১৮
কাজির পদ, একটির পর দ্বিতীয়টি, অতঃপর অব্যাহত বিয়ে ২১৯
ইবনে বতুতার পক্ষ থেকে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র ২২১
মালদ্বীপ থেকে বিদায়, রাস্তায় আরো দুটি বিয়ে ২২২

লঙ্কা ২২৩
রাবনের দেশে প্রবেশ ২২৩
আমার ওপর সায়লান রাজার যত অনুগ্রহ ও দান ২১৩
একজন মর্দে মুমিনের অবদান ২২৫
কানকার, ইয়াকুত পাথরের প্রান্তর, বিস্ময়কর সব অভিজ্ঞতা ২২৫

শরণ দ্বীপের পাহাড়
উড়ন্ত জোঁক, গুহা, কদম শরিফ ২২৭
মা'বারের দিকে রওনা
সেখানকার বাদশাহ, অধিবাসী ও জলদস্যুদের কবলে পড়া ২২৯
মা'বারের সুলতানরা এবং তাদের শান-শওকত ২৩০
মালদ্বীপে হামলার প্ররোচনা ২৩১
সুলতান গিয়াসুদ্দিনের দুঃখজনক ইন্তেকাল ২৩২
মা'বারের নতুন বাদশাহ সুলতান নাসিরুদ্দিন ২৩৩
জলদস্যুদের হামলা, সবকিছু লুট ২৩৪
আরেক দফা মালদ্বীপে, নবজাতক ছেলে ২৩৫

বাংলায় সফর
বাংলার শহর, লোকজন, সাধারণ অবস্থা এবং নিত্যপণ্যের স্বল্পমূল্য ২৩৬
অসম্ভব কম দাম, আমি একটি বাঁদি কিনি ২৩৬
বাংলার প্রথম শহর চাটগামে প্রবেশ ২৩৬
কামরূপ ও সেখানকার বৈশিষ্ট্য ২৩৭
কারামাতের অধিকারী বুযুর্গ শায়খ জালালুদ্দিন তাবরেজি ২৩৭
সোনারগাঁও : পূর্ব বাংলার প্রাচীন রাজধানী ২৩৯

'জাভা' সফর ২৪০
জাভা দ্বীপ সুমাত্রা অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়ায় অবতরণ ২৪১
সুলতানের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য ২৪৩
বাদশাহর ভাতিজা ও একটি প্রেমের গল্প ২৪৫

সিয়াম ও কম্বোডিয়া ২৪৬
মাল জভার বাদশাহ ২৪৭
বিশ্বস্ততার হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য ২৪৭
প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ ২৪৮

চীন দেশে ২৪৯
চীনামাটি ও এর পাত্রের কথা ২৪৯
চীনের মোরগ-মুরগি ও এর শারীরিক গঠন ২৫০
চীনবাসীর ধর্ম ও শাসনপদ্ধতি ২৫০
চীনে রেশমের উৎপাদন ২৫১
চীনে ধাতব মুদ্রার পরিবর্তে নোটের প্রচলন ২৫১
চীনে পাথরের কয়লার ব্যবহার ২৫১
চীনের লোকদের শিল্প ও কারুকাজ ২৫২
মুসাফিরদের জন্য সুযোগ-সুবিধা ২৫২
চীনে মুসাফিরদের নিরাপত্তাব্যবস্থা ২৫৩
চীনের শহর ২৫৪
প্রথম শহর যাইতুন ২৫৪
ক্যান্টন সফর ২৫৫
দুশ বছর বয়সী এক বিস্ময়কর ফকিরের সাক্ষাৎ ২৫৬
কানজানফু শহরে ২৫৭
এক দেশীয়র সঙ্গে চীনে সাক্ষাৎ ২৫৮
খানসা শহর ২৫৯
পিকিং শহরে প্রবেশ ২৬২
খাকান: চীনের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ২৬২
চীনে বাঁশের বিস্ময়কর শিল্প ২৬২
খাকান : চীনের আকর্ষণীয় ও বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব ২৬৪
চীন থেকে জাওয়া এরপর কালিকোট ২৬৬
আরেকবার জাওয়ায় ফিরে আসা ২৬৬

নতুন গন্তব্যের পথে যাত্রা

আরব, ইরান, শাম ২৬৮
মাস্কাট ও অন্যান্য স্থান ভ্রমণ ২৬৯
আরেকবার দামেশকে ২৬৯
আরব দেশগুলো সফর ২৭০
জন্মভূমির দিকে ২৭১
সারদানিয়া ও তিলমিসস্তানে অবতরণ ২৭২
ফেজ শহরে ২৭৩
যত গুণ আছে সবই তিনি এককভাবে ধারণ করেন ২৭৫

আমিরুল মুমিনিনের ইলমের প্রতি ঝোঁক
এবং অস্বাভাবিক মাযহাবপ্রীতি ২৭৫
আমিরুল মুমিনিনের দান-দক্ষিণার দাস্তান ২৭৬

নিজ দেশ ২৭৭
আন্দালুস ও জাবালুত তারিক ২৭৭
মুসলিমদের জিব্রাল্টার দখল এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলো ২৭৮
আন্দালুসের শহর মালাকা ২৮০

আন্দালুসের শহর : ঘারনাতা ও মারাকাশ ২৮১

সুদান সফর ২৮৩
আইওয়ালাতান : সুদানের প্রথম শহর ২৮৪
সুদানের নারীদের সীমাহীন স্বাধীনতা ২৮৬

মালি ২৮৮
সুদানের বাদশাহর অসন্তোষ ২৯৩
সুদানিদের অভ্যাস ও প্রথা ২৯৪
সুদানের মানুষখেকো অধিবাসীরা ২৯৫

টিম্বুকটু ২৯৭
বার্বার জাতির বিচিত্র সব বৈশিষ্ট্য ২৯৯
দেশের প্রতি অনুরাগ ৩০২
মুসাফির ফিরে আসে নিজ দেশে ৩০২

ইবনে বতুতার সফরনামা দ্বিতীয় খণ্ড সম্পর্কে কিছু প্রাককথা

প্রিয় পাঠক! ইতিমধ্যে আপনারা ইবনে বতুতার সফরনামার প্রথম অংশ পড়েছেন। এবার দ্বিতীয় অংশ পড়তে যাচ্ছেন। এই দ্বিতীয় খণ্ডটি সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আলোকপাতের প্রয়োজন অনুভব করছি। যাতে সামনে যে আলোচনা আসবে সেটার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ধারণা লাভ হয়।

প্রথম অংশে সব ইসলামি রাষ্ট্র ও আরব দেশ ভ্রমণের কথা উঠে এসেছে। এর মধ্যে পবিত্র হেজাযের (মক্কা-মদিনা) কথাও এসেছে। দ্বিতীয় অংশ হিন্দুস্তান (পাকিস্তানসহ), সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এলাকা, প্রতিবেশী দেশগুলো, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া ও চীন এসব দেশের সফরের বিবরণ সংবলিত।

চীন, ইন্দোনেশিয়া ও অন্যান্য দেশ সফরের ইচ্ছা তিনি করেছিলেন। তবে তাঁর বেশির ভাগ সময় কেটেছে হিন্দুস্তানে। সৌভাগ্য হোক কিংবা দুর্ভাগ্য, এই পর্যটককে বাদশাহ মুহাম্মাদ তুঘলকের অধীনে থাকতে হয়। তিনি তুঘলকের কাছাকাছি থাকতেন। চলতে হতো পুলসিরাতে চলার মতো করে। সামান্য পা পিছলে গেলে অতল গহ্বরে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল সর্বক্ষণ।

ইবনে বতুতা এই সময়টি অত্যন্ত আরাম-আয়েশের মধ্যে কাটান। সব ধরনের প্রাচুর্য ছিল তাঁর। ধনসম্পদের কোনো কমতি ছিল না। জমিদারিও পেয়েছিলেন। উপহার-উপঢৌকনের ধারা অব্যাহত ছিল। বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অনেক ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগও ছিল। কিন্তু এসব নেয়ামতের পাশাপাশি এই আশঙ্কাও ছিল, না জানি করে কোথায় কোন কারণে বাদশাহর অপছন্দের দৃষ্টি পড়ে যায়! আর এমনটা হলে মৃত্যু ছাড়া কোনো পথ খোলা নেই। কেননা তুঘলকের ক্রোধ থেকে বাঁচানোর মতো কেউ ছিল না।

তাঁর লিখনির ধরন দেখে অনুমান করা যায়, ইবনে বতুতার মন এই দেশের সঙ্গে লেগে গিয়েছিল। এখানকার পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা তাঁর পছন্দ হয়েছিল। তুঘলকের আকারে তলোয়ার যদি তাঁর মাথার ওপর ঝুলন্ত না থাকত তাহলে সম্ভবত তিনি চিরদিনের জন্য এখানে থেকে যেতেন। কিন্তু এ ধরনের প্রতাপশালী বাদশাহর অধীনে থাকা, যেখানে প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা তাড়া করে, তা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তিনি বারবার চলে যাওয়ার অনুমতি চান। কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান হতে থাকে। কেননা তুঘলকের দরবারের সঙ্গে একবার সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়ার পর নিয়মতান্ত্রিক অনুমতি না নিয়ে চলে যাওয়া মৃত্যুকে ডেকে আনার নামান্তর। কিন্তু সন্ত্রাস, অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও অবস্থা এই ছিল—চীনের দূতিয়ালি থেকে ফিরে আসার পর ইবনে বতুতা আরেকবার দিল্লিতে গিয়ে বিদায়ের অনুমতি প্রার্থনা করবেন বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু তুঘলকের কথা মনে পড়ে গেল আর হিম্মত হলো না, তিনি ফিরে এলেন।

প্রথম খণ্ড পড়ার দ্বারাও এটা স্পষ্ট হয়েছে, স্ত্রী ও বাঁদির প্রতি ইবনে বতুতার বিশেষ ঝোঁক ছিল। যেখানেই মন লেগে যেত বিয়ে না করে ফিরতেন না। যখন পকেট ভারী হতো তখন বাঁদিও কিনতেন এবং আমোদ-ফূর্তিতে লিপ্ত হতেন। হিন্দুস্তানে এসেও তিনি কয়েকটি বিয়ে করেন। বেশ কয়েকটি বাঁদিও কিনেন। ঘটনাক্রমে যেসব বাঁদি দ্বারা তিনি উপকৃত হন তারা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর। এই বিশাল দেশের প্রতিটি অঞ্চলের আবহাওয়া ভিন্ন ভিন্ন। এ হিসেবে সেখানকার মানুষের গঠনপ্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন। তিনি মারাঠা ও মালদ্বীপের নারীদের আলোচনা বেশি করেছেন। জায়গায় জায়গায় তাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন।

ইবনে বতুতার সফরনামার এই খণ্ডের আলোচনায় আরেকটি বিষয় দেখা যাবে। সেটা হচ্ছে, প্রয়োজনের মুহূর্তে তিনি কূটকৌশলও অবলম্বন করেছেন। যেমনটা মালদ্বীপের ঘটনায় লক্ষ করা যায়।

ইবনে বতুতার ভ্রমণকাহিনির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, তাকে একজন ভবঘুরে টাইপের মানুষ বলে মনে হবে। বড় বড় আশঙ্কাও তাঁর ইচ্ছায় প্রতিবন্ধক হতে পারেনি। কোথাও তিনি ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেছেন। কোথাও হিংস্রতার শিকার হতে হতে রক্ষা পেয়েছেন। কোথাও ডাকাত ও দস্যুদের শিকার হয়েছেন, কিন্তু বেঁচে গেছেন। এতকিছু সত্ত্বেও তাঁর ভ্রমণের

ইচ্ছায় একটুও ছেদ পড়েনি। তিনি কখনো পিছু হটেননি। বরং সব প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে সামনে অগ্রসর হয়েছেন। এই গুণটি তাঁর মধ্যে পুরো মাত্রায় না থাকলে আজ ইতিহাসে তিনি এত বড় মর্যাদাপূর্ণ স্তর অর্জন করতে পারতেন না।

ইবনে বতুতার আরেকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা কোনোভাবেই উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। সেটা হলো, সামান্য থেকে সামান্য কোনো বিষয়ও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। এমন বিষয়ও তিনি বর্ণনা করেছেন সাধারণত যার দিকে কেউ ভ্রুক্ষেপ করে না।

এই খণ্ডটি পড়ে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে, মোটা অংকের অর্থও তাঁর কাছে এসেছে, আবার চলেও গেছে। তাঁর মধ্যে বড় একটি গুণ হলো, অর্থের জন্য লোভাতুর ছিলেন না। অর্থের বিনিময়ে ঈমান-আমান বিক্রি করে দেননি।

আমার ধারণা, এই দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রথম খণ্ডের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় হবে। সেটা ভাষা ও বর্ণনার কারণে যেমন—তেমনি ঘটনার বৈচিত্র্য হিসেবেও।

রইস আহমাদ জাফরি

টেগোর পার্ক, লাহোর

সিন্ধের সীমানায় প্রবেশ

ডাকের সুব্যবস্থা, বিস্ময়কর প্রাণী গণ্ডার, সিন্ধের কয়েকটি শহর

৭৩২ হিজরির মহররম মাসের ১ তারিখ আমরা সিন্ধু[১] নদ অতিক্রম করলাম। এই নদকে 'পাঞ্জ আব'ও[২] বলা হয়। এই নদটিকে বিশ্বের অন্যতম বড় নদ হিসেবে গণ্য করা হয়। গরমকালে এই নদ উত্তাল হয়ে ওঠে। মিশরের চাষাবাদের বিষয়টি যেমন নির্ভর করে নীলনদের জোয়ারের ওপর, তেমনি এখানকার অধিবাসীরাও এই নদের জোয়ারের দ্বারা বাঁচে। এখান থেকে মুসলিম বাদশাহ সুলতান মুহাম্মাদ শাহের[৩] হিন্দ ও সিন্ধের কর্তৃত্বাধীন এলাকা শুরু হয়েছে। আমরা যখন এখানে পৌঁছি তখন বাদশাহর লিপিকার আমাদের কাছে আসেন। আমাদের আসার খবর তিনি তাৎক্ষণিকভাবে কুতবুল মুলুক মুলতানের শাসকের কাছে পৌঁছে দেন। সিন্ধের গভর্নর বাদশাহর পক্ষ থেকে তখন সার্তিজে[৪] ছিলেন। তিনি বাদশাহর ক্রীতদাস এবং সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। যখন আমরা সিন্ধে পৌঁছি তখন শহরের গভর্নর সেবিস্তানে[৫] অবস্থান করছিলেন।

পর্যায়ক্রমে দ্রুতগামী বাহনের দ্বারা বার্তা পাঠানোর ব্যবস্থা

সেবিস্তান থেকে মুলতান পর্যন্ত দশ দিনের পথ। আর মুলতান থেকে রাজধানী দিল্লি পঞ্চাশ দিনের পথ। যে লিপিকার বাদশাহ পর্যন্ত সংবাদ পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত তিনি ডাক ব্যবস্থাপনার দ্বারা মাত্র পাঁচ দিনে

---

[১] সিন্ধের পুরোনো নাম ছিল সিন্ধু, যা আর্যরা এখানে আসার পর রেখেছিল। এর অর্থ হচ্ছে নদ।

[২] পাঞ্জাব দ্বারাও উদ্দেশ্য সিন্ধু নদ। কেননা এখানে এসে পাঁচটি নদীর সম্মিলন ঘটেছে। সুতরাং মুঘল আমলের আগে 'পাঞ্জাব' দ্বারা সিন্ধ নদ বোঝাত।

[৩] সুলতান মুহাম্মাদ শাহ উদ্দেশ্য।

[৪] তিনি জাতিগতভাবে তুর্কমেন ছিলেন। বাদশাহ তার ওপর এতো দয়াপরবশ হন যে, নিজের মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দেন। সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতিও তিনি ছিলেন। ৭৪৮ হিজরিতে দাকান নামক স্থানে যুদ্ধে তিনি মারা যান।

[৫] বর্তমান সাহওয়ান শহর।

বার্তা পৌঁছে দিত। ডাক বিভাগকে এই দেশে 'বারিদ'[১] বলে। ডাক দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটি অশ্বারোহী ডাক, অন্যটি পায়ে হাঁটা ডাক। ঘোড়ার ডাককে 'আওলাক' বলা হয়। প্রতি চার ক্রোশ অন্তর অন্তর ঘোড়া পরিবর্তন হয়। এই ঘোড়া বাদশাহর পক্ষ থেকে নিয়োজিত থাকে। পায়ে হাঁটা ডাকের ব্যবস্থাপনা হলো—এক মাইলে যাকে তারা 'কিরওয়াহ' বলে; রানারদের জন্য তিনটি চৌকি থাকে। এই চৌকিকে তারা 'দাওহ'[২] বলে। পৌনে এক মাইল দূরত্বে এক একটি গ্রাম। গ্রামের বাইরে রানারদের জন্য ছাউনি বানানো আছে। প্রত্যেক ছাউনিতে রানাররা প্রস্তুত হয়ে বসে থাকে। প্রত্যেক রানারের হাতে দুই গজ লম্বা একটি লাঠি থাকে। লাঠির মাথায় পিতলের ঘুন্টি বাঁধা থাকে।

রানারের এক হাতে থাকত চিঠি আর অন্য হাতে লাঠি। পুরো শক্তি নিয়ে তারা দৌড়ায়। এই ঘুন্টির আওয়াজ শুনে অন্য রানার প্রস্তুত হয়ে যায়। আসার সঙ্গে সঙ্গে ডাক নিয়ে সে দৌড়ায়। এভাবে পত্র যেখানে পৌঁছানোর সেখানে দ্রুত পৌঁছে যায়। এই ডাক ঘোড়ার ডাকের চেয়েও দ্রুতগামী। কখনো কখনো ডাকের মাধ্যমে খুরাসানের তাজা ও দুর্লভ ফলমূলও বাদশাহর কাছে পৌঁছানো হয়। কখনো কখনো ভয়ংকর অপরাধীকে স্ট্রেচারে বসিয়ে ডাকপিয়নরা এক চৌকি থেকে আরেক চৌকিতে নিয়ে যায়। দৌলতাবাদে বাদশাহর জন্য গঙ্গা নদের পানি, যা হিন্দুদের যাত্রার স্থান; এই ডাকের মাধ্যমেই নিয়ে যাওয়া হয়। দৌলতাবাদ ছিল গঙ্গা নদ থেকে চল্লিশ দিনের দূরত্বে। লিপিকাররা প্রত্যেক মুসাফিরের বিস্তারিত বিবরণ লিখত। তাদের (মুসাফিরের) গঠনপ্রকৃতি, পোশাকআশাক, খাদেম, সাথীসঙ্গী, প্রাণী, তাদের গতিবিধি কোনো কিছুই জানানো থেকে বাদ যেত না। সবকিছু বিস্তারিত লিখে পাঠাত।[৩]

---

[১] আধুনিক আরবি ভাষায়ও ডাক বোঝাতে 'বারিদ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

[২] এটি একটি পরিভাষা। ধাওয়া করা।

[৩] আজ থেকে সাত আটশ বছর আগে ছিল না কোনো তার বার্তার ব্যবস্থা। টেলিফোন, টেলিভিশন, রেডিও কিছুই ছিল না। কিন্তু হিন্দুস্তানের সুলতান সময়ের চাহিদার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। দ্রুত সংবাদ পাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি যে ব্যবস্থাপনা আঞ্জাম দেন এর কোনো দৃষ্টান্ত নেই। এই সুব্যবস্থাপনার ফলাফল হলো, একটি গাছের পাতা পড়লেও সুলতান তা জেনে যেতেন। যে বার্তা তাকে পৌঁছানো দরকার কিংবা অন্যকে তার যে বার্তা পৌঁছানো দরকার তা চোখের পলকে পৌঁছে যেত। ওই যুগে পাসপোর্ট, ভিসা এবং ভিনদেশি লোকদের নজরদারি করার এতো বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ছিল না, যা আজকাল রয়েছে। কিন্তু এটা মানতে হবে, সেই সময়ের যে পদক্ষেপ তা আজকের আধুনিক যুগের

বিদেশি ও মুসাফিরদের সঙ্গে সুলতান মুহাম্মাদ শাহ তুঘলকের সদাচার

যখন কোনো মুসাফির সিন্ধের রাজধানী মুলতানে পৌঁছত তখন যতক্ষণ না বাদশাহর পক্ষ থেকে রওনা হওয়ার নির্দেশ না আসত, তার উপযুক্ত মেহমানদারি না হতো এবং তার জন্য উপঢৌকন নির্ধারণ না হতো, ততক্ষণ তাকে সেখানেই অবস্থান করতে হতো। প্রত্যেক মুসাফিরের আপ্যায়ন হতো তার সাজসরঞ্জাম ও চলাফেরার ওপর ভিত্তি করে।

কেননা তাদের বংশ পরিচয় ও বাপ-দাদার অবস্থা সম্পর্কে তো জানাশোনা নেই। হিন্দুস্তানের বাদশাহ আবুল মুজাহিদ মুহাম্মাদ শাহ তুঘলক ভিনদেশিদের সঙ্গে অত্যন্ত ভালোবাসা ও হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করতেন। তাদেরকে বিশেষ বিশেষ পদে অধিষ্ঠিত করতেন। এজন্য তাঁর ঘনিষ্ঠভাজন, প্রহরী, উযির, কাজি ও জামাতা বেশির ভাগ ছিল ভিনদেশি। তাঁর নির্দেশ ছিল—ভিনদেশিদের প্রতি সবসময় সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। এজন্য ভিনদেশিরা 'আজিজ' (প্রিয়) নামে পরিচিতি লাভ করে। যিনি বাদশাহকে সালাম করতে যেতেন তার জন্য হাদিয়াও নিয়ে যেতেন। আর সবার এটা জানা ছিল, বাদশাহ এর কয়েক গুণ বেশি উপঢৌকন দেবেন। এজন্য সিন্ধের কোনো কোনো ব্যবসায়ী এটাকে ব্যবসা বানিয়ে নেন। তারা হাজারও লোককে ধার হিসেবে দিনার দিতেন। এছাড়া খাদেম, ঘোড়া ও বাহনের ব্যবস্থা করে দিতেন। আর নিজেরা চাকরের মতো তাদের খেদমতের জন্য হাজির থাকতেন। যখন তারা বাদশাহর দরবার থেকে ভরপুর উপহার নিয়ে ফিরতেন তখন সেই ধার পরিশোধ করে দিতেন। এভাবে ব্যবসায়ীরা অনেক লাভবান হতো।

আমি যখন সিন্ধে পৌঁছলাম তখন এই পদ্ধতিই অবলম্বন করলাম। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ঘোড়া, উট ও গোলাম কিনলাম বাকিতে। ইরাকের তিকরিতের[১] বাসিন্দা মুহাম্মাদ দুরি নামে এক সওদাগর ছিলেন। গজনি শহরে তার কাছ থেকে ত্রিশটি ঘোড়া এবং একটি উট কিনলাম। উটের ওপর

চেয়েও বেশি কামিয়াব ও ফলপ্রসূ ছিল।

[১] বাগদাদের কাছে একটি স্থানের নাম।

তিরের ফলা বোঝাই করা ছিল। কেননা এ ধরনের জিনিসপত্রই বাদশাহকে হাদিয়া দেওয়া হতো। যখন তিনি খুরাসান থেকে ফিরে এলেন তখন সেই ঋণ ফেরত চাইলেন। তিনি অনেক লাভবান হলেন। বরং আমার দ্বারা অনেক বড় ব্যবসায়ী হয়ে গেলেন। আলেপ্পো শহরে কয়েক বছর পর এই ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। সেখানকার কাফেররা[১] আমার গায়ের কাপড় পর্যন্ত ছিনিয়ে নেয়, কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে একটা কথা পর্যন্ত বলেননি।

বিস্ময়কর প্রাণী গন্ডার ও তা শিকার

আমরা সিন্ধু নদ পেরিয়ে একটি নলখাগড়ার জঙ্গলে ঢুকলাম। এর ভেতর দিয়ে রাস্তা অতিবাহিত হয়েছে। সেখানে আমরা গন্ডার দেখতে পেলাম। কালো ও মোটা আকৃতির একটি প্রাণী, যার মাথা অনেক বড়। তবে কোনোটার মাথা বড় আবার কোনোটার ছোট। এই প্রাণীটি হাতির চেয়ে ছোট। তবে এর মাথা হাতির মাথার কয়েক গুণ বড়। আর দুই চোখের মধ্যখানে কপালের ওপর একটি শিং থাকে। যার দৈর্ঘ্য তিন হাত এবং প্রস্থ এক বিঘত পরিমাণ। যখন এই গন্ডার জঙ্গল থেকে বের হলো তখন একজন আরোহী এর সামনে পড়ে গেল। তখন গন্ডার শিং দিয়ে আরোহীর রানে আঘাত করল এবং সে জঙ্গলে হারিয়ে গেল। পরে আমরা আর তার কোনো সন্ধান পাইনি। একই রাস্তায় আসরের পর একদিন আবারও গন্ডার দেখি। তখন গন্ডারটি ঘাস খাচ্ছিল। আমরা এটি শিকার করতে চাইলাম। কিন্তু পালিয়ে গেল। আমরা আরেক দফা গন্ডার দেখি। তখন বাদশাহর বহরের সঙ্গে ছিলাম। বাঁশঝাড়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। বাদশাহ হাতির ওপর বসা ছিলেন। আমিও একটি হাতির ওপর বসা ছিলাম। বাদশাহর সঙ্গীরা গন্ডারটি ঘিরে ধরে এবং শিকার করে। পরে এর মাথা কেটে ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়।[২]

---

[১] ক্রুসেডারদের (ক্রুশের জন্য লড়াইকারী) কোনো কোনো গোষ্ঠী শামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।

[২] এই প্রাণী বিভিন্ন দেশে পাওয়া যায়। নেপালে প্রচুর পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম, বার্মা ও আফ্রিকাতেও পাওয়া যায়। বিভিন্ন শহরের চিড়িয়াখানায়ও এই প্রাণীটি প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়। এই প্রাণীটির ব্যাপারে, বিশেষ করে এর আঘাতের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে নানা ধরনের কথা প্রচলিত, যার কোনো ভিত্তি নেই।

দুই মঞ্জিল চলার পর আমরা 'জানানি'[১] নামক শহরে পৌঁছি। এটি বিস্তৃত ও সুন্দর একটি শহর, যা সিন্ধু নদের তীরে অবস্থিত। শহরটি খুবই মনোরম। এই শহরে 'সামিরা'[২] সম্প্রদায়ের লোকদের বসবাস ছিল। প্রাচীনকাল থেকে তারা এখানে বসবাস করে আসছে। ঐতিহাসিকরা বলেন, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সময়কালে সিন্ধু বিজয় হলে এই সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই শহরে বসবাস শুরু করেন। শায়খ রুকনুদ্দিন বিন শায়খ শামসুদ্দিন[৩] বিন বাহাউল হক কুরাইশি মুলতানি আমাকে জানিয়েছেন, তার পরদাদা মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম সিন্ধু বিজয়ী ওই বাহিনীতে ছিলেন, যে বাহিনী হাজ্জাজ ইরাক থেকে পাঠিয়েছিলেন। ওই ব্যক্তি এই দেশে থেকে যান, এরপর তার বংশধর বাড়তে থাকে।[৪] এই রুকনুদ্দিন ওই ব্যক্তি যার ব্যাপারে শায়খ বুরহানুদ্দিন আ'রাজ আমাকে আলেকজান্দ্রিয়ায় বলেছিলেন, আপনি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। সামুরা সম্প্রদায়ের লোক কারো সঙ্গে খাবার খেতো না। তারা যখন খেতো তখন কেউ দেখতে পেত না। তারা তাদের সম্প্রদায় ছাড়া কারো সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কও স্থাপন করত না। ওই সময় এই সম্প্রদায়ের সরদার ছিলেন 'দানার' নামে এক ব্যক্তি। তার কথা সামনে বর্ণনা করব।

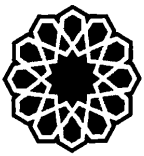

[১] প্রাচীন কিতাবাদিতে এই শহরের কথা কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবত উচ্চারণের ভুলের কারণে এর আকৃতি এমনভাবে পাল্টে যায় যে, তা চেনা মুশকিল হয়ে গেছে।

[২] সম্ভবত এই লোকদের বর্তমানে 'সোমরদ' বলা হয়। এই সম্প্রদায়কে এখনো সিন্ধে একটি সম্মানিত সম্প্রদায় বলে মনে করা হয়।

[৩] এটি ইবনে বতুতার ভাষ্য। তার আসল নাম শামসুদ্দিন নয়, সদরুদ্দিন।

[৪] ঐতিহাসিক গ্রন্থ দ্বারা এই দাবির সত্যতা পাওয়া যায় না। তবে এই বংশের একজন বিশ্বস্ত মানুষের বর্ণনা একদম ভ্রুক্ষেপ না করার মতোও নয়।

সেহওয়ান শহর

রতন, জাম ও নারের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ

জিনানি শহর থেকে অগ্রসর হয়ে আমরা সেহওয়ান[১] শহরে পৌঁছি। এটি একটি বড় শহর। মরুভূমি এলাকায় অবস্থিত। সেখানে বাবলা গাছ ছাড়া আর কোনো গাছ নেই। নদীর তীরবর্তী এলাকা ছাড়া কোথাও তরমুজ বা অন্য কোনো শস্য উৎপন্ন হয় না। এই শহরের লোকেরা মটরদানা ও সরগহাম নামের এক ধরনের রুটি খায়। এই শহরে অনেক মাছ পাওয়া যায়। মহিষের দুধেরও প্রাচুর্য রয়েছে। এই শহরের লোকেরা গিরগিটি খায়। এটা অনেকটা মাছের মতো। কিন্তু তাতে প্রাণ থাকে না। বালু খুঁড়ে তা বের করতে হয়। এগুলোর পেট ছিঁড়ে জাফরানের হলুদ ভরে দেওয়া হয়। এই প্রাণীগুলো খেতে দেখে আমার ঘৃণা লাগে। আমি কখনো এগুলো খাইনি।

আমরা যখন এই শহরে পৌঁছি তখন প্রচণ্ড গরম। আমার সাথীসঙ্গীরা খালি গায়ে থাকতেন। একটি বড় রুমাল পানিতে ভিজিয়ে লুঙ্গির পরিবর্তে বেঁধে নিতেন। আরেকটি কাঁধে ঝুলাতেন। কিছুক্ষণ পর যখন এটি শুকিয়ে যেত তখন আবার ভেজাতেন। এভাবে চলতে থাকত। এই শহরের খতিব ছিলেন শাইবানি। তিনি আমাকে খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর একটি পরোয়ানা দেখান, যা তার দাদা খতিব হওয়ার সময় পেয়েছিলেন। এই পরোয়ানা তার বংশধরদের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসছে। সেই পরোয়ানায় লেখা রয়েছে, هذا امر به عبد الله امير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز بفلان এর তারিখ লেখা আছে ৯৯ হিজরি। ওপরে লেখা রয়েছে, الحمد لله وحده। খতিব বলেন, এই বাক্যগুলো খোদ খলিফার হাতে লেখা। এই শহরে শায়খ মুহাম্মাদ বাগদাদি নামে একজন বয়স্ক মানুষের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমাকে বলা হয়েছে, তার বয়স একশ চল্লিশের বেশি।

---

[১] সিওস্তান দ্বারা উদ্দেশ্য সিন্ধের একটি শহর সেহওয়ান, যা করাচি থেকে প্রায় দুশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। সেখানে শাহবাজ কলন্দরের খানকা, যেখানে জনসাধারণ যিয়ারত করতে যায়। মানচার লেক এর কাছেই। বর্ষাকালে এই লেকের দৈর্ঘ্য বিশ মাইল এবং প্রস্থ দশ মাইল হয়ে যায়। এটি পর্যটন ও শিকারের জন্য একটি উৎকৃষ্ট জায়গা। পাকিস্তান সরকার এটাকে বিদেশি পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করছে।

খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহকে[১] যখন হালাকু খান বিন চেঙ্গিস খান হত্যা করেন, তিনি তখন বাগদাদে ছিলেন। এত বয়স সত্ত্বেও তিনি সুস্থ সবল ছিলেন। ভালোমতো চলাফেরা করতে পারতেন।

এই শহরে সামিরা সম্প্রদায়ের সরদার দানার থাকতেন, যার আলোচনা আগে করে এসেছি। কায়সারে রোমের আমিরও এই শহরে থাকতেন। উভয়ের বাদশাহর কর্মচারী ছিলেন। তাদের পাশে আঠারো শ বাহনের জমায়েত থাকত। রতন নামে এক হিন্দু লোকও এই শহরে থাকতেন। সেই লোক হিসাব-কিতাব বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তিনি কোনো আমিরের মাধ্যমে বাদশাহ পর্যন্ত পৌঁছে যান। বাদশাহ তাকে মূল্যায়ন করেন এবং তাকে সেখানকার গভর্নর বানিয়ে দেন। তাকে এমন মর্যাদা দান করেন যা সাধারণত বড় বড় আমিরদের দেওয়া হয়। অনেক বড় এলাকার জায়গিরও তার নামে বরাদ্দ করেন।[২]

যখন তিনি নিজ শহরে পৌঁছলেন তখন দানার ও কায়সার একজন হিন্দু লোকের আনুগত্য করতে বাধ্য হন। এতে তারা তাকে হত্যার ব্যাপারে পরামর্শ করেন। তিনি আসার কয়েক দিন পর তাকে বলা হলো, আপনি বাইরে বের হয়ে নিজের এলাকা পরিদর্শন করুন। আমরাও আপনার সঙ্গে থাকব। এই হিন্দু ব্যক্তি তাদের সঙ্গে বের হলেন। রাতের বেলা হঠাৎ তারা হিংস্র প্রাণী এসেছে বলে রব তোলে এবং তাকে হত্যা করে। পরে তারা শহরে ফিরে এসে রাজকোষ লুট করে, যেখানে ছিল ১২ লাখ দিনার। দশ হাজার হিন্দি দিনার দ্বারা এক লাখ দিনার হতো। হিন্দি দিনার ছিল মাগরেবি দিনারের আড়াই গুণ। পরবর্তী সময়ে দানারকে[৩] গভর্নর নির্ধারণ করা হয়।

---

[১] আব্বাসী বংশের সর্বশেষ খলিফা, যাকে ইবনে আকলামির বিশ্বাসঘাতকতা, নাসিরুদ্দিন তুসির ষড়যন্ত্র এবং ক্ষমতার লোভ হালাকু খানের সহজ শিকারে পরিণত করে। শেখ সাদী বাগদাদের পতন এবং মুসতাসিম বিল্লাহর ওপর শোকগাথা রচনা করেছেন। এর শুরুটা হয়েছে এভাবে,

آسماں را حق بود گر خوں ببارد بر زمین

بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین

[২] এর দ্বারা অনুমান করা যায়, মুহাম্মাদ তুঘলক কী ধরনের উদার ও কোমল প্রকৃতির ছিলেন। তার দৃষ্টিতে হিন্দু ও মুসলমান ছিল সমান। তিনি রতনকে এমন মর্যাদা দান করেন, যা মুসলিম আমিরদের জন্য ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

[৩] এই সামিয়াহ বংশের উৎস হলো 'জাম' বংশ থেকে। পরবর্তী সময়ে এটা ভুলে প্রচলিত হয়ে যায়। সুমরা ও সামিয়াহ উভয়ের সিন্ধের প্রাচীন ও বড় বংশ। জাতীয় ও বংশগতভাবে তারা ছিল রাজপুত। যেমন 'জাম সাহেব লাস বিলাহ' ও 'জাম সাহেব নাওয়ানগির' একজন হিন্দু একজন মুসলিম, উভয়ে

তিনি নিজের নামের সঙ্গে মুলকে ফিরোজ উপাধি ধারণ করেন এবং সব রাজকোষ সেনাদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। পরে দানারের অন্তরে ভয় দেখা দেয়। কেননা তার দেশ ও গোত্র ছিল দূরে। তিনি তার সাথীসঙ্গীদের নিয়ে নিজের গোত্রের কাছে চলে যান। আর বাকি সেনারা কায়সার রোমিকে তাদের প্রধান নিযুক্ত করে।

এই মর্মান্তিক সংবাদ দ্রুত মুলতানে ইমাদুল মুলকের কাছে পৌঁছে যায়। তিনি বাহিনী প্রস্তুত করে স্থল ও জল উভয় পথে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। কায়সারও এই খবর শুনে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হন। যখন তারা পরাজিত হয়ে যায় তখন শহরে দুর্গবন্দি হয়ে পড়ে। সারতিজ ক্ষেপণাস্ত্র বসিয়ে অবরোধ আরো জোরদার করা হয়। চল্লিশ দিন পর কায়সার নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। কিন্তু যখন কায়সার ও তার বাহিনী নিরাপত্তার ওয়াদা পেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে তখন সারতিজ তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। তাদের সহায়-সম্পত্তি সব লুটে নেন এবং তাদের সবাইকে হত্যা করেন। প্রতিদিন কারো না কারো গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হতো। কাউকে তলোয়ার দ্বারা দুই টুকরো করা হতো। জীবিত অবস্থায় কারো গায়ের চামড়া টেনে তোলা হতো। সেই চামড়ায় খড় ঢুকিয়ে শহরের প্রাচীরে ঝুলিয়ে রাখা হতো। বেশির ভাগের এই পরিণতি হয়। তাদের লাশ ঝুলে থাকতে দেখে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত এবং ভয় লাগত। তাদের ঘরবাড়ি ভেঙে শহরের মাঝখানে স্তূপ আকারে রাখা হয়। এই ঘটনার পরপরই আমি সেই শহরে পৌঁছি এবং একটি বড় মাদরাসায় অবস্থান করি। মাদরাসার ছাদে ঘুমাতাম। সেখান থেকে ঝুলিয়ে রাখা এসব লাশ দেখতে পেতাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন এই লাশ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতাম তখন মন খারাপ হয়ে যেত। অবশেষে সেই মাদরাসা ছেড়ে দিই।

সিন্ধের একটি প্রাচীন বন্দর 'লাহারি'

এক অজানা শহরের ধ্বংসস্তূপ, এটা কি 'দেবাল' ছিল?

হেরাতের কাজি আলাউল মুলক ফসিহুদ্দিন খুরাসানি একজন খ্যাতিমান মানুষ ছিলেন। বাদশাহ তাকে লাহারির প্রশাসক নিযুক্ত করেন। তিনিও

একই বংশের।—রইস আহমাদ জাফরি।

সারতিজের সাহায্যার্থে নিজের বাহিনী নিয়ে আসেন। তার আসবাবপত্র বহন করতে ১৫টি বড় নৌকার প্রয়োজন পড়ে। এগুলো তিনি সিন্ধু নদ দিয়ে নিজের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। আমি তার সঙ্গে লাহারি যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলাম। কাজি আলাউল মুলকের কাছে বড় নৌকা ছিল, যাকে 'আহাওরা' বলা হয়। এর অর্ধেক অংশ সিঁড়ি বানিয়ে উঁচু করা হয় এবং কাঠ দিয়ে বসার জায়গা বানানো হয়। কাজি সেখানে বসতেন এবং তার ডানে-বামে, সামনে চাকর-বাকর থাকত। চল্লিশজন মাল্লা এই নৌকা চালাত। আহাওরার পাশে আরো চারটি ছোট নৌকা ছিল। দুটি থাকত ডান দিকে আর দুটি বাম দিকে। সেগুলো ছিল গভর্নরের ড্রাম, নাকাড়া, ট্রাম্পেট ও গায়কদের বহনের জন্য। আশপাশের দুই নৌকায় গায়কেরা বসা থাকত। যখন নৌকা চলত বাদ্যযন্ত্র সহকারে সকাল থেকে নিয়ে দুপুর পর্যন্ত গানের আসর চলত। যখন খাবারের সময় হতো সব নৌকা এক জায়গায় জড়ো হতো। দস্তরখানা বিছিয়ে দেওয়া হতো। যতক্ষণ আমির আলাউল মুলক খানা খেতেন এই লোকেরা গান বাজাতে থাকত। পরে তারা খাবার খেয়ে নিজ নিজ নৌকায় চলে যেত। যখন রাত হতো নৌকা তীরের কাছে ভিড়িয়ে রাখা হতো এবং শুকনা স্থানে তাঁবু স্থাপন করা হতো। আমির আলাউল মুলক সেখানে রাতযাপন করতেন। যখন পুরো বাহিনী রাতের খাবার সম্পন্ন করত এবং ইশার নামায থেকে ফারেগ হতো তখন চৌকিদাররা পালাক্রমে আসত। যখন একজন চৌকিদার নিজের পালা শেষ করত তখন সে চিৎকার করে বলত—হে ভাইয়েরা! এই পরিমাণ রাত অতিবাহিত হয়েছে। যখন সকাল হয়ে যেত তখন আবার গানবাদ্য শুরু হতো।

ফজরের নামায সেরে খাওয়া-দাওয়া হতো। এরপর নৌকা চলত। আমির যখন দরবারে যেতে চাইতেন নৌকায় চড়ে বসতেন। আর স্থলপথে যাওয়ার ইচ্ছা করলে সবার আগে থাকত বংশীবাদকেরা। এরপর প্রহরীরা। তাদের সামনে থাকত ছয়টি ঘোড়া। এসব ঘোড়া বোঝাই করা থাকত ঢোল-তবলা ও বাদ্যযন্ত্রে। যখন কোনো গ্রামে পৌঁছতেন অথবা কোনো উঁচু জায়গায় পৌঁছতেন তখন ঢোল-তবলা বাজানো হতো। যখন দিনের বেলা খাবারের সময় হতো তখন সবাই দাঁড়িয়ে যেত। আমিও আমির আলাউল মুলকের সঙ্গে পাঁচ দিনে লাহারি পৌঁছি। এই মনোরম শহরটি সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। কাছেই সিন্ধু নদ গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে। এটি একটি বড়

বন্দরনগরী। ইয়েমেন ও পারস্যের জাহাজ এবং ব্যবসায়ীর সংখ্যা অনেক। এজন্য এই শহরটি অনেক ধনী। এর আয়ও অনেক।

আলাউল মুলক আমাকে বলেছেন, এই বন্দরের আয় আট লাখ[১] দিনার। আমির আলাউল মুলক এখান থেকে ২০ ভাগ পান। এই হিসাবেই বাদশাহ তার অধীনস্থ প্রশাসকদের মধ্যে এলাকা ভাগ করে দেন। একদিন আমি আলাউল মুলকের সঙ্গে এলাকায় ঘুরতে বের হলাম। শহর থেকে সাত ক্রোশ দূরে একটি ময়দান আছে, যাকে 'টারনা' বলা হয়। সেখানে অগণিত মানুষ ও প্রাণীর ভয়ংকর মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে কিংবা ভাঙাচুরা অবস্থায় পড়ে আছে। এছাড়া ধ্বংসস্তূপ হিসেবে পড়ে আছে ইট-পাথর। প্রাচীর ও ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষও রয়েছে। সেখানে পাথরের একটি ঘর আবিষ্কার করলাম। সেই ঘরে পাথরের তৈরি একটি চেয়ার। তাতে বসা একজন মানুষের মূর্তি। এই লোকটির মাথা কিছুটা লম্বা। আর মুখ একদিকে বাঁকানো। দুই হাত কোমরে ধরে রাখা। বিভিন্ন স্থানে দুর্গন্ধযুক্ত পানি রয়েছে। দেয়ালে হিন্দি ভাষার লেখা রয়েছে।

আমির আলাউল মুলক বলেছেন, এই দেশের ঐতিহাসিকদের ধারণা এই শহরটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। আর ধ্বংসস্তূপে যে মূর্তিটি সেটা বাদশাহর মূর্তি। এজন্য আজো সেই ঘরটি 'রাজঘর' হিসেবে পরিচিত। দেয়ালের শিলালিপি দ্বারা অনুমান করা যায়, প্রায় এক হাজার বছর আগে এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আমি আমির আলাউল মুলকের কাছে পাঁচ দিন ছিলাম। তিনি আমাকে অনেক খাতির-যত্ন করেন। আমার জন্য সফরের পাথেয়ও যোগান দেন।

---

[১] ইবনে বতুতার সময়কালে এই জায়গাটি সিন্ধের সবচেয়ে বড় ও সমৃদ্ধশালী বন্দর ছিল। আইনে আকবরিতে আবুল ফযলও এটার কথা আলোচনা করেছেন। সমুদ্র তীরবর্তী হওয়ার কারণে এর আয়ও ছিল অনেক বেশি। এখন এটি করাচি জেলার একটি ছোট্ট গ্রাম। কোনো কোনো ঐতিহাসিক প্রাচীন নিদর্শন দেখে এটাকে বিখ্যাত ঐতিহাসিক শহর দেবাল বলেছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, দেবালের স্থানটি এখনো চিহ্নিত হয়নি। কেউ কেউ এই জায়গাটিকে দেবাল বলে অভিহিত করেন। আবার কারো কারো মতে মানুরা দ্বীপ (করাচি) হলো দেবাল। তবে আধুনিক গবেষকরা এ ব্যাপারে একমত যে, করাচি থেকে কয়েক মাইল দূরে ভামবুর নামক শহর, যা খননকাজ করতে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে এবং যা একদম সমুদ্রের তীরবর্তী, সেটাই দেবাল। আমি সেখানে গিয়েছি।–রইস আহমাদ জাফরি।

ভাক্কার নাকি সাক্কার?

একটি প্রাচীন, শানদার ও মনোরম শহর

লাহারি থেকে আমি ভাক্কারের দিকে রওনা করলাম। এটি অনেক সুন্দর একটি শহর।[১] সিন্ধু নদের একটি শাখা এর মধ্যখান দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই শাখা নদীর মাঝখানে একটি সুন্দর মুসাফিরখানা[২] আছে। সেখানে সবাই খাওয়ার সুযোগ পায়। এটা নির্মাণ করেন কিসলু খান। এখানে ইমাম আবদুল্লাহ হানাফী, শহরের কাজি আবু হানিফা ও শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ সিরাজির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। শায়খ শামসুদ্দিনের বয়স তার বর্ণনা অনুযায়ী একশ বিশ বছর।

উছ

একটি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক শহর পরিদর্শন

ভাক্কার থেকে উছে[৩] এলাম। এই শহর[৪] সিন্ধু নদের তীরে অবস্থিত। এটি অনেক বড় একটি শহর। বাজার অনেক উন্নত। বড় বড় প্রাসাদ রয়েছে। ওই সময় শহরের প্রশাসক ছিলেন সাইয়েদ জালালুদ্দিন। যিনি বীরত্ব ও

---

[১] রাদাড়ি ও সাক্কারের মাঝখানে সিন্ধু নদের মাঝখানে যে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, সেটাই ভাক্কার। ইবনে বতুতা এটাকে 'বকার' লিখেছেন। কিন্তু ইবনে বতুতা ভাক্কার নামের যে শহরের কথা আলোচনা করেছেন সেটা ওই স্থানে অবস্থিত যেখানে বর্তমানে সাক্কার রয়েছে। এখানে 'তারিখে মাসুমি' খ্যাত মীর মাসুম ভাক্কারি সাহেবের কবর রয়েছে। রাদাড়ি পুরোনো কোনো শহর নয়। এটি প্রতিষ্ঠা হয় ১২৯৭ হিজরিতে।

বিষয় হলো, ইবনে বতুতার মতে ভাক্কার ও সাক্কার দ্বারা একই শহর উদ্দেশ্য। এর প্রমাণ হলো, সিন্ধু নদের একটি শাখা শহরের মধ্যখান দিয়ে প্রবাহিত হওয়াই বলে দেয় এটা সাক্কার।

[২] খানকাহে খাজা খিজির।

দক্ষিণ দিকে যে *'সাদাওভিলা'* নামে আরেকটি দ্বীপ রয়েছে, এটি হিন্দুদের একটি পবিত্র প্রাচীন স্থান। এখানে একটি মন্দিরও রয়েছে।

আবুল ফযলের মতে, ভাক্কার সেটাই যা আরবিদের বসবাসের শহর মানসুরা ছিল। তার মতে, সিন্ধের কাছে হায়দারাবাদের নাসিরপুর জেলায় মনসুরাবাদ অবস্থিত।

[৩] ইবনে বতুতা এটাকে 'মাদিনা উজা' অর্থাৎ উছ শহর বলেছেন।

[৪] এটি অনেক প্রাচীন শহর। ইতিহাসে এর অনেক আলোচনা রয়েছে। মুলতান থেকে সত্তর মাইল দূরত্বে পাঞ্জ নদের তীরে (সাবেক বাহাওয়ালপুরের রাজধানী) অবস্থিত।

আগে পাঞ্জাবের পাঁচটি নদী এবং সিন্ধু নদ উছের কাছে গিয়ে মিলিত হয়েছিল। বর্তমানে এই সম্মিলন ঘটেছে চল্লিশ মাইল দূরে মাটনকোটে।

উছের গুরুত্ব এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, সুলতান নাসিরুদ্দিন কাবাছার যুগে এটি সিন্ধের রাজধানী ছিল।

হযরত সাইয়েদ জালালুদ্দিন বুখারী ও হযরত মাখদুম জাহানে জাহাঁগাশতের মাজার এখানে রয়েছে।

অনুকম্পার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বেচারা পরবর্তী সময়ে ঘোড়া থেকে পড়ে মারা যান। তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। আমরা একসঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি। দিল্লিতেও তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। বাদশাহ যখন দৌলতাবাদের দিকে তাশরিফ নিয়ে গেলেন তখন আমাকে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিলেন। সাইয়েদ জালালুদ্দিন তার সঙ্গে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আপনার অনেক খরচের প্রয়োজন পড়বে। সুতরাং আমার ফিরে আসা পর্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে পাওয়া আয় খরচ করবেন।[১]

সুতরাং আমি এর থেকে প্রায় পাঁচ হাজার দিনার খরচ করি।[২] এই শহরে সাইয়েদ জালালুদ্দিন হায়দারি[৩] উলুবির সাক্ষাতেও ধন্য হই। তিনি আমাকে তার খিরকা (বিশেষ পোশাক) দান করেন। এই ব্যক্তি অনেক আল্লাহওয়ালা ছিলেন। যখন হিন্দু ডাকাতরা সমুদ্রে আমার সবকিছু লুটে নেয় তখন এই খিরকাও ছিনিয়ে নেয়।[৪]

মুলতান

হিন্দুদের পবিত্র ও প্রাচীন একটি শহর

উছে কিছুদিন কাটানোর পর মুলতানের[৫] উদ্দেশে সফর শুরু করলাম। এই

---

[১] এর দ্বারা অনুমান করা যায়, সিন্ধ বিদেশি, মুসাফির ও গরিবদের সঙ্গে কী ধরনের ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও সহমর্মিতাসুলভ আচরণ করত। শহরের প্রশাসক জালালুদ্দিনের কাছে ইবনে বতুতা নিছক অপরিচিত ও ভিনদেশি মানুষ, একজন মুসলিম পর্যটক ছিলেন। তার বংশ-গোত্র, স্বভাব-চরিত্র সবই অজানা। কিন্তু তুঘলকের সফরসঙ্গী হয়ে চলে যাওয়ার সময় তিনি এই অপরিচিত মুসাফিরকে অনুমতি দিয়ে যাচ্ছেন যে, নিজ এলাকা থেকে যে আয় আসবে সেখান থেকে যা খুশি তিনি যেন খরচ করেন। এ ধরনের আচরণ আর কোথায় পাওয়া যাবে!

[২] খোলামেলা ও অকপট স্বভাব প্রশংসাযোগ্য।

[৩] জাহানিয়া জাহাঁগাশত উদ্দেশ্য।

[৪] সিন্ধের হিন্দু লুটেরারা সমুদ্রে দস্যুতায় লিপ্ত ছিল।

[৫] হিন্দুস্তানের প্রাচীন শহরগুলোর মধ্যে মুলতান বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

৭১৪ হিজরিতে অনেকটা নাটকীয়ভাবে মুহাম্মাদ বিন কাসেম এই শহর জয় করেন। দামেশকের খেলাফতের কাছে মুহাম্মাদ বিন কাসেম এই অঙ্গীকার করেছিলেন যে, যুদ্ধের খরচ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কেননা যেহেতু এই শাসনব্যবস্থা ন্যায় ও সাম্য এবং পুরোপুরি ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, এজন্য সিন্ধবাসীর কাছ থেকে তেমন কোনো কর আদায় করতে পারেনি। এজন্য প্রত্যেক খলিফা হেজাজের প্রতি এবং সেখানকার মুহাম্মাদ বিন কাসেমের প্রতি মুখাপেক্ষিতা বেড়ে যায়। কী করবেন এটা নিয়ে মুহাম্মাদ ইবনে কাসেম খুবই পেরেশান ছিলেন। তিনি আসতে আসতে মুলতানে চলে আসেন। এক হিন্দু লোক রাতের বেলা তাকে মন্দিরে রক্ষিত ভান্ডারের ব্যাপারে জানান। সেখান থেকে এত পরিমাণ স্বর্ণ উদ্ধার হয় যে, শুধু খরচই নির্বাহ হয়নি, অনেক বেশি উদ্বৃত্ত থাকে। এরপর থেকে মুসলিম শাসনামলে এই শহর রাতারাতি উন্নতি করতে থাকে। এখানকার পবিত্র

শহর সিন্ধের রাজধানী। এখানকার প্রধান আমির এই শহরেই থাকেন। শহরে প্রবেশ করার আগে দশ ক্রোশ দূরত্বে একটি নদী পার হতে হয়। এই নদীটি অনেক ছোট, তবে গভীর। নৌকা ছাড়া এটি পার হওয়া যায় না। এখানে পারাপারের সময় যাচাই-বাছাই করা হয় এবং সঙ্গে থাকা আসবাবপত্রে তল্লাশি চলে। ওই সময় এখানে প্রত্যেক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সঙ্গে থাকা এক চতুর্থাংশ সম্পদ উসুল করা হতো। প্রতি ঘোড়ার জন্য আদায় করা হতো সাত দিনার। আমার হিন্দুস্তানে পৌঁছার দুই বছর পর বাদশাহ এই কর মাফ করে দেন।[১] আর যখন আব্বাসী খলিফার বাইআত গ্রহণ করেন তখন যাকাত অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ছাড়া কোনো ধরনের কর বাকি থাকেনি।[২] তল্লাশি নিয়ে আমার খুব দুর্ভাবনা ছিল। কেননা বাহ্যত আমার সঙ্গে অনেক আসবাবপত্র আছে বলে মনে হতো। কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছুই ছিল না। ভয় ছিল তারা কোনো বিভ্রান্তির শিকার হয় কি না। তবে প্রশাসক কুতবুল মুলক মুলতান থেকে একজন সেনা অফিসার পাঠিয়েছিলেন এবং তাকে বলে দিয়েছিলেন যাতে কেউ আমাকে তল্লাশি না করে। সুতরাং অবশেষে সেটাই হয়। আমি আল্লাহর শোকর আদায় করি।

ওই রাত আমরা নদীর তীরে একটি জায়গায় যাপন করি। সকাল সকাল আমার কাছে এলেন দিহকান সমরকন্দি। তিনি ডাক বিভাগের অফিসার এবং বাদশাহর লিপিকার। আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং তাকে নিয়ে মুলতানের প্রশাসকের কাছে যাই। তখন মুলতানের প্রশাসক ছিলেন কুতবুল

মাটি বড় বড় আউলিয়া, সালেহ ও উলামাকে তার কোলে স্থান দিয়েছে। এককালে এই শহর ছিল হিন্দুদের তীর্থভূমি। অনেক বড় মূর্তি স্থাপিত ছিল, যার পূজা করতে দূরদূরান্ত থেকে হিন্দুরা ছুটে আসত। পরবর্তী সময়ে এই শহর ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়।

এই শহর বড় বড় বিপ্লব দেখেছে। হিন্দুস্তানে তাতারিদের অভিযান এই শহর থেকেই শুরু হয়। সবসময় এখানে তুমুল প্রতিরোধের মুখে পড়েছে। তাতারিরা গোটা দুনিয়া পদদলিত করে, বাগদাদও নিশ্চিহ্ন করে দেয়। বলখ, বদখশা, তারনিশাপুরসহ অনেক শহর উজাড় করে দেয়। কিন্তু হিন্দুস্তানে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটাতে পারেনি। তারা সবসময়ই তাতারিদের পিছু হটতে বাধ্য করে। শিহাবুদ্দিন ঘুরির হামলার সময় এই শহরে কারামিতাদের শাসন ছিল। হিন্দু অধ্যুষিত এই শহর মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। ঘুরি তাদের নির্মূলে কোনো ত্রুটি করেননি। পরবর্তী সময় এই শহর শিখেরা দখল করে। ইংরেজরা শিখদের থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে শহরকে নিজের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেয়। ফলে লোকেরা মুলতান নিয়ে বিদ্রূপ করত। বলত, মুলতানের উপহার চারটি জিনিস, পরিবেষ্টিত, গরম, ভিক্ষুক ও কবরস্থান।

[১] তুঘলকের মেজাজ ছিল খুবই কঠোর। কিন্তু দয়া ও অনুকম্পা প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও কেউ তার সমকক্ষ ছিল না।

[২] যেন পুরোপুরি ইসলামী ব্যবস্থাপনার ওপর আমল করতে শুরু করেন।–রইস আহমাদ জাফরি।

মুলক। তিনি অনেক সম্পদশালী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। আমি যখন পৌঁছলাম আমার সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুসাফাহা করে নিজের পাশে নিয়ে বসালেন। আমি একজন গোলাম, একটি ঘোড়া এবং কিছু কিসমিস ও বাদাম হাদিয়া হিসেবে উপস্থাপন করলাম। তখন ওই দেশে কিসমিস ও বাদাম হতো না। হাদিয়া হিসেবে কেউ দিত এবং সেটা খুরাসান থেকে আসত। তিনি উঁচু একটি স্থানে বসা ছিলেন। সেখানে বিছানা পাতা ছিল। তার পাশেই কাজি, সেনাপতি ও শহরের খতিব বসা ছিলেন। তাদের নাম আমার মনে পড়ছে না। ডানে-বামে সেনা অফিসাররা ছিলেন। আর তার পেছনে অস্ত্রধারী প্রহরী দাঁড়িয়ে ছিল। সামনে সেনারা সামরিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করছিল।

সেনাদের কর্তব্য, বীরত্ব ও বাহাদুরির প্রকাশ

সেখানে অনেকগুলো কামান পড়েছিল। যে তিরন্দাজের কামান প্রদর্শন করতে চাইত, সে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কোনো কামান হাতে নিয়ে নিক্ষেপ করত। আর বাহনের কামান প্রদর্শন করতে চাইলে একটি ছোট আংটা দেয়ালে আঁকা ছিল, ঘোড়ায় চড়ে দৌড়ে বর্শাটি টার্গেটকৃত স্থানে লাগানো হতো। একটি ছোট দেয়ালে আংটি স্থাপন করা ছিল। অশ্বারোহীরা সেই আংটি টার্গেট করে এর মধ্যে বর্শা নিক্ষেপ করত। এছাড়া মাঠে একটি ছোট্ট বল নিয়ে অশ্বারোহী সেনারা খেলায় মেতে ওঠে। এই প্রদর্শনীতে যে যত নৈপুণ্য দেখাতে পারত তার তত পদোন্নতি হতো।

শাহানশাহ মুহাম্মাদ তুঘলকের চাকরির জন্য বিশিষ্টজনদের ভিড়

আমরা কুতবুল মুলকের কাছে গিয়ে তাকে সালাম করি। তিনি আমাদের নির্দেশ দেন আমরা যাতে শায়খ রুকনুদ্দিন কুরাইশির ভক্ত-অনুরাগীদের সঙ্গে অবস্থান করি। তার নিয়ম ছিল, গভর্নরের অনুমতি ছাড়া নিজের কাছে কোনো মেহমানকে রাখতেন না। এই শহরে আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এসেছিলেন, যারা বাদশাহর চাকরির জন্য দিল্লি যাচ্ছিলেন। এর মধ্যে তুরমুজের কাজি খোদাওয়ান্দজাদা কাওয়ামুদ্দিন (নিজের পরিবার-পরিজনসহ), তার ভাই ইমাদুদ্দিন, জিয়াউদ্দিন ও বোরহানউদ্দিন, সমরকন্দের একজন নেতা মোবারক শাহ, বুখারার একজন নেতা আর্নবাগা, খোদাওয়ান্দজাদা কাওয়ামুদ্দিনের ভাতিজা মুলক জাদা ও বদরুদ্দিন ফাসসাল

ছিলেন। এর মধ্যে প্রত্যেকের সঙ্গে তাদের বন্ধুবান্ধব, সেবক ও ভক্ত-অনুরাগীরা ছিলেন।

মুলতানে পৌঁছার দুই মাস পর পুশেঞ্জি নামে বাদশাহর একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা এবং মুলক মুহাম্মাদ হারুবি নামে একজন পুলিশ কর্মকর্তা এলেন। তারা খোদাওয়ান্দজাদা কাওয়ামুদ্দিনকে স্বাগত জানাতে আসেন। তাদের সঙ্গে তিনজন ক্রীতদাস ছিল। বাদশাহর স্ত্রী তাদেরকে খোদাওয়ান্দজাদার স্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য পাঠান। তারা খোদাওয়ান্দজাদা ও তার পরিবারের সদস্যদের জন্য খিলআত (বিশেষ পোশাক) নিয়ে আসেন। আমি বললাম, আমি চাচ্ছি আখুন্দে আলম অর্থাৎ বাদশাহর চাকরি করতে। বাদশাহকে এখানকার লোকেরা 'আখুন্দে আলম' বলে থাকে। আর বাদশাহর নির্দেশ ছিল, কেউ খুরাসানের দিক থেকে এলে এবং তিনি এই দেশে থাকার ইচ্ছা পোষণ না করলে তাকে যেন সামনে এগোতে না দেওয়া হয়। সুতরাং আমি বললাম, আমার ইচ্ছা এই দেশে থেকে যাওয়া। তখন কাজি ও সাক্ষী তলব করা হলো। একটি অঙ্গীকারনামায় আমার দস্তখত নেওয়া হলো। আমার সাথী-সঙ্গীদের মধ্যে কেউ কেউ দস্তখত করতে অস্বীকৃতি জানালেন। আমি সফরের প্রস্তুতি নিলাম। মুলতান থেকে দিল্লি চল্লিশ দিনের পথ। বিভিন্ন জনপদ পেরিয়ে যেতে হয়।

খাবারের আদব, দস্তরখানের প্রশস্ততা, বাহারি ধরনের খাবার

নিরাপত্তা কর্মকর্তা ও তার সঙ্গীরা খোদাওয়ান্দজাদার আপ্যায়নের ব্যবস্থা মুলতান থেকে করেন। তারা ২০ জন বাবুর্চি সঙ্গে নেন। নিরাপত্তা কর্মকর্তা এক মঞ্জিল সামনে চলে যেতেন এবং সেখানে খোদাওয়ান্দজাদার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে রাখতেন। আমি যেসব লোকের কথা আলোচনা করেছি তারা সবাই পৃথক পৃথক তাঁবুতে অবস্থান করতেন। তবে খাবার খেতেন খোদাওয়ান্দজাদার সঙ্গে একই দস্তরখানে। আমি মাত্র একবার তাদের সঙ্গে খাবারে শরিক ছিলাম। খাবারের পদ্ধতি হলো, প্রথমে রুটি আনা হতো, যা ছিল খুবই পাতলা চাপাতি। এরপর আনা হতো ছাগলের ভুনা। একটি ছাগল চার অথবা ছয় টুকরো করে এক একজনের সামনে রাখা হতো। এরপর ঘিয়ে ভেজানো রুটি আনা হতো। যার ভেতরে হালুয়া ভর্তি ছিল। প্রত্যেক টুকরিতে একটি করে মিষ্টি রুটি রাখা হতো, যাকে 'খুশতি' বলা হতো। এটি আটা, চিনি ও ঘি দিয়ে বানানো হতো। পরে একটি জিনিস আনা হতো যার নাম ছিল সমুচা। এর ভেতরে থাকতো কিমা করা গোশত।

এর ভেতরে বাদাম, পেস্তা, পেঁয়াজ ও গরম মসলা দিয়ে পাতলা চাপাতি দ্বারা ঢেকে দেওয়া হতো। এরপর ঘি দ্বারা ভাজা হতো। প্রত্যেকের সামনে চার/পাঁচটি করে সমুচা রাখা হতো। এরপর ঘি দিয়ে রান্না করা চাউল আনা হতো। এর ওপরেও ঘি থাকত।

এরপর লাকিমাতুল কাদি[১] (এক ধরনের মিষ্টান্ন) আনা হতো, যাকে হাশিমিও বলা হয়। পরে আরেক ধরনের মিষ্টান্ন আনা হতো। খাবার শুরু করার আগে নিরাপত্তারক্ষী দস্তরখানের কাছে দাঁড়িয়ে যেত। সবাই বাদশাহকে সম্মান জানাত। তাদের দেশে সম্মানের পদ্ধতি হলো সবাই রুকুর মতো করে মাথা ঝুঁকাত। এই সম্মান প্রদর্শন সম্পন্ন হলে সবাই খাবারের দস্তরখানে বসে যেত। খাবার শুরু করার আগে স্বর্ণ, রুপা ও কাঁচের পেয়ালায় মিশরীয় ও গোলাবের শরবত পান করতেন। শরবত পান সম্পন্ন হলে নিরাপত্তারক্ষী জোরে বিসমিল্লাহ বলেন। এরপর সবাই খাবার শুরু করেন। খাবার সম্পন্ন হওয়ার পর 'ফিকার'[২] (এক ধরনের পানীয়) পেয়ালা আসত। ফিকার পান সম্পন্ন হলে আসত পান-সুপারি। যখন পান খাওয়া শেষ হতো নিরাপত্তারক্ষী জোরে 'বিসমিল্লাহ' বলত। এটা হলো উঠে যাওয়ার সংকেত। এরপর খাবারের শুরুর মতো আবার সম্মান প্রদর্শন করা হতো। এভাবে দস্তরখান খালি হয়ে যেত।

মুলতান থেকে দিল্লির দিকে রওনা

আবু হর শহর, আমের পরিচয়, হিন্দুস্তানের অন্যান্য ফলমূল

মুলতান থেকে রওনা হওয়ার পর সর্বপ্রথম যে শহরে আমরা পৌঁছি সেটা হলো আবু হর। এটি হিন্দুস্তানের প্রথম শহর। শহরের আয়তন ছোট। কিন্তু খুবই সুন্দর। আবু হরে[৩] দালানকোটা, মানুষ, নদী ও গাছের প্রাচুর্য রয়েছে। আমাদের এখানকার গাছের মধ্যে বরই ছাড়া আর কোনো গাছ সেখানে হয় না। এখানকার বরই আমাদের দেশের বরইয়ের চেয়ে বড় ও মিষ্টি এবং মাযু ফলের দানার মতো হয়।

---

[১] এটা ওই জিনিস বলে মনে হচ্ছে যাকে হায়দারাবাদ এলাকায় 'লাকমি' বলা হয়।

[২] এক ধরনের পানীয়, যার দ্বারা কিছুটা তন্দ্রা আসে, কিন্তু নেশা সৃষ্টি হয় না।

[৩] সেই শহর আগের মতো অবস্থায় নেই। তবে জায়গাটি এখনো রয়েছে। পাকপাট্টান ও সারসার রাস্তায় ফিরোজপুরে ফাজিলকায় অবস্থিত।–রইস আহমাদ জাফরি।

আম, আমের আচার, কাঁঠাল, জাম ইত্যাদির আলোচনা

হিন্দুস্তানে আম নামে একটি ফল হয়, যার গাছ কমলা গাছের মতো। তবে এর চেয়ে বড় এবং পাতাও অনেক হয়। ছায়াও অনেক ঘন হয়। তবে যারা এর ছায়ায় ঘুমায় তারা আলসে হয়ে যায়। এর ফলগুলো আলু বুখারার চেয়ে বড় হয়। পাকার আগে সবুজ রং ধারণ করে। এই সবুজ রঙের আম যখন পড়ে যায় তখন এর দ্বারা আচার বানানো হয়। আমাদের দেশে যেমন লেবু ও টক জাতীয় ফল দ্বারা আচার বানানো হয়, সেটাও তেমনি। আদা দিয়েও আচার বানানো হয় এবং এটা খাবারের সঙ্গে খায়। প্রতি লোকমার আগে একটু আচার খেয়ে নেয়। গ্রীষ্মকালে যখন আম পাকে তখন হলুদ বর্ণ ধারণ করে। তখন তা আপেলের মতো খায় আবার কেউ কেউ খোসা ছড়িয়ে খায়। কেউ কেউ চুষেও খায়। ফলটি মিষ্টি হলেও কোনো কোনোটা টক হয়। এর মধ্যে একটি বড় আঁটি বের হয়। সেই আঁটিটি মাটিতে পুঁতে রাখলে গাছ হয়ে যায়। এটাকে আঁটির বীজ বলা হয়।

শকি[১] ও বারকি (কাঁঠাল) গাছ বড় হয়। আর পাতাগুলো অনেকটা আখরুটের পাতার মতো। ফলটি গাছের মূল কাণ্ডের সঙ্গে লাগানো থাকে। যে ফল মাটির সঙ্গে লাগানো থাকে সেটাকে 'বারকি' বলে। এটি বেশি মিষ্টি হয় এবং স্বাদও বেশি। আর ওপরে যে ফল হয় সেটাকে 'চাক্কি' বলা হয়। এর ফল বড় লাউয়ের সাদৃশ্য এবং খোসা অনেকটা গাভীর চামড়ার মতো হয়ে থাকে। গ্রীষ্মকালে ফলটি অনেক হলুদ বর্ণ ধারণ করে। ফলটি যখন কাটা হয় এবং ভাঙা হয় তখন একশ থেকে দুশ কোষ বের হয়। প্রতিটি কোষের ভেতরে একটি বিচি থাকে। এই বিচিগুলো ভেজে কিংবা রান্না করে খাওয়া যায়। এর স্বাদ অনেকটা বাকিল্লার মতো। এই দেশে বাকিল্লা হয় না। এই কাঁঠাল বিচি মাটিতে পুঁতে রাখলে এক বছর পর্যন্ত ভালো থাকে। এই ফলটি হিন্দুস্তানের সেরা ফলগুলোর একটি।

আবনুস গাছের ফল অনেকটা এপ্রিকট ফলের মতো। রং অনেকটা একই রকম। এই ফলটি অনেক সুস্বাদু।

জাম গাছ অনেক বড় হয়ে থাকে। এর ফল জাইতুন ফলের মতো। তবে রং কালো। জাইতুনের মতো এর ভেতরেও একটি বিচি থাকে।

---

[১] অর্থাৎ কাঁঠাল গাছ।

মিষ্টি কমলা এই দেশে অনেক হয়। তবে টক কমলা হয় অনেক কম। এক ধরনের কমলা টক-মিষ্টি হয়ে থাকে। এটি আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। আমি এটা অনেক মজা করে খেতাম।

মাহওয়ার গাছ অনেক বড় হয়। পাতাগুলো আখরুটের পাতার মতো। তবে তা লাল ও হলুদ বর্ণের। এর ফলও ছোট আলু বুখারার মতো। তবে অনেক মিষ্ট। প্রতিটি বিচির মুখে একটি ছোট বিচি থাকে। যা কিসমিসের মতো। ভেতরে ফাঁকা। এর স্বাদ অনেকটা আঙুরের মতো। তবে বেশি খেলে মাথায় ব্যথা শুরু হয়ে যায়। শুকানোটা মজায় ডুমুরের মতো। আমি ডুমুরের পরিবর্তে এটি খেতাম। ডুমুর সেখানে হয় না। মাহওয়ার মুখে যে আরেকটি বিচি থাকে এটাকেও আঙুর বলা হয়। আঙুর হিন্দুস্তানে অনেক কম হয়। দিল্লি এবং আরো কিছু এলাকায় হয়। মাহওয়া গাছে বছরে দুই বার ফল ধরে। এর বিচি থেকে তেল বের হয় এবং তা দ্বারা বাতি জ্বালানো হয়।

কেসরা, এটি মাটি খুঁড়ে বের করা হয়। অনেকটা কিসতালের মতো। অনেক মিষ্ট হয়।

আমাদের দেশের ফলগুলোর মতো আনার হিন্দুস্তানেও হয়। গাছে বছরে দুই বার ফলটি ধরে। মালদ্বীপে আমি দেখেছি, আনার গাছে বারো মাসই ফল হয়।

তরকারি, শস্য, মটরশুঁটি, চীনাবাদাম, মসুর ডাল ইত্যাদি

হিন্দুস্তানে বছরে দুইবার ফসল হয়। গরমকালে যখন বৃষ্টি হয় তখন হেমন্তের ফসল বপন করে এবং ৬০ দিন পর তা কাটে। হেমন্তের শস্য ও তরিতরকারির মধ্যে হয়—গাজর, চীনা, সানুক, যা চীনা থেকে ছোট হয় এবং বেশির ভাগ আল্লাহওয়ালা ও হতদরিদ্র মানুষ এগুলো খায়। এক হাতে পাত্র নিয়ে আরেক হাতে লাঠি দিয়ে গাছে আঘাত করলে সানুক ওই পাত্রে পড়ে যায়। এর দানাগুলো অনেক ছোট ছোট হয়। এগুলো রোদে শুকিয়ে কুলা দিয়ে ঝেড়ে খোসা আলাদা করা হয়। তখন ভেতর থেকে সাদা দানা বেরিয়ে আসে। মহিষের দুধ দিয়ে এর ক্ষির রান্না করা হয়। তখন রুটির চেয়ে এটি বেশি সুস্বাদু মনে হয়। আমি প্রায়ই এসবের ক্ষির রান্না করে খেতাম। আমার কাছে অনেক স্বাদ লাগত।

মাশ মটরের একটি প্রকার। আর মুগ হচ্ছে মাশের একটি প্রকার। তবে দেখতে একটু লম্বা এবং রং সবুজ। মুগ ও চাল মিশিয়ে এক ধরনের খাবার

তৈরি করা হয়, যাকে কাশারি (খিচুড়ি) বলা হয়। আর এটা ঘিয়ের সঙ্গে খাওয়া হয়। খিচুড়ি সকালে নাস্তা হিসেবে খাওয়া হয়। এটা আমাদের দেশের হারিরার মতো। মটরশুঁটি এটাও এক ধরনের তরকারি। এটি কাজুর তরকারির মতো। তবে বিচি এর চেয়ে ছোট। এটি ঘোড়া ও গরুর খাদ্য হিসেবেও দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে চনাও ব্যবহার করা হয়। জবে শক্তি কম হয়। চনা ও গমের দানা মিশিয়ে পানিতে ভিজিয়ে ঘোড়াকে খাওয়ানো হয়। এছাড়া ঘোড়াকে সবুজ ঘাস কেটেও খাওয়ানো হয়। এতে ঘোড়া মোটাতাজা হয়। প্রথম দশ দিন তাকে ঘি খাওয়ানো হয়। কেউ তিন রতল, কেউ চার রতল; আর এই সময়ে তার দ্বারা বাহনের কোনো কাজ নেয় না। এরপর এক মাস সবুজ মাশ খাওয়ানো হয়। এই সবগুলো হেমন্তের তরকারি। হেমন্তের ফসল বোনার ষাট দিন পর বসন্তের তরকারি বোনা শুরু হয়ে যায়। যেমন, গম, মসুর ও জব। ভূমি বেশ উর্বর। সুতরাং ধান বছরে তিন বার রোপন করা হয়। আর চালের উৎপাদন যেকোনো শস্যের চেয়ে বেশি হয়। তিল ও আখ হেমন্তকালে রোপন করা হয়।

হিন্দু ডাকাতদের সঙ্গে মোকাবেলা ও এর দাস্তান

আবু হর শহর থেকে বিদায় নিয়ে আমরা একটি প্রান্তর দিয়ে যাচ্ছিলাম, যার দূরত্ব ছিল একদিনের পথ। এর পাশে বড় বড় পাহাড় ছিল। দুর্গম পাহাড়ে হিন্দুদের বসবাস ছিল। তাদের বেশির ভাগই ছিল ডাকাত। হিন্দুদের মধ্য থেকে বেশির ভাগই হলো প্রজাসাধারণ, যারা বাদশাহর প্রতি আনুগত্যশীল এবং সমতল ভূমিতে বসবাস করে। তাদের প্রশাসক মুসলিম। প্রশাসকের অধীনে শহর ও গ্রাম থাকে। কিছু হিন্দু বিদ্রোহী আছে—যারা বাদশাহর সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত। তারা হয়ত দুর্গম পাহাড়ে বসবাস করে কিংবা ডাকাতিতে লিপ্ত। যখন আমরা আবু হর থেকে বিদায় নিলাম, অন্যরা তো সকাল-সকালই চলে গেল, আমি এবং কিছু মানুষ দুপুর পর্যন্ত সেখানে থাকলাম। দুপুরের পর আমরা রওনা দিলাম। আমাদের ২২টি আরোহী ছিল। সেখানে আরব-অনারব উভয় শ্রেণির লোক ছিলেন। আমাদের ওপর ৮০ জন হিন্দু এবং দুটি বাহন নিয়ে অতর্কিত হামলা হয়। আমার সঙ্গী-সাথীরা সবাই টগবগে যুবক এবং বীরত্ব প্রদর্শনকারী ছিলেন। তুমুল লড়াই হলো। আমরা তাদের ১২ জন এবং একটি বাহনকে হত্যা করলাম এবং তাদের ঘোড়া আটক করলাম। আমার ওপর এবং আমার ঘোড়ার ওপর তিরের আঘাত লাগল। তবে আল্লাহ রক্ষা করেছেন। কেননা তাদের তির ছিল অনেক দুর্বল। আমাদের মধ্য থেকে একজনের ঘোড়া আহত হয়। আমরা তাকে

নিহতদের ঘোড়া দিয়ে দিই। আর আহত ঘোড়াটি জবাই করে নিই। আমাদের সাথীসঙ্গীরা এটা খায়। আর নিহতদের শিরশ্ছেদ করে আবি বাকহার দুর্গে নিয়ে যাই এবং সেখানে ঝুলিয়ে রাখি। আমরা সেই বাকহার দুর্গে পৌঁছি মধ্যরাতে। আর সেখান থেকে সফর করে দুই দিন পর আজুদাহানে প্রবেশ করি।

আজুদাহান অর্থাৎ পাকপাট্টান
হযরত শায়খ ফরিদুদ্দিন আত্তার রহ.-এর শহর

আজুদাহান[১] এটি একটি ছোট শহর। এটি শায়খ ফরিদুদ্দিন বাদায়ুনির শহর। শায়খ বুরহানুদ্দিন ইস্কান্দরি চলে যাওয়ার সময় বলেছিলেন, শায়খ ফরিদুদ্দিনের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হবে। আল্লাহর শোকর, আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।[২] তিনি হিন্দের বাদশাহর পীর এবং বাদশাহ তাকে এই শহর উপহার হিসেবে দেন। শায়খের মধ্যে সন্দেহপ্রবণতা অনেক বেশি। তিনি কারো সঙ্গে মুসাফাহাও করেন না, কারো কাছেও যান না। তাঁর কাপড় কারো কাপড়ের সঙ্গে লেগে গেলে তা ধুয়ে নেন। আমি তাঁর খানকায় গেলাম। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শায়খ বুরহানুদ্দিনের সালাম তাঁকে পৌঁছে দিলাম। এটা শুনে তিনি বিস্মিত হলেন এবং বললেন, হয়ত অন্য কাউকে সালাম বলেছেন। তাঁর দুই ছেলের সঙ্গেই আমি সাক্ষাৎ করি। তারা উভয়েই আলেম, ফাযেল। একজনের নাম মুইজুদ্দিন আর অন্যজনের নাম আলামুদ্দিন। মুইজুদ্দিন বড়। বাবার ইন্তেকালের পর তাঁরা স্থলাভিষিক্ত হন। তাদের দাদা শায়খ ফরিদুদ্দিন বাদায়ুনির কবরও আমি যিয়ারত করেছি। বাদায়ুন সাম্বাল এলাকার একটি শহর। যখন আমি ওই শহর থেকে বিদায় হচ্ছিলাম তখন আলামুদ্দিন বললেন, আপনি আমার বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিতে পারেন। তখন তিনি সবচেয়ে উঁচু একটি ছাদে অবস্থান করছিলেন। তাঁর পরনে ছিল সাদা কাপড়। মাথায় ছিল বড় একটি পাগড়ি। এটি এক দিকে ঝুলানো ছিল। তিনি আমার জন্য দোয়া করেন এবং আমার জন্য মিছরি ও চিনি হাদিয়া পাঠান।

---

[১] পাকপাট্টান শরিফের প্রাচীন নাম আজুদাহান। প্রথমে এর নাম 'পাট্টান ফরিদ' পড়ে যায়; পরবর্তী সময়ে বাদশাহ আকবর এর নাম রাখেন 'পাকপাট্টান'। যিয়ারতের একটি বড় জায়গা এটি। প্রতি বছর ওরসে লাখো মানুষের জমায়েত হয়। এটি পড়েছে মন্টগোমেরি জেলায়।

[২] এটা ইবনে বতুতার একটি ভুল। মূলত তিনি শায়খ আলাউদ্দিন মওজে দরিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যিনি বাবা ফরিদ শুকরগঞ্জের পৌত্র এবং বাদশাহ তুঘলকের মুরশিদ ছিলেন। মুইজুদ্দিন ও আলামুদ্দিন তারই দুই ছেলে।

সতিদাহ প্রথার হৃদয়বিদারক দৃশ্য, আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম

আমি শায়খের যিয়ারত শেষে ফিরছিলাম। দেখলাম, লোকেরা আমাদের তাঁবুর দিক থেকে দৌড়ে আসছে। এর মধ্যে আমাদের সঙ্গী-সাথীরাও আছেন। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, কী বিষয়! তারা জবাব দিলেন, এক হিন্দু লোক মারা গেছে। তাকে দাহ করার জন্য চিতা প্রস্তুত। সঙ্গে তার জীবন্ত স্ত্রীও দাহ হবে। তাদের দুজনকেই যখন দাহ করা হয় তখন আমাদের সাথীরা ফিরে আসেন। তারা জানালেন, মৃত স্বামীর সঙ্গে জড়িয়ে ধরে স্ত্রীও দাহ হয়েছেন। আরেকবার দেখলাম, এক হিন্দু নারীকে সাজিয়ে-গুজিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তার পেছনে হিন্দু-মুসলিমের[১] ভিড়। তাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণও রয়েছে। যেহেতু সেটা বাদশাহর এলাকা, এজন্য বাদশাহর অনুমতি ছাড়া জ্বালাতে পারত না। বাদশাহ জ্বালানোর অনুমতি দিয়ে দিলেন। এরপর তাকে দাহ করা হয়।[২] কিছুদিন পর ঘটনাক্রমে আমি একটি শহরে ছিলাম। সেখানকার অধিবাসীরা বেশির ভাগই হিন্দু। সেই শহরের নাম আবরাহি। এর প্রশাসক ছিলেন সামুরা সম্প্রদায়ের মুসলিম। শহরের আশপাশে বিদ্রোহী হিন্দুদের বসবাস ছিল। একবার তারা ডাকাতি করলে প্রশাসক হিন্দু-মুসলিম সবাইকে সঙ্গে নিয়ে তাদেরকে প্রতিহত করতে গেলেন। প্রচণ্ড লড়াই হলো। সাতজন হিন্দু প্রজা মারা গেল। তাদের মধ্যে তিনজন ছিল বিবাহিত। তাদের স্ত্রীরা সহমরণের ইচ্ছা পোষণ করে।

সহমরণ হিন্দুদের জন্য জরুরি নয়।[৩] তবে যে বিধবা স্বামীর সঙ্গে দাহ হয়ে যায়, তার বংশের লোকদের সম্মানী বলে ধরে নেওয়া হতো। তাদেরকে বিশ্বস্ত বলে গণ্য করা হতো। আর যে বিধবা স্বামীর সঙ্গে দাহ হতো না তাকে মোটা কাপড় পরতে হতো। নানা ধরনের উপেক্ষা ও বঞ্চনার মধ্যে জীবনাতিপাত করতে হতো। আর তাকে বিশ্বস্ত নারীও মনে করা হতো না।[৪] তবে কাউকে সতিদাহে বাধ্য করা হতো না।[৫] যে তিন বিধবা সহমরণের

---

[১] এই প্রথার গুরুত্ব প্রকৃতিগতভাবে তৎকালীন মুসলিমদের অন্তরেও বসে যায়।

[২] তখন পর্যন্ত এই প্রথা রহিত হয়নি। এটি রহিত করেন আকবর।

[৩] তবে বিধবা নারীর জীবন এমন অতিষ্ঠ হয়ে উঠত যে, জীবন্ত অবস্থায় দাহ হয়ে মারা যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকত না।

[৪] এই বঞ্চনা তাদেরকে জীবন্ত জ্বলে মরতে বাধ্য করত।

[৫] আবুল ফযল সতিদাহের পাঁচটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন,
ক. স্বামীর চিন্তায় স্ত্রী বেহুঁশ হয়ে যেত। আর এই বেহুঁশ অবস্থায় স্বজনরা তাকে জীবন্ত পুড়ে ফেলত।

ইচ্ছা পোষণ করে তারা তিন দিন আগে গানবাদ্য ও খাওয়াদাওয়ার আয়োজনে লিপ্ত হয়ে যায়। তাদের কাছে সব ধরনের নারীরা আসতে থাকে। চতুর্থ দিন তাদের কাছে একটি ঘোড়া আনা হয়। প্রত্যেক বিধবা সেজেগুজে এই ঘোড়ায় চড়ে বসে। তাদের ডান হাতে নারিকেল। আর বাম হাতে আয়না। সেই আয়নায় মুখ দেখে। ব্রাহ্মণ তাদের পাশেই থাকেন। আর স্বজনরা সামনে বাদ্যযন্ত্র বাজাতে বাজাতে অগ্রসর হয়। প্রত্যেক হিন্দু এসে বলছে, আমার সালাম আমার মা-বাবা, ভাই অথবা বন্ধুকে বলবে। বিধবা হেসে হেসে জবাব দিচ্ছে, আচ্ছা।[১]

আমিও আমার বন্ধুদের সঙ্গে তাদের দাহ হওয়ার দৃশ্য দেখতে গেলাম। আমরা তাদের সঙ্গে তিন মাইল গেলাম। এমন একটি জায়গায় পৌঁছলাম যেখানে অনেক পানি। গাছের আধিক্যের কারণে জায়গাটি অন্ধকার। মধ্যখানে চারটি প্যাভিলিয়ন। প্রতিটি প্যাভিলিয়নে একটি করে মূর্তি রয়েছে। আর প্যাভিলিয়নের মধ্যখানে পানির হাউজ রয়েছে। গাছের ছায়ার কারণে এগুলোতে রোদ পড়ে না। অন্ধকারের কারণে যেন এই জায়গাটি জাহান্নামের টুকরো। এই নারীরা যখন প্যাভিলিয়নে এলো তখন হাউজে নামল গোসল সারতে। তারা পানিতে ডুব দিলো এবং নিজেদের কাপড়-চোপড় ও গয়নাগাটি খুলে রাখলো। এগুলো দান করে দেওয়া হলো। পরে একটি মোটা শাড়ি বেঁধে বেষ্টনি দেওয়া হলো। হাউজের কাছে একটি নিচু জায়গায় আগুন ধরানো হলো। যখন এতে তিলের তেল ঢালা হলো তখন আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো। প্রায় পঁচিশজন হাতে লাকড়ি নিয়ে অপেক্ষায় ছিল। আর কিছু মানুষ বাদ্যযন্ত্র হাতে নিয়ে বিধবাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

খ. স্বামীর সঙ্গে অস্বাভাবিক ভালোবাসার কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে আগুনে পুড়ে মারা যেত।

গ. লজ্জাশীল নারীরা পুড়ে মরাকে পছন্দ করত। কেননা আত্মীয়স্বজনদের ভর্ৎসনা এবং ঘৃণার দৃষ্টি ও কথা সহ্য করা তাদের পক্ষে সম্ভব হতো না।

ঘ. প্রথা ও রেওয়াজের কারণে তারা আগুনে পুড়ে মরতে বাধ্য ছিল।

ঙ. স্বামীর উত্তরাধিকারীরা তার স্ত্রীকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আগুনে পুড়ে মরতে বাধ্য করত।

এই সবগুলো পদ্ধতি কতটা বর্বরতা ও মানবাধিকার পরিপন্থী ছিল সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিংক আইন করে সহমরণ এবং এতে বাধ্য করাকে অন্যায় হিসেবে সাব্যস্ত করেন।

[১] বাহ্যিক এই হাসি ভেতরে ভেতরে কতটা আক্ষেপ ও শোকের অশ্রু প্রবাহিত করছে সেই খবর কে রাখে!

একটি মোটা কম্বল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় যাতে বিধবারা আগুনের ভয়াবহতা দেখতে না পারে। তাদের মধ্য থেকে একজন বিধবা জোরে কম্বল সরিয়ে ফেলল আর বলল—আমি জানি এটা আগুন, ভাবছ আমি ভয় পাব। এটা বলে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এ সময় বাদ্যযন্ত্র বেজে উঠলো। পাতলা লাকড়ি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা তা আগুনে ফেলতে শুরু করল। এরপর বড় বড় কাঠ দিয়ে চেপে ধরা হলো যাতে বিধবারা নড়াচড়া করতে না পারে। উপস্থিত লোকেরা তখন চিৎকার-চেচামেচি করছিল।

আমি এই দৃশ্য দেখে বেহুঁশ হয়ে গেলাম। ঘোড়া থেকে পড়ে যাচ্ছিলাম, এ সময় আমার সঙ্গীরা আমাকে ধরেন এবং মুখে পানি ছিটিয়ে দেন। পরে আমি সেখান থেকে ফিরে এলাম। এভাবে হিন্দুরা এই দেহভস্ম নদীতে ফেলে দেয়। বেশির ভাগ দেহভস্ম গঙ্গা নদে ডুবে যায়। এছাড়া হিন্দুরা মৃতদেহ পুড়িয়ে ছাইও গঙ্গা নদে ফেলে। তাদের ধারণা, এই নদ স্বর্গের দিকে প্রবহমান। এমনিভাবে তাদের কেউ কেউ আত্মহুতির জন্যও নদে ঝাঁপ দেয়। তখন উপস্থিত লোকদের উদ্দেশে বলে—আমি পার্থিব কোনো কষ্ট কিংবা দারিদ্র্যের কারণে এমনটা করছি না। বরং আমি কুসের (কৃষ্ণ) সন্তুষ্টির জন্য এটা করছি। কুস তাদের ভাষায় প্রভুর নাম। যখন কেউ গঙ্গায় ডুবে মারা যেত তখন তার মরদেহ তুলে ভস্ম করা হতো। এরপর সেই দেহভস্ম আবার গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হতো।

সরসা শহরে প্রবেশ

আজুদাহান থেকে রওনা দিয়ে আমরা সরসাতে পৌঁছলাম। এই শহর অনেক বড়। এখানে প্রচুর ধান হয়। এখানকার চাল বেশ ভালো। এগুলো দিল্লিতেও পাঠানো হয়। এই শহরের রাজস্বও অনেক। হাজেব শামসুদ্দিন বুশেনজি আমাকে অংকটা বলেছিলেন, কিন্তু মনে নেই।[১]

হানসি শহর, সেখানকার সৌন্দর্য, প্রাসাদ ও উঁচু প্রাচীর

সরসা থেকে আমরা হানসি শহরে পৌঁছি। এটি খুবই সুন্দর ও দেয়ালঘেরা অপূর্ব শহর। বড় বড় প্রাসাদ রয়েছে। দেয়ালগুলো বেশ উঁচু। বলা হয়ে

---

[১] এই শহর সরসুতি নদীর তীরে অবস্থিত। এজন্য এই শহরের নাম হয় সরসুতি। কালক্রমে তা সরসা নামে পরিচিতি লাভ করে। সুবেদারদের কেন্দ্রও ছিল এই শহরে। কেননা তখনো ফিরোজ শাহের বসবাসের শহর 'হিসার' প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি।

থাকে, এক হিন্দু রাজা তুরা এটি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই রাজা সম্পর্কে লোকমুখে অনেক জনশ্রুতি রয়েছে। হিন্দুস্তানের প্রধান বিচারপতি কাজি কামালুদ্দিন, তার ভাই কাতলু খান, বাদশাহর শিক্ষক এবং তার আরেক ভাই শামসুদ্দিন, যিনি হিজরত করে মক্কায় চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই মারা যান—তারা সবাই এই শহরের অধিবাসী ছিলেন।[১]

মাসুদাবাদ ও পালেমে আমাদের প্রবেশ

দুদিন পর আমরা মাসুদাবাদে পৌঁছি। এই শহর দিল্লি থেকে দশ মাইল দূরে। এখানে তিন দিন অবস্থান করি। হানসি ও মাসুদাবাদ উভয় শহর কামালগিরগের[২] জায়গিরে ছিল। আমরা যখন পৌঁছি তখন বাদশাহ রাজধানীতে ছিলেন না। তিনি কানাওজে ছিলেন। কানাওজ দিল্লি থেকে দশ মাইল দূরত্বে। দিল্লিতে তখন বাদশাহর মা এবং উযির আহমাদ ইবনে আয়ায রুমি খাজা জাহাঁ[৩] ছিলেন। উযির আমাদের প্রত্যেকের মর্যাদা অনুযায়ী স্বাগত জানানোর জন্য লোক পাঠালেন। আমাকে স্বাগত জানাতে এলেন শায়খ বুস্তামি, শরিফ মাজেন্দানি, যিনি বিদেশিদের নিরাপত্তার দায়িত্বে এবং ফকিহ আলাউদ্দিন কানাররা মুলতানি। উযির আমাদের আসার খবর জানিয়ে সুলতানের কাছে চিঠি পাঠান। তৃতীয় দিন তিনি জবাব পেয়ে যান। এজন্য তিন দিন আমাদের মাসুদাবাদে[৪] অপেক্ষা করতে হয়। তিন দিন পর আমাদের স্বাগত জানাতে কাজি, মাশায়েখ ও আমিররা আসেন। মিশরে যাদেরকে আমির বলা হয়, এই দেশে তাদেরকে মালিক বলা হয়। শায়খ জহিরুদ্দিন জানজানিও এলেন। তিনি সুলতানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন। এরপর আমরা মাসুদাবাদ থেকে বের হয়ে একটি গ্রামের কাছে অবস্থান করি, যাকে পালেম[৫] বলা হয়। এই গ্রামটি সাইয়েদ শরিফ নাসিরুদ্দিন মুতাহহারের জায়গিরভুক্ত। তিনি সুলতানের অন্যতম সহচর এবং বাদশাহর দয়া-দাক্ষিণ্যে টইটম্বুর।

---

[১] হিসার জেলায় এই জায়গাটি আজও রাজস্বের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে রয়ে গেছে।

[২] একজন নওমুসলিম, যিনি নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মুরিদ ছিলেন।

[৩] নেকড়ে।

[৪] দিল্লি থেকে বারো মাইল দূরত্বে নাজিফগড়ের কাছে আজও এর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

[৫] এটি এখন দিল্লি শহরের অন্তর্ভুক্ত। এখানে এখন বিমানবন্দর হয়েছে।

দিল্লি

শহরের বিস্তৃতি, সুরক্ষাব্যবস্থা ও প্রাচীর

দ্বিপ্রহরের সময় আমরা দিল্লিতে পৌঁছি। এটি বিশাল শহর। অট্টালিকার সৌন্দর্য ও সুরক্ষাব্যবস্থা সব দিক থেকেই অদ্বিতীয়। এর প্রাচীরগুলো এতো মজবুত যে, গোটা দুনিয়ায় এর কোনো নজির নেই। গোটা প্রাচ্যে এর সমকক্ষ কোনো শহর নেই। অনেক প্রশস্ত একটি শহর। মূলত চারটি শহর নিয়ে দিল্লি গঠিত। এক. দিল্লি[১] যা হিন্দুস্তানের প্রাচীন শহর। এটি ৫৮৪ হিজরিতে জয় হয়। দুই. দ্বিতীয় শহর সিরি, এটাকে রাজধানীও বলা হয়।[২] এই শহরটি বাদশাহ আব্বাসী খলিফা মুস্তানসিরের নাতিকে দিয়েছিলেন,[৩] যখন তিনি দিল্লিতে অবস্থান করছিলেন। সুলতান আলাউদ্দিন[৪] ও কুতুবুদ্দিন এই শহরেই থাকতেন। তিন. তৃতীয় শহর তুঘলকাবাদ, এই শহরটি বাদশাহর বাবা গিয়াসুদ্দিন তুঘলক শাহ আবাদ করেন।[৫] গিয়াসুদ্দিন সুলতান কুতুবুদ্দিন খিলজির অধীনে চাকরি করতেন। একদিন এখানে বাদশাহর সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন তিনি আরজ করলেন, হে খাবেন্দে আলম (বাদশাহ)! এই জায়গাটিতে একটি নতুন শহর বানানো উচিত। তখন বাদশাহ বললেন, তুমি যখন বাদশাহ হবে তখন এখানে শহর বানাবে।[৬] সৌভাগ্যক্রমে তিনি যখন বাদশাহ হয়ে যান তখন এখানে শহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজের নামে এই শহরের নাম রাখেন তুঘলকাবাদ। চার. চতুর্থ শহর 'জাহাঁ পানাহ', এখানে বাদশাহ মুহাম্মাদ শাহ তুঘলক থাকতেন এবং তিনিই এই শহর আবাদ করেন।[৭] বাদশাহর ইচ্ছা ছিল, চারটি শহর একত্রিত করে একটি

---

[১] পুরানা দিল্লি অনেক প্রাচীন শহর। হিন্দু-মুসলিম প্রত্যেক বাদশার যুগে এটি বিস্তৃত হয়। এর আশপাশের অন্যান্য শহরও আস্তে আস্তে এই শহরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। মুসলিমরা যখন এই দিল্লি জয় করেন তখন এটি রায় পেথুরার প্রশস্তকৃত দিল্লি ছিল, যার মধ্যে লালকেল্লাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

[২] সিরি, এই শহর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির প্রতিষ্ঠিত। সেই নিদর্শন আজও টিকে আছে।

[৩] খেলাফতে ইসলামিয়ার প্রতি তুঘলক বাদশাদের অসম্ভব ভক্তি ও শ্রদ্ধার একটি অনুপম দৃষ্টান্ত এটি।

[৪] বাদশাহ আলাউদ্দিন খিলজি নিজের যুগের সিকান্দর বরং তার চেয়েও বেশি কিছু ছিলেন।

[৫] কুতুবুদ্দিন খিলজি, আলাউদ্দিনের অযোগ্য ও অপদার্থ ছেলে, যার দ্বারা খিলজি শাসনের অবসান ঘটে।

[৬] কোনো ঐতিহাসিক বর্ণনায় এই কথার সত্যতা পাওয়া যায়নি।

[৭] এই চাকচিক্যময় শহর গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের দৃঢ়চেতা মানসিকতার উদাহরণ। আজও এর ধ্বংসাবশেষ বাকি রয়েছে। এখানেই গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের কবর। সুলতান মুহাম্মাদ তুঘলকের ইন্তেকাল হয় 'ঠাট্টা'য় (পাকিস্তানের একটি শহর)। সেখান থেকে তার লাশ এনে বাবার পাশে দাফন করা হয়।

প্রাচীর নির্মাণ করবেন এবং তিনি এই কাজ শুরুও করেছিলেন। কিন্তু অনেক বেশি খরচ হতে দেখে এই কাজ অসম্পন্ন রেখে দেন। শহরের প্রাচীর গোটা দুনিয়ায় অদ্বিতীয়। এর প্রস্থ এগারো হাত। প্রাচীরের মধ্যে কুঠুরি ও কামরা বানানো হয়, যেখানে চৌকিদার ও দারোয়ানরা থাকত। খাদ্যশস্যের গুদামও সেখানে ছিল। ক্ষেপণাস্ত্র, যুদ্ধের অন্যান্য সরঞ্জামও সেই গুদামে রাখা হতো। সেখানে স্তূপাকারে রাখা খাদ্যশস্য সুরক্ষিত থাকত এবং এর রংও পরিবর্তন হতো না।[১] আমার সামনে ওই গুদাম থেকে চাল বের করা হয়। ওপর থেকে দেখতে এর রং কালো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্বাদে কোনো পার্থক্য আসেনি। ভুট্টা বা বাজরা বের করা হলো। কথিত আছে, বালবান বাদশাহের আমলে, প্রায় ৯০ বছর আগে এই খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করা হয়।[২] প্রাচীরে কয়েকটি পথ ছিল, যা দিয়ে পায়ে হেঁটে পুরো শহর ঘোরা যেত। শহরের ভেতরের দিকে গুদামে তাবদান (ভেন্টিলেটর) ছিল, যা দিয়ে আলো আসত। প্রাচীরের নিচের অংশ পাথর দ্বারা তৈরি। আর ওপরের অংশ পোক্ত ইট দ্বারা। প্রাচীরের ওপর নির্মিত টাওয়ার ছিল অনেক এবং খুব কাছাকাছি। শহরের ২৮টি দরজা, যার কয়েকটি হচ্ছে, বাদায়ু দরজা, যা একটি বড় দরজা। এটি 'শহর বাদায়ু' নামে প্রসিদ্ধ। মানদুবি দরজা, যার বাইরে ক্ষেত। গুল দরজা, যার বাইরে বাগান। নাজিব ও কামাল দরজা, যা কোনো ব্যক্তির নামে। গজনি দরজা, যার বাইরে ঈদগাহ ও কিছু কবর রয়েছে। পালাম দরজা, যা পালাম গ্রামের দিকে। বাজালিসা দরজা, যার বাইরে দিল্লির সব কবরস্থান। কবরস্থান খুব সুন্দর, প্রত্যেক কবরে হয়ত গম্বুজ নয়ত মেহরাব অবশ্যই আছে। আর নিচে নানা ধরনের ফুলের গাছ যেমন, রজনীগন্ধা, লতাফুল, নাসরিন ফুল ইত্যাদি সারি সারি লাগানো রয়েছে।

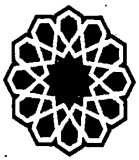

[১] সেই অবৈজ্ঞানিক যুগে এতো দীর্ঘ সময় তরিতরকারি সুরক্ষিত রাখা অনেক বড় কারিশমা।

[২] প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত তরি-তরকারি এভাবে সুরক্ষিত রাখত। এটা তাদের যুগসচেতনতা ও উত্তম ব্যবস্থাপনার একটি বড় প্রমাণ।

মসজিদে কুওয়াতুল ইসলাম ও কুতুব মিনার

দিল্লির ইমারতসমূহ, শামসি হাউজ ও মাজারের বর্ণনা

দিল্লি জামে মসজিদ[১] গড়ে উঠেছে অনেক বড় এলাকা নিয়ে। এর দেয়াল, ছাদ ও ফ্লোর সবকিছু নির্মাণ করা হয়েছে সাদা পাথর দিয়ে। যা জোড়া লাগানো হয়েছে সিসা দিয়ে। কোথাও কাঠের চিহ্নও নেই। এতে তেরটি গম্বুজ আছে, যা পাথরের। মিম্বরও পাথরের। চারটি বারান্দা আছে। আর এর মধ্যখানে একটি স্তম্ভ আছে[২] জানা নেই, সেটা কী দিয়ে তৈরি। কেউ আমাকে বলেছিলেন, হাফত জুশ অর্থাৎ সাতটি ধাতু মিশ্রিত করে এই স্তম্ভটি তৈরি করা হয়। কেউ এই স্তম্ভটির এক আঙুল পরিমাণ জায়গা ডলে পরিষ্কার করেছে। সেই জায়গাটি চকচক করছে। এতে লোহাও গাঁথা সম্ভব নয়। এর দৈর্ঘ্য ত্রিশ হাত। যা আমি আমার পাগড়ি দ্বারা মেপেছি। মসজিদের পূর্ব দিকে গেইটে দুটি পাথরের মূর্তি আছে, মাথা নোয়ানো অবস্থায়।[৩] লোকেরা আসা-যাওয়ার পথে এগুলো পদদলিত করে যায়। এখানে আগে মূর্তির ঘর ছিল। যখন দিল্লি জয় হলো তখন মূর্তির ঘরের স্থানে মসজিদ[৪] বানানো হয়। মসজিদের উত্তর পাশে এর মিনার[৫] রয়েছে। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে যার কোনো উদাহরণ নেই। এই মিনারটি লাল পাথর দ্বারা নির্মিত। অথচ মসজিদ সাদা পাথরের তৈরি। মিনারের পাথরের ওপর নকশা আঁকা। এর ওপরের চত্বর খাঁটি মর্মর পাথরের। ওপরে উঠার সিঁড়ি এতো প্রশস্ত যে, একটি হাতি

---

[১] এই মসজিদের নাম 'কুওয়াতুল ইসলাম'। এখানে আগে পৃথ্বীরাজের মন্দির ছিল। সুলতান শিহাবুদ্দিন ঘুরি ৫৮৯ হিজরিতে দিল্লি জয় করেন এবং নিজের ক্রীতদাস ও সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবেককে এখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেন। তখন তিনি এই মসজিদটি নির্মাণের নির্দেশ দেন। এটি ৫৯৪ হিজরির ঘটনা। এরপর শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ ৬২৭ হিজরিতে তিন দিকে দুটি করে দরজা নির্মাণ করেন। এই মসজিদটি বিশ্বের বিস্ময়কর নির্মাণগুলোর একটি। গোটা দুনিয়ায় এর উদাহরণ বিরল। আল্লামা ইকবাল এটা নিয়ে খুবই হৃদয়স্পর্শী শোকগাথা রচনা করেছেন।

[২] এটি সম্পূর্ণ লোহার একটি স্তম্ভ। কিন্তু এর বৈশিষ্ট্য হলো, আজ পর্যন্ত এটি রং করা হয়নি। অথচ প্রায় দেড় হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে।

[৩] এটি বাকার মাজিতের মূর্তি।

[৪] মুসলিম বাদশারা মন্দিরগুলো মসজিদে রূপান্তর করতেন। এটি ছিল একটি ষড়যন্ত্র। ধর্মের আড়ালে তারা তা করতেন।

[৫] দুনিয়ার অদ্বিতীয় মিনার, যা কুতুবুদ্দিন আইবেক বানিয়েছিলেন। প্রতি শুক্রবার এখান থেকে তাকবির ধ্বনিত হতো। এটাও শিহাবুদ্দিন ঘুরির নির্দেশে বানিয়েছিলেন। এর পূর্ণতা দেন ঘুরির আরেক ক্রীতদাস শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ। এর উচ্চতা ২৩৮ ফুট। সিঁড়ি ৩৭৮টি। মসজিদে কুওয়াতুল ইসলাম, কুতুব মিনার ও দিল্লির অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থাপনার বিস্তারিত আলোচনা স্যার সাইয়েদের 'আসারুস সানাবিদ', ডেপুটি নজির আহমাদের 'খালফুস সিদক' ও বশিরুদ্দিন আহমাদের 'তারিখে সালতানাতে দেহলি' বইয়ে আছে।—রইসুদ্দিন আহমাদ জাফরি।

অনায়াসে উঠতে পারবে। একজন বিশ্বস্ত মানুষ আমাকে জানিয়েছেন, যখন এই মিনার বানানো হচ্ছিল তখন আমি মালপত্র নিয়ে হাতিকে উঠতে দেখেছি। এই মিনারটি মুইজুদ্দিন বিন নাসিরুদ্দিন বিন ইলতুতমিশ বানিয়েছিলেন।[১] কুতবুদ্দিন খিলজির ইচ্ছা ছিল পশ্চিম দিকের বারান্দায় আরেকটি মিনার বানাবেন, যা এই মিনারটি থেকে আরো বড় ও উঁচু হবে। এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ বানিয়েছিলেন। কিন্তু এর মধ্যেই তিনি মারা যান। সুলতান মুহাম্মাদ তুঘলক এটি সম্পন্ন করার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু এটাকে অমঙ্গলজনক মনে করে তা থেকে বিরত থাকেন। না হলে এই মিনারটি পৃথিবীর আশ্চর্যজনক স্থাপনাগুলোর একটি হতো। এটি ভেতর থেকে এতটা প্রশস্ত ছিল যে, তিনটি হাতি একসঙ্গে ওপরে উঠতে পারত। নির্মিত এক তৃতীয়াংশই উত্তর দিকের পুরো মিনারের সমান। একবার আমি এতে উঠেছিলাম। দেখলাম শহরের ঘরবাড়ি ও প্রাচীরগুলো অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও খুব ছোট মনে হচ্ছে। এর নিচে দাঁড়ানো মানুষকে ছোট শিশুর মতো মনে হচ্ছে। নিচে দাঁড়িয়ে দেখলে অসম্পন্ন মিনার প্রশস্ততার কারণে কম উঁচু মনে হয়ে থাকে। সুলতান কুতুবুদ্দিন খিলজি এখানে একটি মসজিদ বানানোর ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু একটি দেয়াল ও মেহরাব ছাড়া আর কিছু বানাতে পারেননি। সুলতান মুহাম্মাদ তুঘলক এই অসম্পন্ন কাজটি সম্পন্ন করার ইচ্ছা করলেন। নির্মাণ শ্রমিক ও কারিগরদের কাছ থেকে খরচের ব্যাপারে ধারণা নিলেন। জানতে পারলেন ৩৫ লাখ রুপি লাগবে। এই বিশাল ব্যয় দেখে তিনি ইচ্ছা বাদ দিলেন। তবে বাদশাহর এক ঘনিষ্ঠজন বলেছেন, এই ইচ্ছা বাদ দেওয়ার মূল কারণ হলো এটাকে তিনি অমঙ্গলজনক বলে মনে করেছেন। কেননা কুতুবুদ্দিন এটার কাজ শুরু করতেই মারা যান।

শামসি হাউজ, আলায়ি হাউজ, বিনোদন কেন্দ্র, সেখানকার মসজিদ ও নামায

দিল্লির বাইরে একটি হাউজ আছে, যা সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশের নামে পরিচিত।[২] শহরবাসী এটার পানি পান করে এবং শহরের ঈদগাহও

---

[১] মুইজুদ্দিন কায়কোবাদ ও মুইজুদ্দিন বিন সামের মধ্যে ইবনে বতুতা পার্থক্য করতে পারেননি।

[২] এই পুকুরের প্রশস্ততার বিষয়টি এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, আজও এটি রয়েছে ২৭৬ বিঘা জমি জুড়ে। হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ.-এর মাজার এর পাশেই অবস্থিত। এই পুরো হাউজটি লাল পাথর দ্বারা বানানো ছিল।

এর কাছাকাছি। এতে বৃষ্টির পানি জমা হয়। এর দৈর্ঘ্য দুই মাইল এবং প্রস্থে প্রায় এক মাইল। এর পশ্চিম দিকে ঈদগাহের পাশে পাথরের ঘাট বানানো। যা প্যাভিলিয়ন আকারে। এ ধরনের প্যাভিলিয়ন কয়েকটি আছে। প্যাভিলিয়ন থেকে পানি পর্যন্ত সিঁড়ি বানানো এবং প্যাভিলিয়নের কোণে গম্বুজ রয়েছে। যেখানে আগন্তুকরা এসে বসে। হাউজের মধ্যখানেও দুইতলা পাথরের গম্বুজ তৈরি করা। এই গম্বুজ দোতলা বিশিষ্ট। যখন পুকুরে পানি বেশি থাকে তখন নৌকা দিয়ে গম্বুজে যেতে হয়। আর পানি কম থাকলে হেঁটেই যাওয়া যায়। সেখানে একটি মসজিদ আছে। দুনিয়াবিরাগী ও আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল মানুষেরা সেখানে গিয়ে পড়ে থাকে। যখন হাউজের পাড় শুকিয়ে যায় তখন সেখানে আখ, তরমুজ, খরবুজা ও কুমড়া ইত্যাদি চাষ করে। খরবুজা ছোট তবে খুবই মিষ্ট হয়ে থাকে। দিল্লি ও রাজধানীর মধ্যখানে আরেকটি হাউজ আছে, যাকে 'খাস' হাউজ বলা হয়।[১] এই হাউজটি শামসি হাউজ থেকেও বড়। এর পাড়ে চল্লিশের কাছাকাছি গম্বুজ রয়েছে। এসব গম্বুজের আশপাশে যারা গান-বাদ্য করে তাদের বসবাস। এজন্য এটাকে 'তারাব আবাদ' বা গায়কদের আবাসস্থল বলা হয়। গায়কদের জন্য এখানে একটি বাজার আছে। আর সেখানে একটি মসজিদও আছে।[২] এছাড়াও এখানে আরো মসজিদ আছে। বলা হয়ে থাকে, গানবাদ্য করে এমন নারীরাও এই মহল্লায় থাকে। তারা রমযানে তারাবির নামায জামাতের সঙ্গে পড়ে। তাদের জন্য ইমাম নির্ধারিত আছে। এ ধরনের নারী সংখ্যায় অনেক। ডোম সম্প্রদায়ের অনেক লোকও এখানে থাকে। আমি আমির সাইফুদ্দিন ইবনে মেহনির বিয়েতে দেখেছি, যখনই আযান হলো প্রত্যেক ডোম অযু করে জায়নামায বিছিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেছে।[৩]

দিল্লিতে আল্লাহওয়ালাদের মাজারসমূহ

দিল্লির আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখ

এখানকার মাজারগুলোর মধ্যে হযরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকির মাজার বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এই মাজারটি নূরানি ও বরকতসমৃদ্ধ বলে

---

[১] এটি সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তী সময়ে ফিরোজ শাহ এটি সংস্কার করেন।

[২] এজন্যই বোধহয় গালিব বলেছেন, مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے

[৩] নর্তকি ও গায়কেরাও সেই যুগে আপাদমস্তক পাপাচারে লিপ্ত ছিল না।

প্রসিদ্ধ।[১] এর প্রতি জনসাধারণের ভক্তি অনেক বেশি। তাঁর 'কাকি' নামে পরিচিতি লাভের পেছনে একটা কাহিনি আছে। দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকেরা এসে তাঁর কাছে তাদের অভাবের কথা বললে কিংবা কোনো কন্যা দায়গ্রস্ত পিতা এসে সাহায্যের হাত পাতলে খাজা সাহেব স্বর্ণের একটি কাক (মুষ্টি) দিয়ে দিতেন। এতে তাঁর নাম পড়ে যায় 'কাকি'। দ্বিতীয় মাজার ফকিহ্ নূরুদ্দিন কারলানীর। তৃতীয় মাজারটি আলাউদ্দিন কিরমানির। এই মাজারের বরকতের বিষয়টি স্পষ্ট এবং নূরের বিচ্ছুরণ লক্ষণীয়। এটি ঈদগাহের পেছন দিকে। এখানে আরো অনেক আউলিয়ার মাজার আছে।

দিল্লির জীবিত আলেমদের মধ্যে আছেন শায়খ মাহমুদ।[২] তিনি অনেক বুযুর্গ আলেম। মানুষের ধারণা, অদৃশ্যের ওপর তাঁর হাত আছে। কেননা প্রচুর পরিমাণে খরচ করেন, কিন্তু বাহ্যত কোনো আয় নেই। প্রত্যেক মুসাফিরের রুটির ব্যবস্থা করেন এবং তাদের মধ্যে অর্থকড়ি ও সোনা-রুপা বণ্টন করেন। তিনি কারামত সমৃদ্ধ বুযুর্গ। তাঁর কারামাতের বিষয়টি মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত। আমি কয়েকবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি এবং বরকত হাসিল করেছি।

---

[১] হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহ. তাঁর যুগের বড় অলি ছিলেন। হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি রহ.-এর হাতে বাইআত লাভ করেন। এবং তাঁর নির্দেশেই দিল্লিতে এসে তাবলিগের কাজ আঞ্জাম দেন।

'কাক' অর্থ হচ্ছে টিক্কা, আর এখান থেকে যে বরকত হাসিল হয় সবই এই 'কাক' এর কারণে।

কথিত আছে, তাঁর স্ত্রী একটি দোকান থেকে বাকিতে রুটি আনতেন। একবার তাঁর স্ত্রীকে ওই দোকানদার কিছুটা কটু কথা বলেন। এতে তিনি স্ত্রীকে বাকি আনতে বারণ করেন। আর বলে দেন, যখন প্রয়োজন হবে তাকের ওপর হাত দিলেই রুটি পাবে। সুতরাং তিনি যখন সেখানে হাত দিতেন গরম গরম রুটি পেয়ে যেতেন।

এই মাজারের চার দেয়াল তৈরি করেছিলেন শের শাহ সুরি। পরে মর্মর পাথরের পুরো ইমারত নির্মাণ করে হিন্দুস্তানের সরকার, সেটা ১৯৪৭ সালে। যখন দিল্লি মুসলিমদের খুনে রঞ্জিত হয় তখন এই দরসগাহও আর সুরক্ষিত থাকেনি। আর এর পবিত্রতা নষ্টের ক্ষেত্রেও কোনো ত্রুটি করেনি। সগোত্রীয়দের এই কর্মকাণ্ডে গান্ধীজি অনেক কষ্ট পান এবং তিনি আমরণ অনশন শুরু করেন, তখন এটি মেরামত করা হয়। পরবর্তী সময়ে যখন এখানে ওরস হয় গান্ধীজিও এতে যোগ দেন।

হযরতের ইন্তেকালেরও একটি ঘটনা আছে। একবার কাওয়ালিরা মজলিসে এই শের (কবিতা) পাঠ করেন,

کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است

এটা শুনে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই তাঁর প্রাণপাখি উড়ে যায়।

[২] সম্ভবত তিনি দিল্লির চেরাগ খ্যাত নাসিরুদ্দিন মাহমুদ।

শায়খ আলাউদ্দিন[১] নায়লি নামে একজন বুযুর্গ আছেন। তিনি শায়খ নিজামুদ্দিন বাদায়ুনির খলিফা। তিনি প্রতি জুমায় ওয়ায করেন। অনেক শ্রোতা তাঁর হাতে তাওবা করেন এবং মাথা মুণ্ডিয়ে শুদ্ধতার পথ বেছে নেন। একবার তিনি ওয়ায করছিলেন, আমিও তখন হাজির হয়েছিলাম। কারী সাহেব পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পড়লেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ.

শায়খ আয়াতটি পুনরায় পড়ালেন এক ফকির মসজিদের কোণ থেকে চিৎকার দিয়ে উঠলেন। শায়খ আয়াতটি আবার পড়ালেন। ফকির আবার চিৎকার দিলেন এবং ছটফট করে মারা গেলেন। আমি তার নামাযে জানাযা পড়লাম।

উঁচুমাপের একজন আলেম সদরুদ্দিন কাহরানি। তিনি দিনে রোজাদার আর রাতে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকেন। দুনিয়া একদম ছেড়ে দিয়েছেন। কাপড় বলতে একটি কম্বল। বাদশাহ ও আমিররা তাঁর সাক্ষাতে আসেন, কিন্তু তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখেন। একবার বাদশাহ অনুরোধ করলেন, লংগরখানার খরচ নির্বাহের জন্য যেন কিছু হাদিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণের অস্বীকৃতি জানালেন। এই বুযুর্গ তিন দিনের কমে রোযা ভাঙতেন না। কেউ তাঁর কাছে আরজ করলেন, এর কী কারণ? তিনি বলেন, যতক্ষণ আমি বাধ্য হয়েছি ততক্ষণ আমি রোযা ভাঙি না। আর অপারগ অবস্থায় তো মৃত প্রাণীও হালাল।[২]

আরেকজন যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ কামালুদ্দিন আবদুল্লাহ আরি। তিনি শায়খ নিজামুদ্দিন বাদায়ুনির খানকার পাশে একটি গুহায় থাকতেন। আমি তিন বার ওই গুহায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমি তাঁর যে কারামত দেখেছি সেটা হলো, একবার আমার এক ক্রীতদাস পালিয়ে গেল। আমি তাকে এক তুর্কির কাছে দেখলাম এবং ফিরিয়ে আনতে চাইলাম। শায়খ তাতে বারণ

---

[১] হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়ার খলিফা ছিলেন। তিনি উধ প্রদেশের বাসিন্দা ছিলেন।

[২] فمن اضطر غير باغ ولا عاد এই আয়াতের দিকে ইশারা।—রইস আহমাদ জাফরি।

করলেন। বললেন, এই ক্রীতদাস আপনার উপযুক্ত না, তাকে চলে যেতে দিন। যেহেতু ওই তুর্কি আমার সঙ্গে মীমাংসা করতে চাচ্ছিলেন এজন্য একশ দিনার নিয়ে ক্রীতদাসের দাবি ছেড়ে দিলাম। ছয় মাস পর আমি শুনলাম সেই ক্রীতদাস তার মনিবকে হত্যা করেছে। তাকে ধরে বাদশাহর কাছে আনা হলো। বাদশাহ তাকে তুর্কির ছেলেদের কাছে সোপর্দ করে দিলেন যাতে রক্তপণ আদায় করতে পারে। তারা এই ক্রীতদাসকে মেরে ফেললো। এই কারামত দেখে—আমি শায়খের ভক্ত হয়ে গেলাম। সবকিছু ছেড়ে দিয়ে তাঁর চাকরি গ্রহণ করি। আমি দেখলাম, তিনি দশ দিন বিশ দিন করে রোযা রাখেন। আর রাতের বেশির ভাগ সময় ইবাদতে কাটান। বাদশাহ আমাকে ফেরত ডেকে পাঠানো এবং দুনিয়ার সঙ্গে আবার সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি তাঁর খেদমতে পড়ে রইলাম। আল্লাহ যেন কল্যাণের সঙ্গে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান।[১]

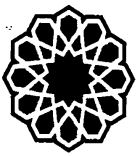

[১] ইবনে বতুতা দিল্লির সুফিয়ায়ে কেরামের যে আলোচনা করলেন সেটা স্বস্থানে অবশ্যই সত্য। তবে এ ব্যাপারে বিস্মিত হতে হয়, তিনি কারো কারো একদম আলোচনা করেননি আবার কারো আলোচনা খুব আগ্রহের সঙ্গে করেছেন। যেমন সুলতানজি অর্থাৎ খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়ার আলোচনা না করার মতোই। যদিও তিনি ওই সময় ইন্তেকাল করে চলে গেছেন। কিন্তু তারপরও দিল্লির আনাচে-কানাচে তাঁর আলোচনা হতো।

এমনিভাবে আমির খসরুর ব্যাপারে সম্ভবত তাঁর অজানা বিস্ময়কর। আমির খসরুও সম্ভবত এর আগেই ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রভাব এত গভীর ছিল যে, দিল্লির বিভিন্ন সুলতানের ব্যক্তিত্বের ওপর বরং তাদের জীবনের ওপর এত বেশি যে, তা কখনো মুছে যাওয়ার মতো নয়। তা কখনো উপেক্ষা করার মতো নয়। যদিও ইবনে বতুতা তাঁর ব্যাপারে কিছুই বলেননি।–রইস আহমাদ জাফরি।

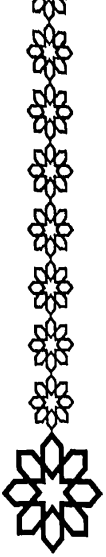

দিল্লিতে মুসলিম শাসন

*

দিল্লির শাসক ও সুলতানরা

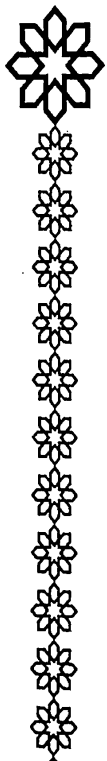

কুতুবুদ্দিন আইবেক

যিনি দিল্লি জয় করেন, কুতুব মিনার নির্মাণ করেন এবং মসজিদে কুওয়াতুল ইসলামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

প্রধান বিচারপতি আল্লামা কামালুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বুরহানুদ্দিন সদরে জাহাঁ আমাকে বলেছেন, দিল্লি জয় হয় ৫৮৪ হিজরিতে। দিল্লি জামে মসজিদের মেহরাবেও এই তারিখ লেখা আছে, যা আমি নিজে পড়েছি।[১] দিল্লি জয় করেন কুতুবুদ্দিন আইবেক। তিনি গজনি ও খুরাসানের বাদশাহ শিহাবুদ্দিন মুহাম্মাদ সাম ঘুরির[২] ক্রীতদাস[৩] ও সেনাপতি ছিলেন। এই মুহাম্মাদ বিন ঘুরি, সুলতান ইবরাহিম বিন সুলতান গাজি মাহমুদ গজনবি, যিনি ভারত বিজয় শুরু করেছিলেন, তার দেশ জোর করে দখল করেন। সুলতান শিহাবুদ্দিন কুতুবুদ্দিনকে একটি বড় বাহিনী দিয়ে হিন্দুস্তানে পাঠান। তিনি প্রথমে লাহোর জয় করেন এবং সেখানে বসবাস শুরু করেন। পরে তিনি একজন মহান বাদশাহ হিসেবে পরিচিতি পান।

বাদশাহর সাথীসঙ্গীরা একবার সমালোচনা করল—তিনি হিন্দুস্তানে পৃথক বাদশাহি প্রতিষ্ঠা করে আনুগত্যের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যেতে চান। এই খবর কুতুবুদ্দিনের কাছেও পৌঁছে যায়। তিনি একা-একা গজনিতে চলে এলেন এবং রাতের বেলা এসে পৌঁছালেন। এসেই বাদশাহর দরবারে হাজির হলেন। তিনি আসছেন এটা সমালোচকরা জানত না। পরদিন যখন বাদশাহ দরবারে এলেন, কুতুবুদ্দিন চুপি চুপি সিংহাসনের নিচে বসে রইলেন। যখন সবাই বসে গেল তখন বাদশাহ কুতুবুদ্দিন আইবেক সম্পর্কে সবাইকে

---

[১] শিলালিপি পড়তে ইবনে বতুতার ভুল হয়েছে। মূলত দিল্লি ৫৮৯ হিজরিতে জয় হয়।

[২] সুলতান শিহাবুদ্দিন ঘুরি খুবই দৃঢ়চেতা মানুষ ছিলেন। প্রথম বার অনভিজ্ঞতা এবং সেনা সংখ্যার স্বল্পতার কারণে পৃথ্বীরাজের সঙ্গে পরাজিত হয়ে ফিরে যান। কিন্তু শপথ করেন, যতদিন পৃথ্বীরাজকে পরাজিত না করব, ততদিন দুনিয়ার স্বাদ আমার ওপর হারাম। যারা পরাজয়ের সময় পালিয়ে যায় তাদের তিনি কঠিন শাস্তি দেন।

পরবর্তী সময়ে পুনরায় হামলা করে পৃথ্বীরাজকে চরমভাবে পরাজিত করেন এবং তাকে হত্যা করেন। পৃথ্বীরাজের সময় হিন্দুস্তানের প্রকৃত রাজধানী ছিল আজমিরে। দিল্লি ছিল নামমাত্র রাজধানী। ঘুরি আজমির জয় করে ফিরে যান। দিল্লি জয়ের দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আঞ্জাম দেন কুতুবুদ্দিনের উপদেষ্টা ও সহযোগী আইবেক।–রইস আহমাদ জাফরি।

[৩] ইসলামে ক্রীতদাসরা দুনিয়ার সব দেশে যে মর্যাদা ও প্রতিপত্তি লাভ করেছে এর উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও নেই।–জাফরি।

জিজ্ঞেস করলেন। যারা চোগলখোর ছিল তারা একযোগে বলে উঠল, আমরা ভালো করে জানি তিনি স্বতন্ত্র বাদশাহ হয়ে বসে আছেন। বাদশাহ সিংহাসনে পা দ্বারা শব্দ করে এবং হাততালি বাজিয়ে বললেন, আইবেক! কুতুবুদ্দিন তখন হাজির বলে বেরিয়ে এলেন এবং সবার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। চোগলখোররা লজ্জায় লাল হয়ে গেল এবং তারা ভয়ে যেন মাটিতে মিশে যেতে চাইল।

বাদশাহ বললেন, তোমাদের অপরাধ এবারের মতো ক্ষমা করে দেওয়া হলো। আর কখনো আইবেকের বিরুদ্ধে তোমরা আমাকে কিছু বলবে না। কুতুবুদ্দিন আইবেককে নির্দেশ দিলেন হিন্দুস্তানে চলে যেতে। তিনি ফিরে এলেন এবং দিল্লি শহর জয় করলেন। অন্যান্য শহরও জয় করলেন। সেই সময় থেকে দিল্লি রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। কুতুবুদ্দিন দিল্লিতেই ইন্তেকাল করেন।[১]

সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ

ন্যায়বিচারক, সৎ, যোগ্য ও দাতা বাদশাহ

সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ।[২] দিল্লির প্রথম স্বতন্ত্র বাদশাহ। এর আগে তিনি কুতুবুদ্দিনের ক্রীতদাস, সেনাপতি ও সহযোগী ছিলেন। কুতুবুদ্দিনের ইন্তেকালের পর স্বতন্ত্র বাদশাহ হন এবং লোকদের কাছ থেকে বাইআত গ্রহণ শুরু করেন। সমস্ত আলেম ও ফকিহ কাজি ওজিহুদ্দিন কাশানির সঙ্গে এলেন এবং তাঁর সামনে বসে গেলেন। কাজিও যথারীতি তাঁর সামনে বসে গেলেন। বাদশাহ বুঝে গেলেন তারা কী বলতে চাচ্ছেন। তিনি নিজের বিছানার কোণা থেকে একটি কাগজ বের করে কাজি সাহেবের হাতে দিলেন। এর দ্বারা জানা গেল, কুতুবুদ্দিন তাঁকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।[৩] কাজি ও ফকিহরা সবাই কাগজটি পড়লেন এবং তাঁর হাতে বাইআত নিলেন।[৪] বিশ বছর পর্যন্ত তিনি শাসন করেন। তিনি অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ, সৎ

---

[১] কুতুবুদ্দিন লাহোরে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় ঘোড়া থেকে পড়ে মারা যান। সেখানে তাঁর কবরও আছে। সেই মহল্লাটি 'আইবেক রোড' নামে পরিচিত। বর্তমানে পাকিস্তান সরকার প্রাচীন স্থাপনা ভেঙে এই কবরস্থানকে আধুনিক স্থাপনায় নির্মাণের কথা ভাবছে।

[২] ইবনে বতুতা কীভাবে الملش লিখেছেন। অথচ শামসুদ্দিনের সময়কালের যত বইপত্র আছে সবখানে স্পষ্টভাবে ইলতুতমিশ লেখা আছে। কবিদের কবিতায়ও এই শব্দটি পাওয়া যায়।

[৩] ক্রীতদাস শাসক কিংবা আমির হতে পারে না।

[৪] বিষয়টি যখন স্পষ্ট হয়ে যায় তখন সবাই কোনো গড়িমসি ছাড়াই বাইআত গ্রহণ করেন।

ও যোগ্য মানুষ ছিলেন। তিনি জুলুম মূলোৎপাটন এবং মজলুমকে সহযোগিতার ব্যাপারে খুব কঠোর ছিলেন। নির্দেশ ছিল, কেউ কোনো জুলুমের শিকার হলে সে যেন রঙিন কাপড় পরে, যাতে বাদশাহ তাকে সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেলতে পারে। কেননা হিন্দুস্তানে তখন সাধারণত সাদা রঙের কাপড় পরতো সবাই। আর রাতের বেলার জন্য গেইটের পাশের কুঠুরিতে দুটি মর্মর পাথর ছিল। সেগুলোতে শিকল বাঁধা ছিল। কোনো মজলুম এসে সেই শিকলে টান দিলেই বাদশাহ বুঝে ফেলতেন কোনো মজলুম এসেছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এই মুকাদ্দমা নিয়ে বসে যেতেন। সামান্য সময়ও অপেক্ষা করা তিনি পছন্দ করতেন না। বললেন, রাতের বেলা লোকদের ওপর জুলুম হবে আর তারা সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, তা হতে পারে না। সুতরাং তিনি রাত যত গভীর হোক উভয় পক্ষকে ডেকে সমাধান করে দিতেন।

সুলতান রুকনুদ্দিন

ন্যায়বিচারক বাবার অত্যাচারী ছেলে

সুলতান শামসুদ্দিনের তিন ছেলে ছিল। রুকনুদ্দিন, মুইজুদ্দিন ও নাসিরুদ্দিন। আর এক মেয়ে রাজিয়া। ইলতুতমিশের ইন্তেকালের পর তাঁর ছেলে রুকনুদ্দিন সিংহাসনে বসেন।[১] তিনি প্রথম যে কাজটি করেন সেটা হলো ভাই মুইজুদ্দিনকে হত্যা করেন। মুইজুদ্দিন রাজিয়ার সহোদর এবং রুকনুদ্দিনের বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন। এতে রাজিয়া অনেক ক্ষুব্ধ হন। বাদশাহ চাইলেন তাকেও হত্যা করতে। একদিন রুকনুদ্দিন জুমার নামাযের জন্য মসজিদে গেলেন। এই সুযোগে রাজিয়া মজলুমদের পোশাক পরে পুরোনো শাহি মহল অর্থাৎ দৌলতখানার ছাদের ওপর উঠলেন, যা মসজিদের সঙ্গে লাগোয়া। তিনি সেখান থেকে চিৎকার করে লোকদের নিজের বাবার ন্যায়নিষ্ঠার কথা মনে করিয়ে দেন এবং বলেন– রুকনুদ্দিন আমার ভাইকে হত্যা করেছেন। এখন আমাকেও মারার ষড়যন্ত্র করছেন। এতে লোকেরা উত্তেজিত হয়ে রুকনুদ্দিনকে মসজিদে ঘিরে ধরে। ভাইকে হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে জনসাধারণ তাকে মেরে ফেলে।[২]

---

[১] শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ তাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেছিলেন।

[২] কারো কারো মতে, রুকনুদ্দিন বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঞ্জাবে গিয়েছিলেন। আর এদিকে কোনো কোনো আমির মিলে রাজিয়াকে সিংহাসনে বসান।

সুলতানা রাজিয়া

সচেতন, জ্ঞানী, সাহসী ও দৃঢ়চেতা নারী শাসক

যেহেতু তৃতীয় ভাই নাসিরুদ্দিন তখনো ছোট ছিল, এজন্য সেনাবাহিনী ও আমিররা তাঁকে সুলতানা (শাসক) নিযুক্ত করল। তিনি চার বছর রাজত্ব পরিচালনা করেন। এই সুলতানা[১] পুরুষের মতো অস্ত্র নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে রণাঙ্গনে যেতেন। নিজের চেহারা খোলা রাখতেন। যখন তার ওপর অপবাদ আরোপ করা হয় যে, এক হাবশি ক্রীতদাসের[২] সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে, তখন লোকেরা সম্মিলিতভাবে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। আর একজন নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়।[৩] এরপর ভাই নাসিরুদ্দিন[৪] বাদশাহ নিযুক্ত হন। সুলতানা রাজিয়া সিংহাসন থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়ার পর তার ছোট ভাই দীর্ঘদিন শাসন করেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যে বোন সুলতানা রাজিয়া এবং তার স্বামী—তাদের ক্রীতদাস ও সহযোগীদের নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। নাসিরুদ্দিনের সহযোগী বলবন—যিনি পরবর্তী সময়ে বাদশাহ নিযুক্ত হন, তিনি সুলতানা রাজিয়ার বাহিনীকে পরাজিত করেন। রাজিয়া ময়দান থেকে পালিয়ে যান। যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এবং ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ তখন এক কৃষককে হালচাষ করতে দেখলেন। তার কাছে কিছু খাবার চাইলেন। কৃষক তাকে রুটির টুকরো দিলেন। তিনি তা খেয়ে শুয়ে গেলেন। তখন তিনি পুরুষের কাপড় পরা ছিলেন। এ সময় ওই কৃষকের দৃষ্টি যায় তার গলার দিকে। সেখানে হিরা-জহরত চোখে পড়ে। তখন কৃষক বুঝে গেল যে, তিনি নারী। শোয়া অবস্থাতেই তাকে হত্যা করে কাপড় ও অন্যান্য আসবাব ছিনিয়ে নিল। তার ঘোড়াটিও নিয়ে গেল। সুলতানা রাজিয়ার লাশ জমিতে পুঁতে রাখলো। এরপর কৃষক কাপড়গুলো

---

[১] সব ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত যে, রাজিয়া অত্যন্ত সাহসী ও বুদ্ধিমতী নারী ছিলেন। তিনি তার বাবার জীবদ্দশাতেই রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দেন। নিয়মিত কুরআনে কারিমের তেলাওয়াত করতেন। ইলতুতমিশ গোয়ালিওর বিজয়ের পর রাজিয়াকে এর গভর্নর বানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাজদরবারের আমিররা এর বিরোধিতা করেন। তখন তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, আমার ছেলেরা তো মদ-জুয়া আর প্রবৃত্তি পূজায় লিপ্ত!

[২] অথবা কুওয়াত হাবশি, যিনি আমিরুল উমারা হয়েছিলেন। তবে এটা নিছক অপবাদ ছিল।

[৩] বাথিন্ডার গভর্নর মালিক ইখতিয়ারুদ্দিন।

[৪] ইবনে বতুতা পুরো আলোচনা করেননি। প্রকৃত ঘটনা হলো, সুলতানা রাজিয়ার পর তার ভাই মুইজুদ্দিন বাহরাম শাহ বাদশাহ হন। এরপর রুকনুদ্দিনের ছেলে আলাউদ্দিন মাসউদ সিংহাসনে বসেন। এরপর নাসিরুদ্দিনের পালা আসে।

স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতে গেল। লোকদের সন্দেহ হলো। তখন তারা ওই কৃষককে পুলিশের কাছে নিয়ে গেল। তাকে কিছু মারধর করার পর তিনি সব স্বীকার করলেন। লাশ কোথায় পুঁতে রেখেছেন, সেটাও বললেন। পরে সেখান থেকে লাশ উদ্ধার করা হয় এবং গোসল ও কাফনসহ আবার সেখানেই দাফন করা হয়। এরপর তার কবরে একটি গম্বুজ বানানো হয়। তার কবর জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। যমুনা নদীর তীরে শহর থেকে তিন ফারসাখ (সাড়ে তিন মাইল দূরত্বে) এটি অবস্থিত।

সুলতান নাসিরুদ্দিন

দরবেশ চরিত্রের একজন বাদশাহ

সুলতানা রাজিয়ার পর নাসিরুদ্দিন বাদশাহ হলেন। তিনি ধারাবাহিকভাবে বিশ বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি অত্যন্ত সৎ ও নিষ্ঠাবান শাসক ছিলেন। কুরআন শরিফ অনুলিপি করে এর মজুরি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। কাজি কামালুদ্দিন তাঁর হাতে লেখা কুরআন শরিফ আমাকে দেখিয়েছেন। তাঁর খত (হাতের লেখা) অনেক সুন্দর ছিল। সহযোগী গিয়াসুদ্দিন তাঁকে হত্যা করেন[১] এবং নিজে বাদশাহ হন।

সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন

ক্রীতদাস থেকে রাজ সিংহাসনে

বলবন নিজের মনিবকে হত্যা করে নিজেই ক্ষমতায় আরোহণ করেন এবং বিশ বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এর আগে বিশ বছর সহযোগী হিসেবেও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দেন। এই বাদশাহ ন্যায়নিষ্ঠ প্রকৃতির, সহিষ্ণু ও অত্যন্ত সচ্চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি আলেম ও জ্ঞানী-গুণী ছিলেন। তিনি একটি বাড়ি বানিয়েছিলেন। এর নাম রেখেছিলেন দারুল আমান। যে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করত তার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া হতো। কোনো হত্যাকারী কিংবা অপরাধী সেই বাড়িতে প্রবেশ করলে মৃত বা

---

[১] এটা ভুল, নাসিরুদ্দিনের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল।

সমস্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত যে, তাঁর মৃত্যু অস্বাভাবিক ছিল না; বরং তিনি অসুস্থ হয়ে স্বাভাবিকভাবে মারা গেছেন।

প্রকৃত বিষয় হলো, ইবনে বতুতা মাঝে মাঝে শোনা কথাও ঘটনা আকারে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইতিহাস সর্বাবস্থায় ইতিহাস, এর প্রতিটি কথা সূত্র দাবি করে।

মজলুম ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের রক্তপণ আদায়ে সম্মত করা হতো। তাঁকে এই বাড়িতেই সমাহিত করা হয়। আমি তাঁর কবর দেখেছি।

এই বাদশাহর ব্যাপারে একটি বিস্ময়কর ঘটনা প্রচলিত আছে। কথিত আছে, বুখারার বাজারে এক ফকিরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। বলবন খাটো দেহ ও দেখতে কুশ্রী ছিলেন। ফকির তাঁকে লক্ষ করে বললেন—হে তুর্কি! তিনি জবাবে বললেন—হাজির হে আখুন্দ (সম্মানসূচক সম্বোধন)! ফকির এতে খুব খুশি হলেন এবং বললেন, আমাকে আনার কিনে দাও। তিনি বললেন, ঠিক আছে। তিনি পকেট থেকে কিছু পয়সা বের করলেন এবং এগুলোই ছিল তাঁর যাবতীয় পুঁজি। পরে তিনি তা দিয়ে আনার কিনে ফকিরকে দিলেন। ফকির সেই আনার গ্রহণ করে বললেন—আমি তোমাকে হিন্দুস্তানের বাদশাহি দান করলাম। বলবন তার হাতে চুমু খেয়ে বললেন, আমি গ্রহণ করলাম।

ঘটনাক্রমে সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ এক সওদাগর পাঠিয়ে বুখারা, তিরমিয ও সমরকন্দ থেকে তার জন্য ক্রীতদাস কেনালেন। ওই সওদাগর একশ গোলাম কিনলেন, এর মধ্যে বলবনও ছিলেন। যখন বাদশাহর সামনে এই ক্রীতদাসদের হাজির করা হয় তখন সব ক্রীতদাস পছন্দ হলেও বলবনকে বাদশাহর পছন্দ হলো না। বাদশাহ বললেন, আমি এই ক্রীতদাস নেব না। বলবন আরজ করলেন, হে মহান বাদশাহ! আপনি এই ক্রীতদাসদের কার জন্য কিনেছেন? বাদশাহ বললেন, আমার নিজের জন্য। তখন বলবন আরজ করলেন, হে মহান অধিপতি! নিরানব্বই গোলাম আপনি নিজের জন্য কিনেছেন, একটি মাত্র গোলাম আল্লাহর জন্য কিনুন। এই কথা শুনে ইলতুতমিশ হাসলেন এবং বলবনকেও কিনে নিলেন। বাদশাহ বলবনকে পানি আনার দায়িত্ব দিলেন।

জ্যোতিষীরা বাদশাহকে জানালেন, আপনার সন্তানদের কাছ থেকে আপনার একজন ক্রীতদাস ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবে এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে। জ্যোতিষীরা অব্যাহতভাবে এটা বলত। কিন্তু বাদশাহ তাঁর সদাচার ও ন্যায়নিষ্ঠার কারণে তাদের কথায় কর্ণপাত করতেন না। অবশেষে জ্যোতিষীরা কথাটি বাদশাহর স্ত্রীকে বলেন। স্ত্রী যখন বাদশাহকে কথাটি বললেন তখন তার অন্তরে এটি রেখাপাত করল। তিনি জ্যোতিষীদের ডেকে বললেন, তোমরা কি ওই লোকটিকে চিনো? তারা বললেন, ওই লোকটির

মধ্যে কিছু নিদর্শন আছে, সেটা দেখে আমরা চিনতে পারব। বাদশাহ নির্দেশ দিলেন, আগামীকাল সব ক্রীতদাস আমার সামনে দিয়ে হেঁটে যাবে। নির্ধারিত সময়ে বাদশাহ বসে গেলেন। দলে দলে বাদশাহর সামনে দিয়ে অতিবাহিত হতে লাগল। আর জ্যোতিষীরা দেখে দেখে বলতে লাগলেন, এদের মধ্যে ওই ব্যক্তি নেই। এভাবে যোহরের সময় হয়ে গেল। পানি বহনকারী দলের পালা তখনো আসেনি। তাদের প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে। সুতরাং টাকা উঠিয়ে বলবনকে বাজারে পাঠালো—রুটি আনতে। বলবন কাছের বাজারে গিয়ে রুটি পেলেন না। চলে গেলেন আরেকটি বাজারে, যা একটু দূরে ছিল।

যখন পানি বাহকদের পালা এলো বলবন তখনো বাজার থেকে ফিরেননি। তারা একজনকে কিছু অর্থের বিনিময়ে বলবনের পানি বহনের পাত্র ও অন্যান্য আসবাব বহন করালো। বলবনের পরিবর্তে তাকে বাদশাহর সামনে উপস্থাপন করালো। যখন বলবনের নাম ডাকা হলো তখন সেই ছেলে সামনে এলো। যাচাই-বাছাই শেষ হলো, কিন্তু জ্যোতিষীরা তাদের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে পেলেন না। পানি বহনকারীদের পালা শেষ হওয়ার পর বলবন ফিরে এলেন। কেননা আল্লাহর কুদরতি সিদ্ধান্ত পূরণ হওয়ার ছিল। বলবন তার যোগ্যতা দিয়ে আস্তে আস্তে উন্নতি করতে লাগলেন। একপর্যায়ে পানি বহনকারীদের প্রধান হয়ে গেলেন। এরপর সেনাবাহিনীতে ঢুকলেন এবং উন্নতি করতে করতে সেনাবাহিনীর প্রধান হলেন। সুলতান নাসিরুদ্দিন বাদশাহ হওয়ার আগে নিজের মেয়েকে বলবনের সঙ্গে বিয়ে দেন।[১] যখন নাসিরুদ্দিন বাদশাহ হলেন তখন বলবনকে নিজের সহযোগী বানালেন। তিনি বিশ বছর পর্যন্ত বাদশাহর সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। এরপর তিনি সুলতান নাসিরুদ্দিনকে হত্যা করেন এবং নিজেই বাদশাহ হয়ে যান।[২] বলবনের দুই ছেলে ছিলেন। বড় ছেলে খান শহিদ।[৩] তিনি তার বাবার পক্ষ থেকে সিন্ধের গভর্নর ছিলেন এবং থাকতেন মুলতানে। তিনি তাতারিদের

---

[১] বলবন ছিলেন ইলতুতমিশের জামাতা, নাসিরুদ্দিনের নয়। মোল্লা আবদুল কাদির বাদায়ুনির বক্তব্য দ্বারা এর সত্যায়ন হয়।

[২] একদম ভুল কথা। নাসিরুদ্দিনকে বলবন হত্যা করেননি। তিনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

[৩] তার নাম ছিল মুহাম্মাদ সুলতান। বাবার পক্ষ থেকে মুলতানের সুবেদার ছিলেন। যিনি তাতারিদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় ঠিক সেই মুহূর্তে মারা যান যখন বিজয় দ্বারপ্রান্তে। তার ব্যাপারে আমির খসরু খুবই হৃদয়স্পর্শী সঙ্গীত লিখেছেন। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানপিপাসু, বড় আলেম ও প্রখর মেধাবী ছিলেন।

সঙ্গে লড়াই করে এক যুদ্ধে মারা যান। তার ছিল দুই ছেলে। একজন কায়কোবাদ, আরেকজন কায়খসরু। আর বলবনের দ্বিতীয় ছেলের নাম ছিল নাসিরুদ্দিন। তিনি তার বাবার পক্ষ থেকে গৌড় ও বাঙলার গভর্নর ছিলেন। যখন খান শহিদ মারা গেলেন তখন বলবন তার ছেলেকে স্থলাভিষিক্ত বানালেন, নিজের ছেলেকে বানালেন না। এই নাসিরুদ্দিনেরও এক ছেলে ছিলেন, যিনি বাদশাহর কাছে থাকতেন এবং তার নাম ছিল মুইজুদ্দিন।

সুলতান মুইজুদ্দিন কায়কোবাদ

নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও রাজদরবারের আলো-ছায়া

সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন রাতের বেলা ইন্তেকাল করেন। তাঁর ছেলে নাসিরুদ্দিন (বাগরা খাঁ) বাঙালে ছিলেন। এজন্য তিনি তাঁর নাতি কায়খসরুকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। কিন্তু বাদশাহর সহযোগীর বিরোধ ছিল কায়খসরুর সঙ্গে। তিনি এই বাহানা করেন যে, বাদশাহ মারা যেতেই কায়খসরুর কাছে যান এবং সহমর্মিতা ও শোক প্রকাশ করে একটি বানোয়াট কাগজ দেখান, যেখানে সব আমির কায়কোবাদের কাছে বাইআত হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। আর তাকে বললেন, আমি আপনার প্রাণনাশের আশঙ্কা করছি। তখন কায়খসরু জানতে চান, আমি কী করতে পারি? তখন তাকে পরামর্শ দিয়ে বললেন, আপনি এখন সিন্ধে চলে যান। কায়খসরু বললেন, শহরের দরজা তো বন্ধ। বাদশাহর সহযোগী বললেন, চাবি আমার কাছে আছে। আমি আপনাকে দরজা খুলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কায়খসরু তার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ হন এবং রাতেই মুলতানের দিকে পালিয়ে যান।

যখন কায়খসরু শহর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেলেন তখন ওই সহযোগী মুইজুদ্দিনের কাছে গেলেন এবং তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললেন, সব আমির আপনার কাছে বাইআতের জন্য প্রস্তুত। মুইজুদ্দিন বললেন, আমার চাচাতো ভাইকে স্থলাভিষিক্ত বানানো হয়েছে। আমার হাতে বাইআত হওয়ার কী অর্থ! সহযোগী সব ঘটনা খুলে বললেন। তখন মুইজুদ্দিন তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সব আমির ও রাজদরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা রাতেই বাইআত গ্রহণ করেন।

পরে মুইজুদ্দিনের বাবা যখন তার ছেলে সিংহাসনে বসেছেন বলে খবর পেলেন তখন বললেন, সিংহাসনে বসার অধিকার আমার। আমার জীবদ্দশায়

ছেলে সিংহাসনে বসতে পারে না। তিনি নিজের বাহিনী প্রস্তুত করলেন এবং হিন্দুস্তানের দিকে আসতে লাগলেন। এদিকে সহযোগী বাদশাহকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করলেন। গঙ্গা নদীর তীরে দুই বাহিনী মুখোমুখি হলো। লড়াই যখন শুরু হবে তখন আল্লাহ তাআলা নাসিরুদ্দিনের অন্তরে এই কথা ঢেলে দেন যে, মুইজুদ্দিন তো তোমারই ছেলে! তোমার পরে তো তিনিই বাদশাহ হবেন। তাহলে অহেতুক রক্তপাতের দ্বারা কী লাভ! ছেলের অন্তরেও বাবার প্রতি ভালোবাসা সজীব হয়ে ওঠে। অবশেষে উভয় বাদশাহ নিজ নিজ নৌকায় চড়ে একত্রে মিলিত হন।

বাদশাহ তার বাবার পায়ে চুমু খান। নাসিরুদ্দিন ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বলেন, আমার যা অধিকার ছিল সেটা আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম। এই কথা বলে তিনি তার ছেলের কাছে বাইআত হয়ে গেলেন। এই সাক্ষাৎ পর্ব নিয়ে কবিরা নানা ধরনের কবিতা রচনা করেছেন। এই সাক্ষাতের নাম 'লিকাউস সাদাইন'[১] (দুই সৌভাগ্যবানের সাক্ষাৎ) রাখা হয়। পরে বাদশাহ তার বাবাকে দিল্লিতে নিয়ে গেলেন।[২] বাবা তার ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়ে আবার বাঙলায় ফিরে গেলেন এবং কয়েক বছর রাজত্ব করার পর মারা যান। সেখানে তার আরো সন্তানাদি আছে। তাদের মধ্যে এক ছেলে গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর, যাকে সুলতান গিয়াসুদ্দিন বন্দি করেন। তবে সুলতান মুহাম্মাদ তুঘলক তার বাবার ইন্তেকালের পর তাকে ছেড়ে দেন।

মুইজুদ্দিন চার বছর পর্যন্ত শাসন করেন। এর প্রতিটি দিন ঈদ এবং প্রতিটি রাত শবে বরাত ছিল। এই বাদশাহ খুবই দানশীল ও দয়ালু ছিলেন। তাকে যারা দেখেছেন তাদের কারো কারো সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তারা সুলতানের জ্ঞান, মানবতা ও দানশীলতার অনেক প্রশংসা করেছেন। তিনি দিল্লি জামে মসজিদের মিনার প্রতিষ্ঠা করেন। যা গোটা দুনিয়ায় নজিরবিহীন। আমোদ-ফূর্তি আর অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে তার এক পাশ অবশ হয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসকরা সব ধরনের চিকিৎসা করেন, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। যখন বাদশাহ একদম অচল হয়ে গেলেন তখন তার সহযোগী জালালুদ্দিন ফিরোজ বিদ্রোহ করেন এবং শহরের বাইরে কুব্বা জিশানির কাছে যে টিলা সেখানে ছাউনি স্থাপন করেন। মুইজুদ্দিন তার

---

[১] কিরানুস সাদাইন, তেমনি লিকাউস সাদাইনও সঠিক।

[২] এই বর্ণনাও সঠিক নয়। নাসিরুদ্দিন তার ছেলেকে শাসন কর্তৃত্বের অধিকার দিয়ে কিরা থেকে বাঙলায় ফিরে যান, তিনি দিল্লিতে যাননি।

আমিরদের লড়াইয়ের জন্য পাঠালেন। কিন্তু যে আমিরই লড়াইয়ের জন্য যেতেন ফিরোজের সঙ্গে গিয়ে সাক্ষাৎ করতেন এবং তার কাছে বাইআত হয়ে যেতেন। পরে জালালুদ্দিন শহরে ঢুকে রাজপ্রাসাদ অবরোধ করেন। ক্ষুধার যন্ত্রণায় বাদশাহর মৃতপ্রায় অবস্থা। একজন আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, প্রতিবেশীদের মধ্যে এক ভদ্রলোক খাবার পাঠাতেন। কিন্তু এক পর্যায়ে সেনারা রাজপ্রাসাদে ঢুকে বাদশাহকে হত্যা করে এবং জালালুদ্দিন বাদশাহ হন।

জালালুদ্দিন ফিরোজ খিলজি

সহিষ্ণু, দয়ালু ও সচ্চরিত্রের বাদশাহ

জালালুদ্দিন অত্যন্ত সজ্জন ও গুণী বাদশাহ ছিলেন। নম্রতাই তার মৃত্যুর কারণ হয়। যখন তিনি বাদশাহ হন তখন একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন নিজের নামে, যা পরবর্তী সময়ে সুলতান মুহাম্মাদ তুঘলক নিজের জামাতা গাদা বিন মুহান্নাকে দিয়েছিলেন। এই বাদশাহর এক ছেলে ছিলেন। তার নাম ছিল রুকনুদ্দিন। আর এক ভাতিজা ছিলেন, যার নাম ছিল আলাউদ্দিন। পরবর্তী সময়ে এই ভাতিজা জামাতাও হন। তিনি তাকে কারা মানিকপুরের গভর্নর নিযুক্ত করেন। এই এলাকাটি হিন্দুস্তানের মধ্যে সবচেয়ে সবুজাভ ও উর্বর মনে করা হতো। গম, ধান ও অন্যান্য শস্য এখানে অনেক বেশি হতো। এখানে দামি কাপড়ও তৈরি হতো। এই কাপড় দিল্লিতে বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া হতো। এই শহর দিল্লি থেকে আঠারো মনজিল দূরত্বে। আলাউদ্দিনের স্ত্রী[১] তাকে সবসময় অশান্তি দিতেন। তিনি এ ব্যাপারে নিজের চাচার কাছে অভিযোগ জানাতেন। শেষ পর্যন্ত দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়। আলাউদ্দিন একজন বীর, সাহসী ও প্রত্যয়ী মানুষ ছিলেন। কিন্তু তার কাছে অর্থকড়ি ছিল না। একবার তিনি দেওগিরে হামলা করলেন। এই শহর ছিল মালওয়া ও মারাঠাদের রাজধানী। সেখানকার রাজাকে হিন্দুস্তানে তৎকালীন সবচেয়ে বড় রাজা মনে করা হতো। পথ চলতে গিয়ে আলাউদ্দিনের ঘোড়ার পা একটি স্থানে দেবে যায় এবং সেখানে শক্ত কিছুর শব্দ পাওয়া যায়। আলাউদ্দিন জায়গাটি খুঁড়িয়ে সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ পেলেন। তিনি সেই সম্পদ পুরো বাহিনীর মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

---

[১] জালালুদ্দিনের এই মেয়ে যাকে ভাতিজা আলাউদ্দিনের সঙ্গে বিয়ে দেন, ফেরেশতার ভাষ্য অনুযায়ী রূপ-সৌন্দর্যে তার কোনো জুড়ি ছিল না। কিন্তু তার শাশুড়ির আচরণ ছিল তাচ্ছিল্যপূর্ণ। মেয়েও মায়ের সঙ্গ দিতেন। অতিষ্ঠ হয়ে আলাউদ্দিন 'কারা' চলে যান।

এরপর দেওগিরের দিকে রওনা করলেন। তখন সেখানকার রাজা কোনো লড়াই ছাড়াই বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন। অনেক অর্থকড়ি দিয়ে তাকে বিদায় করলেন।[১] আলাউদ্দিন 'কারা'য় ফিরে এলে বাদশাহর কাছে গনিমতের সম্পদ পাঠাননি। দরবারের লোকজন এ ব্যাপারে বাদশাহকে উত্তেজিত করেন। বাদশাহ তাকে ডেকে পাঠান। কিন্তু তিনি সেই ডাকে সাড়া দেননি। বাদশাহ নিজে এসে তাকে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। কেননা নিজের ছেলের চেয়ে তাকে বেশি ভালোবাসেন। বাদশাহ সফরের প্রস্তুতি নিয়ে 'কারা'র দিকে রওনা করলেন। নদীর তীরে যেখানে আলাউদ্দিন তাঁবু ফেলেন সেখানে গিয়ে নামেন। তিনি ভাতিজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নৌকায় করে চললেন। ভাতিজাও নৌকায় করে এলেন। তিনি আগেই চাকরদের বলে রেখেছিলেন, যখনই আমি বাদশাহর সঙ্গে গলা লাগাব তখন তোমরা তার কাজ খতম করে দেবে। সুতরাং তারা তাই করল। বাদশাহর বাহিনীর কিছু লোক আলাউদ্দিনের সঙ্গে মিলে গেল এবং কিছু লোক দিল্লিতে পালিয়ে গেল। তারা দিল্লিতে এসে বাদশাহর ছেলে রুকনুদ্দিনকে পরবর্তী বাদশাহ হিসেবে নিযুক্ত করল। রুকনুদ্দিন বাদশাহ হয়ে তার বাহিনী নিয়ে আলাউদ্দিনের সঙ্গে মোকাবেলার জন্য বের হলেন। কিন্তু তার বাহিনী গিয়ে আলাউদ্দিনের সঙ্গে মিলে গেল। পরে রুকনুদ্দিন সিন্ধের দিকে পালিয়ে গেলেন।[২]

সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি

একজন স্বাধীন প্রকৃতির সচেতন বাদশাহ

আলাউদ্দিন দিল্লিতে প্রবেশ করেন এবং বিশ বছর পর্যন্ত শাসনকর্তৃত্ব চালান। তাঁকে ভারতবর্ষের ভালো বাদশাহদের মধ্যে গণ্য করা হয়। হিন্দুস্তানের লোকেরা এখনো তার প্রশংসা করে। তিনি রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড নিজেই দেখভাল

---

[১] আলাউদ্দিনের এই কীর্তি এত বিশাল যে, এর উদাহরণ পাওয়া মুশকিল। একটু কল্পনা করে দেখুন, একজন মন মতো চলা যুবক মুষ্টিমেয় সেনা নিয়ে, নদী, বন ও প্রান্তর পেরিয়ে যান। সময়ের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যের ওপর হামলা করেন। ছয়শ মণ সোনা, সাতশ মণ মুক্তা, দুই মণ জওহর, লাল, ইয়াকুত, আলমাস ও জমরদ, দুই হাজার মণ রুপা নিয়ে এবং মহারাজাকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করে ফিরে আসেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাকে আলেকজান্ডারের সঙ্গে যে তুলনা করেছেন সেটা ভুল নয়।

[২] এটি ইতিহাসের অনেক বড় ট্রাজেডি। যদিও ইতিহাস এ ধরনের ঘটনা ও ট্রাজেডি দ্বারা ভরপুর। জালালুদ্দিনের এই পরিণতি শিক্ষণীয়ও। মানুষ সামষ্টিকভাবে যত ভালো গুণের অধিকারীই হোক না কেন, তাকে নিজের কৃতকর্মের ফল একদিন না একদিন ভোগ করতেই হয়।

করতেন। প্রতিদিন তিনি জিনিসপত্রের দামের ব্যাপারে ন্যায়পালের কাছ থেকে রিপোর্ট নিতেন। ন্যায়পালকে বলা হতো রইস। একবার তিনি ন্যায়পালকে জিজ্ঞেস করলেন, গোশতের দাম বাড়ার কারণ কী? তিনি বললেন, গরু-ছাগলের ওপর কর আদায় করা হয়। বাদশাহ ওই দিনই এ ধরনের কর ক্ষমা করে দিলেন। ব্যবসায়ীদের ডেকে রাজকোষ থেকে তাদের মূলধন দিলেন এবং বলে দিলেন এটা দিয়ে গরু-ছাগল কিনে বিক্রি করবে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে লাভ করবে। এমনিভাবে যে কাপড় দৌলতাবাদ থেকে আসত সেই কাপড়ের ব্যবস্থা করেন। একবার খাদ্যপণ্যের দাম অনেক বেড়ে যায়। তখন সরকারি গুদাম খুলে দেন। এতে দাম অনেক সস্তা হয়ে যায়। বাদশাহ একবার একটি পণ্যমূল্য নির্ধারণ করে দেন এবং সে অনুযায়ী বিক্রির নির্দেশ দেন। বিক্রেতারা এই হারে বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানান।[১] বাদশাহ রাষ্ট্রীয় গুদাম খুলে দিলেন এবং বিক্রেতাদের কোনো পণ্য বিক্রি করতে বারণ করলেন। এভাবে ছয় মাস পর্যন্ত রাষ্ট্রীয়ভাবে পণ্য বিক্রি হলো। বিক্রেতারা যখন দেখল তাদের পণ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন তারা বাদশাহর কাছে এসে ক্ষমা চাইল। বাদশাহ এবার এমন মূল্য নির্ধারণ করে দিলেন, যা আগের চেয়ে অনেক কম। এবার বাধ্য হয়ে বিক্রেতারা সেটাই মেনে নিল।

এই বাদশাহ জুমা বা ঈদের দিন কিংবা অন্য দিন বাহনে চড়ে বের হতেন না। এর কারণ হিসেবে বলতেন, তার এক ভাতিজা ছিল, যার নাম ছিল সুলাইমান।[২] আলাউদ্দিন তাকে অনেক ভালোবাসতেন। একদিন বাদশাহ শিকারে গেলেন। সেই শিশুও সঙ্গে গেল। সে ইচ্ছা করল, আমি বাদশাহর সঙ্গে সেই আচরণই করব, যা তিনি তার চাচা জালালুদ্দিনের সঙ্গে করেছিলেন। যখন নাস্তার জন্য এক জায়গায় থামলেন তখন সুলাইমান বাদশাহর দিকে একটি তির ছুড়ে মারল। বাদশাহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

---

[১] আলাউদ্দিন খিলজি তার শাসনকালে সবচেয়ে বেশি জোর দেন নিত্যপণ্যের দাম সহনীয় মাত্রায় রাখতে, যাতে জনসাধারণ স্বস্তি পায়। তার শাসনের পুরো সময়টায় যব ছিল দুই আনা মণ। এর দ্বারা অন্যান্য জিনিসপত্রের দামের কথা অনুমান করা যায়। সুঁই থেকে নিয়ে ঘোড়া পর্যন্ত তিনি সবকিছুর দাম নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। নির্ধারিত দামের বেশি নেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না কারো পক্ষে। তিনি এই ব্যবস্থাপনা এতটা দৃঢ়ভাবে গড়ে তুলেন যে, কেউ কোনো পণ্যের দাম এক পাই বেশি রাখলেও খবর হয়ে যেত। তখন অভিযুক্তকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হতো। দুর্ভিক্ষের সময়ও এভাবে পণ্যমূল্য নির্ধারিত ছিল। তারীখে ফেরেশতা ও অন্যান্য ভারসাম্যপূর্ণ ইতিহাসগ্রন্থে এ ব্যাপারে বিস্তারিত পাওয়া যাবে।

[২] আক্ত খান।

এ সময় বাদশাহর এক ক্রীতদাস ঢাল ধরলো। এরপর সুলাইমান এগিয়ে এলো। ক্রীতদাসরা বললো, বাদশাহ আর নেই। ক্রীতদাসদের কথা বিশ্বাস করে সুলাইমান ফিরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীতে চলে গেল। ইতিমধ্যে বাদশাহর জ্ঞান ফিরে এলো। এদিকে সমস্ত বাহিনী তার আশপাশে জমা হয়ে গেল এবং তার ভাতিজা পালিয়ে গেল। তিনি তার বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন ভাতিজাকে ধরে আনতে। পরে বাদশাহ তাকে হত্যা করেন। এই ঘটনার পর আর কখনো তিনি বাহনে চড়ে বের হন না।

আলাউদ্দিন খিলজির পাঁচ ছেলে ছিলেন। তারা হলেন খিযির খান, শাদি খান, আবু বকর খান, মুবারক খান (যার অন্য নাম কুতুবুদ্দিন) ও শিহাবুদ্দিন। কুতুবুদ্দিনকে বাদশাহ কম বুদ্ধিসম্পন্ন ও দুর্বল প্রকৃতির মনে করতেন। তার ভাইদের বড় বড় পদ দেন, কিন্তু তাকে কিছু দেননি। একদিন বাদশাহ তাকে বললেন, তোমাকেও সেই ধরনের কোনো পদ নিতে হবে, যা তোমার ভাইয়েরা নিয়েছে। কুতুবুদ্দিন বললেন, আমাকে আল্লাহ দেবেন। এই জবাব শুনে বাদশাহ ভয় পেয়ে গেলেন এবং তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। এরপর বাদশাহ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তার বড় স্ত্রী ছিলেন খিযির খানের মা। তার নাম ছিল নাহেক। এই স্ত্রীর এক ভাই ছিলেন, তার নাম ছিল সানজার।[১] তিনি তার ভাইয়ের কাছ থেকে এই শপথ নেন যে, তার ছেলে খিযির খানকে[২] বাদশাহ বানাতে তিনি চেষ্টা চালাবেন। এই খবর বাদশাহর সহযোগীর কাছে পৌঁছল, যাকে মালিক আলফি[৩] বলা হতো। কেননা বাদশাহ তাকে এক হাজার মুদ্রার বিনিময়ে কিনেছিলেন। তিনি বাদশাহর কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেন যে, এ ধরনের আলোচনা চলছে। বাদশাহ তার ঘনিষ্ঠজনদের নির্দেশ দিলেন, সানজার শাহ যখন আমার কাছে আসবে তখন আমি তাকে খিলআত (মর্যাদাপূর্ণ বিশেষ পোশাক) দেব। সে যখন এটা

---

১ আলপ খান।

২ খিযির খান, সব ধরনের গুণসমৃদ্ধ একজন মানুষ ছিলেন। আলাউদ্দিন পরাজিত রাজা দেওগিরের স্ত্রী কানুন দেবীকে নিজেই বিয়ে করেন। আর তার মেয়ে দেওল দেবীকে বিয়ে দেন খিযিরের সঙ্গে। তাদের দুজনের মধ্যে অনেক গভীর ভালোবাসা ছিল। আলাউদ্দিনের উপদেষ্টা আমির খসরু 'খিযির খান ও দেওল দেবী'-এর ওপর খুব জাদুকরি কবিতা রচনা করেছেন। তাদের দুজনের মধ্যে ভালোবাসা শেষ সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বিপদের সময়ও তারা দুজন একজন আরেকজনকে অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে ভালোবাসতেন।

৩ মালিক কাফুর, তিনি আলাউদ্দিনের ক্রীতদাস ছিলেন। তবে অসম্ভব রকমের ধূর্ত, লোভী, ষড়যন্ত্রকারী এবং অকৃতজ্ঞ ছিলেন। নিজের নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বাবা-ছেলের মধ্যে বিরোধ জিইয়ে রাখতে সফল হন। খিলজি বংশকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পেছনে তার বড় ভূমিকা রয়েছে।

পরতে থাকবে তখন তোমরা তাকে ধরে বেঁধে ফেলবে এবং হত্যা করবে। সুতরাং সেই নির্দেশ বাস্তবায়ন করা হলো। খিযির খান সেই দিন সনিপাতে[১] শহীদদের মাজার যিয়ারতের জন্য গিয়েছিলেন। সেই জায়গাটি দিল্লি থেকে এক মঞ্জিল দূরত্বে। খিযির খান মানত করেছিলেন, তিনি পায়ে হেঁটে সেই জায়গাটি যিয়ারত করবেন। নিজের বাবার সুস্থতার জন্য দোয়া করেন। যখন তিনি জানতে পারলেন তার বাবা তার মামাকে হত্যা করেছেন, তখন খুবই শোকাহত হলেন এবং নিজের জামার কলার ছিঁড়ে ফেললেন। হিন্দুস্তানে এই প্রথা রয়েছে, যখন কারো কোনো স্বজন মারা যান এবং অত্যন্ত শোকাহত হন তখন নিজের জামার কলার ছিঁড়ে ফেলেন। বাদশাহ যখন এটা জানতে পারলেন অসন্তুষ্ট হলেন। খিযির খান যখন বাদশাহর কাছে গেলেন তখন তিনি তার ছেলেকে অনেক ভর্ৎসনা করলেন। তাকে হাত-পা বেঁধে বাদশাহর নায়েবের কাছে সোপর্দ করার নির্দেশ দিলেন। আর নায়েবকে নির্দেশ দিলেন তাকে যেন গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দি করে রাখেন। এই দুর্গটি হিন্দু সাম্রাজ্যের ভেতরে। দিল্লি থেকে দশ মঞ্জিল দূরত্বে। দুর্গটিকে অনেক দুর্ভেদ্য মনে করা হয়। আমি নিজেও সেই দুর্গে কিছুদিন ছিলাম। খিযির খানকে গোয়ালিয়র দুর্গে নিয়ে সেখানকার নিরাপত্তারক্ষীদের কাছে সোপর্দ করা হলো। আর তাদের বলে দেওয়া হলো, তোমরা তাকে বাদশাহর ছেলে মনে করবে না। বরং বাদশাহর শত্রুদের যেভাবে বন্দি রাখো সেভাবে তাকেও রাখবে। এরপর বাদশাহ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে বাদশাহ নির্দেশ দিলেন, খিযির খানকে ডেকে পাঠাও, আমি তাকে আমার স্থলাভিষিক্ত বানাব। নায়েব বললেন, ঠিক আছে। কিন্তু তাকে ডেকে পাঠাতে দেরি করলেন। বাদশাহ বারবার জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু তাকে বলা হলো, আসছে। এভাবে এক পর্যায়ে বাদশাহ মারা গেলেন।

সুলতান শিহাবুদ্দিন খিলজি

নিমকহারাম মালিক কাফুরের নেতৃত্বলোভের নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত

আলাউদ্দিন মারা গেলে তার নায়েব (কাফুর) বাদশাহর সবচেয়ে ছোট ছেলে শিহাবুদ্দিনকে মসনদে বসান এবং লোকদের কাছ থেকে বাইআত গ্রহণ

---

১ সনিপাত অনেক প্রাচীন শহর। এর উঁচু অংশ কোট নামে আর নিচের অংশ মাশহাদ নামে প্রসিদ্ধ। এখানে সাইয়েদ নাসিরুদ্দিন ও মির মিকনাদের খানকা রয়েছে। সাইয়েদ নাসিরুদ্দিনকে পৃথ্বীরাজের জামাতা শহীদ করেছিল।

করেন। রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্তৃত্ব তার হাতেই থাকে।[১] তিনি শাদি খান ও আবু বকর খানকে অন্ধ বানিয়ে গোয়ালিয়র দুর্গে পাঠান এবং নির্দেশ দেন খিযির খানকেও যেন অন্ধ বানিয়ে দেওয়া হয়।[২] কুতুবুদ্দিন খানকেও বন্দি করা হয়। তবে তার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়া হয়নি।[৩] সুলতান আলাউদ্দিনের ঘনিষ্ঠ ক্রীতদাসদের মধ্যে বশির ও মুবাশ্বির দুই ব্যক্তি ছিলেন। তাদেরকে আলাউদ্দিনের স্ত্রী, যিনি সুলতান মুইজুদ্দিনের মেয়ে ছিলেন, এই বার্তা পাঠান যে, নায়েব যে আচরণ আমার ছেলেদের সঙ্গে করেছে সে সম্পর্কে তোমরা অবহিত। এবার সে কুতুবুদ্দিনকেও হত্যা করতে চাচ্ছে। তারা জবাব পাঠালো, যা কিছু হওয়ার সে সম্পর্কে আমরা দ্রুতই জানতে পারব। তারা রাতের বেলা নায়েবের কাছেই থাকতেন। আর তাদের অস্ত্রসহ আসার অনুমতি ছিল। ওই রাতেও তারা যথারীতি আসেন। নায়েব একটি কাঠের প্রাসাদে ছিলেন। দুই ক্রীতদাস তার ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে দ্রুত শিরশ্ছেদ করে। কর্তিত মাথা নিয়ে তারা কয়েদখানায় কুতুবুদ্দিনের কাছে যান এবং তাকে মুক্ত করেন।

সুলতান কুতুবুদ্দিন খিলজি

একজন বিলাসী ও জালেম বাদশাহর করুণ পরিণতি

কুতুবুদ্দিন কিছুদিন তার ভাই শিহাবুদ্দিনের সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। কিন্তু পরে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজে ক্ষমতা দখল করেন। শিহাবুদ্দিনের আঙুলগুলো কেটে তাকেও ভাইদের সঙ্গে গোয়ালিয়র দুর্গে পাঠিয়ে দেন।[৪] আর নিজে দৌলতাবাদের দিকে চলে যান। দৌলতাবাদ ছিল দিল্লি থেকে চল্লিশ মঞ্জিল দূরত্বে। রাস্তায় নানা ধরনের গাছগাছালি ছিল। চলাচলকারীরা মনে করত যেন কোনো বাগানের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। আর এক ক্রোশ দূরে দূরে ডাক বিভাগের চৌকি, যার কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি।

প্রত্যেক চৌকিতে প্রয়োজনীয় সবকিছুই পাওয়া যেত। যেন এক একটি বাজার। এভাবে এই সড়ক তেলেঙ্গানা ও ইয়েমেনের মা'বার পর্যন্ত চলে

---

[১] উদ্দেশ্য সেটাই ছিল।

[২] যাতে আগামীতে তার আর বাদশাহ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে।

[৩] এর কারণ হলো তাকে নিয়ে বিশেষ কোনো শঙ্কা ছিল না।

[৪] যাতে তার পক্ষ থেকে কোনো আশঙ্কা না থাকে। নিজে যাতে নির্বিঘ্নে শাসনকর্তৃত্ব চালাতে পারেন।

গেছে, যা দিল্লি থেকে ছয় মাসের পথ। প্রত্যেক মঞ্জিলে শাহি মহল রয়েছে এবং মুসাফিরদের জন্য রয়েছে সরাইখানা। মুসাফিরদের সঙ্গে কোনো পাথেয় নেওয়ার প্রয়োজনই পড়ে না।

সুলতান কুতুবুদ্দিন যখন রাস্তায় তখন কোনো কোনো আমির[১] তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্রস্তুতি নিল। তাদের উদ্দেশ্য ১০ বছর বয়সী কুতুবুদ্দিনের ভাতিজা ও খিযির খানের ছেলেকে সিংহাসনে বসানো। কুতুবুদ্দিন তার ভাতিজাকে পা চেপে ধরে মাথায় পাথর দিয়ে আঘাত করে হত্যা করেন।[২] আর মালিক শাহ নামে এক আমিরকে গোয়ালিয়রের দিকে পাঠালেন এবং সেখানে থাকা ছেলের বাবা ও চাচাদের হত্যার নির্দেশ দিলেন।[৩] গোয়ালিয়রের কাজি যাইনুদ্দিন আমার সঙ্গে আলোচনা করেছেন, যেদিন মালিক শাহ দুর্গে পৌছলেন তখন আমি খিযির খানের কাছে বসা ছিলাম। মালিক শাহের আসার খবর শুনেই তার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। যখন মালিক শাহ খিযির খানের কাছে এলেন তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন এসেছ? আমির বললেন, আখুন্দে আলম (সম্মানসূচক সম্বোধন) একটা প্রয়োজনে এসেছি। খিযির খান জিজ্ঞেস করলেন, আমার প্রাণনাশের জন্য! আমির বললেন, হ্যাঁ। পরে আমির পুলিশ, দুর্গের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা তিনশ প্রহরী, আমাকে (কাজি) এবং সাক্ষীদের তলব করলেন। সবার সামনে বাদশাহর নির্দেশনামা পাঠ করে শোনালেন। এরপর শিহাবুদ্দিনের কাছে এলেন এবং তাকে হত্যা করলেন। তিনি কোনো ধরনের অস্থিরতা প্রকাশ করেননি। এরপর শাদি খান ও আবু বকর খানের শিরশ্ছেদ করলেন। যখন খিযির খানের কাছে এলেন তখন তার অস্থিরতা বেড়ে গেল। তার মাও সঙ্গে ছিলেন। তাকে ঘরে বন্দি করে রেখে খিযির খানকে হত্যা করলেন। তাদের সবার লাশ কোনো দাফন-কাফন ছাড়াই একটি গর্তে ফেলে দিলেন।

---

[১] আসাদুদ্দিন, যিনি আলাউদ্দিনের চাচাতো ভাই ছিলেন।

[২] যাতে আগামীতে কোনো আশঙ্কা না থাকে।

[৩] যাতে ক্ষমতার পথের সব কাঁটা দূর হয়ে যায়। কিন্তু প্রবাদ আছে, তদবির করে বান্দা আর তকদিরে থাকে ভিন্ন কিছু। খোদ তার কপালেও হৃদয়স্পর্শী মৃত্যু লেখা ছিল। শিহাবুদ্দিন খিযির খানের প্রাণনাশের জন্য ওঁৎ পেতে থাকার কারণ হলো, তিনি খিযির খানের স্ত্রী দেওল দেবীকে রাজমহলে প্রবেশ করতে চাচ্ছিলেন। আর তিনি এই কথাটি খিযির খানকে বলেও ছিলেন। কিন্তু খিযির খান সাফ না করে দেন। অতঃপর খিযির খানকে হত্যার পর বাদায়ুনির বর্ণনামতে, দেওল রাণীকে প্রসাদে ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন। ঐতিহাসিক ফেরেশতা লিখেন, দেওল দেবীকে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়েছিলেন বটে, কিন্তু খুব দ্রুতই মৃত্যুর কাছে হার মানতে হয়।

কয়েক বছর পর লাশগুলো বের করা হয় এবং নিজেদের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। খিযির খানের মা অনেক দিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। আমি তাকে ৭২৮ হিজরিতে মক্কা মুয়াযযামায় দেখেছি।

গোয়ালিয়র দুর্গটি[১] একটি খোলা প্রান্তরের শীর্ষ চূড়ায়। মনে হয় যেন গোটা প্রান্তর পরিষ্কার করে এটা বানানো হয়েছে। আশপাশে আর এতটুকু উঁচু পাহাড় নেই। এর মধ্যে পানির একটি পুকুর এবং প্রায় ২০টি কূপ রয়েছে। প্রত্যেকটি কূপে প্রাচীর রয়েছে, যার মধ্যে ক্ষেপণাস্ত্র ফিট করা আছে। দুর্গে উঠার রাস্তা এতো দীর্ঘ যে, একটি হাতি অনায়াসে আসা-যাওয়া করতে পারে। দুর্গের দরজায় পাথরের তৈরি হাতির মূর্তি রয়েছে। দূর থেকে অনেকে এটাকে জীবন্ত হাতি মনে করতে থাকে।

দুর্গের নিচেই শহর। খুবই সুন্দর। সব দালান-কোটা ও মসজিদ সাদা পাথরের তৈরি। দরজা ছাড়া কোথাও কাঠ ব্যবহার করা হয়নি। এখানকার প্রজাদের বেশির ভাগই হিন্দু। বাদশাহর পক্ষ থেকে ছয়শ অশ্বারোহী এখানে অবস্থান করে। তাদের বেশির ভাগ সময় লড়াই অব্যাহত রাখতে হয়। কেননা এই দুর্গটি হিন্দু সাম্রাজ্যের অন্তরে অবস্থিত। যখন কুতুবুদ্দিন তার সব ভাইকে হত্যা করলেন এবং কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী আর বাকি রইল না তখন আল্লাহ তার ওপর এক হত্যাকারীকে আরোপ করে দিলেন। সে কুতুবুদ্দিনকে হত্যা করল। খুব অল্প দিনই তিনি বাঁচতে পেরেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে তুঘলক[২] সুলতানের হাতেই খুন করান।

এই খুনের বিস্তারিত বিবরণ হলো, কুতুবুদ্দিনের আমিরদের অন্যতম ছিলেন খসরু খান। তিনি অত্যন্ত সাহসী ও সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। চান্দিরি ও মা'বার এলাকা তিনি জয় করেন। হিন্দুস্তানের এই এলাকাটি অত্যন্ত গাছগাছালি সমৃদ্ধ ও উর্বর ছিল। মা'বার দিল্লি থেকে ছয় মাসের পথ দূরত্বে। কুতুবুদ্দিন খসরু মালিককে অত্যন্ত ভালোবাসতেন।[৩] কুতুবুদ্দিনের উস্তাদ

---

[১] এই দুর্গটিকে দুর্ভেদ্য মনে করা হতো। এটি মাহমুদ গজনবিও জয় করতে পারেননি। ১১৯৬ খ্রিস্টাব্দে ঘুরি এটি জয় করেন। এখানে হযরত মুহাম্মাদ গওসের দরগাহ আছে। তাছাড়া রাজা বকর মাজিত, জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের মহল রয়েছে। এটাকে সাধারণত শাহি কয়েদিদের জন্য ব্যবহার করা হয়। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানিও বাদশাহ জাহাঙ্গিরের নির্দেশে এখানে নজরবন্দি ছিলেন। এটি আগ্রা থেকে ৬৫ মাইল দূরত্বে। দৈর্ঘ্যে এক মাইল এবং প্রস্তে তিনশ গজ। যে চূড়ায় এটি অবস্থিত এটি ৩৪২ ফুট উচ্চতায়।

[২] সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুঘলক।

[৩] মাহমুদ আয়াযের মতো অবস্থা ছিল।

কাজি খান[১] ছিলেন সদরে জাহাঁ। তিনি শীর্ষ আমির ছিলেন। শাহি মহলের চাবি তার কাছেই থাকত। তার অভ্যাস ছিল রাতের বেলা শাহি মহলের দরজার কাছে থাকতেন। এক হাজার লোক ছিল তার অধীনস্থ। প্রতি রাতে আড়াইশ মানুষ তাকে পাহারা দিত। বাইরের দরজা থেকে নিয়ে ভেতরের দরজা পর্যন্ত তারা অস্ত্র নিয়ে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকত। কেউ শাহি মহলে ঢুকতে হলে এই কাতারের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হতো। এই লোকদের 'নওবত ওয়ালে' বলা হতো। তাদের ওপরে ছিল অফিসার ও মুনশি, যারা টহল দিত এবং তাদের হাজিরা নিতো। রাতের লোকদের পালা শেষ হলে দিনের অংশের লোকেরা এসে এভাবেই পাহারা দিত। এই কাজি খান খসরু মালিককে[২] খুবই ঘৃণা করতেন। যেহেতু খসরু মালিক মূলত হিন্দু[৩] ছিলেন এবং হিন্দুদের পক্ষপাতিত্ব করতেন[৪] এজন্য কাজি খান তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। প্রায়ই বাদশাহকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানাতেন। কিন্তু বাদশাহ এসব শুনতেন না। বলতেন, এসব বিষয় আলোচনা করো না। একদিন খসরু খান বাদশাহকে বললেন, কিছু হিন্দু মুসলিম হতে চাচ্ছে। সেই সময় নিয়ম ছিল কোনো হিন্দু মুসলিম হতে চাইলে প্রথম বাদশাহর কাছে হাজির হয়ে তাকে সালাম করত। বাদশাহর পক্ষ থেকে খিলআত (বিশেষ পোশাক) ও স্বর্ণের ছুরি উপঢৌকন হিসেবে পেত।[৫]

বাদশাহ বললেন, তাদের ভেতরে নিয়ে এসো। খসরু খান বললেন, তারা রাতে আসতে চাচ্ছে। দিনের বেলা স্বজনরা দেখবে বলে লজ্জা পাচ্ছে। বাদশাহ বললেন, ঠিক আছে তাহলে রাতেই নিয়ে এসো। খসরু খান বেছে বেছে সাহসী হিন্দুদের জড়ো করলেন। যাদের মধ্যে তার ভাই খান খানানও[৬] ছিলেন। তখন ছিল গরমকাল। বাদশাহ সবচেয়ে উঁচু ছাদে অবস্থান করছিলেন। তখন তার কাছে কয়েকজন ক্রীতদাস ছাড়া আর কেউ ছিল না। যখন এই লোকেরা চতুর্থ দরজা পেরিয়ে চলে এলো এবং পঞ্চম দরজায়

---

[১] এই কাজি খান কুতুবুদ্দিনের উস্তাদ ছিলেন।

[২] কেননা তিনি তার গাদ্দারি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

[৩] বাহ্যত মুসলিম, কিন্তু ভেতরে ভেতরে হিন্দু।

[৪] এজন্য সব বিষয়ে হিন্দুদের অগ্রগামী রাখতেন। অথচ নওমুসলিম হিসেবে অন্য রকম আবেগ থাকার কথা।

[৫] অন্যান্য ঐতিহাসিকদের বর্ণনা ইবনে বতুতা থেকে ভিন্ন। তারা বলেন, খসরু খান তার দেশ গুজরাট থেকে চল্লিশ হাজার হিন্দুকে ডেকে এনে চাকরি দেন। সুযোগ পেয়ে তাদেরকে রাজমহলে প্রবেশ করান এবং বাদশাহকে হত্যা করেন। তবে ইবনে বতুতার বর্ণনা বেশি যুক্তিসঙ্গত।

[৬] তিনিও ভাইয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন।

পৌঁছে গেল তখন তাদের হাতে অস্ত্র দেখে কাজি খানের সন্দেহ হলো। তিনি তাদের আটকে দিলেন এবং বললেন, আখুন্দে আলমের (বাদশাহর) অনুমতি নিয়ে এসো। এই লোকেরা তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজি খানকে মেরে ফেলল। হট্টগোলের শব্দ পেয়ে বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? খসরু মালিক বললেন, ওই হিন্দুরা মুসলিম হতে আসছে কিন্তু কাজি খান তাদের আটকে দিয়েছেন। সেখানে একটু বাকবিতণ্ডা হয়েছে। বাদশাহ ভয়ে রাজমহলের দিকে ছুটে চললেন। কিন্তু দরজা ছিল বন্ধ। তিনি দরজায় কড়াঘাত করলেন। পেছন থেকে খসরু খান তাকে ঝাপটে ধরলেন। বাদশাহ ছিলেন শক্তিশালী। তিনি খসরু খানকে চেপে ধরলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে হিন্দুরা চলে এলো। খসরু খান তখন চিৎকার করে বললেন, বাদশাহ আমাকে নিচে চেপে ধরেছেন। তখন হিন্দুরা এসে বাদশাহকে হত্যা করল এবং তার শিরশ্ছেদ করে বারান্দায় ঝুলিয়ে রাখলো।

খসরু খান

নওমুসলিম থেকে মুরতাদ, যার হাতে খিলজি বংশের শাসনের অবসান ঘটে

খসরু খান তাৎক্ষণিকভাবে আমির ও অফিসারদের ডেকে পাঠালেন। তাদের কিছু জানা ছিল না।[১] তারা এসে দেখলেন খসরু খান রাজ সিংহাসনে বসে আছেন। তারা সবাই খসরু খানের কাছে বাইআত হলেন এবং সকাল পর্যন্ত তাদের কাউকে বাইরে বের হতে দেননি। সকাল হতেই তার ক্ষমতা গ্রহণের বিষয়টি প্রচার করা হয়। রাজধানীর বাইরে থাকা সব আমিরের প্রতি পরোয়ানা পাঠানো হয়। তাদের জন্য মূল্যবান খিলআতও (বিশেষ পোশাক) পাঠানো হয়। সবাই তার আনুগত্য মেনে নেন। তবে তুঘলক শাহ[২] যিনি দিপালপুরের[৩] গভর্নর ছিলেন তিনি খিলআত ছুড়ে ফেলে দেন এবং এর ওপরে বসে যান। খসরু মালিক তার ভাই খান খানানকে পাঠালেন তাকে প্রতিহত করতে। কিন্তু তুঘলক শাহ তাকে পরাজিত করেন।

---

[১] বাদশাহকে হত্যা করতেই রাতে রাতে আমির ও অফিসারদের ডেকে বাইআত নেওয়া এবং ক্রীতদাসসহ কাউকে রাজমহলের বাইরে যেতে না দেওয়া এটা প্রমাণ করে, এই লোক কতটা বিচক্ষণ ও সতর্ক ছিলেন।

[২] গিয়াসুদ্দিন তুঘলক।

[৩] তিনি দিল্লির বাদশাহর পক্ষ থেকে তাতারিদের সম্ভাব্য হামলা প্রতিহত করতে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তাতারিদের ভেঙে দেন, কখনো দিল্লি পর্যন্ত আসতে দেননি।

যখন খসরু মালিক বাদশাহ হলেন তখন তিনি হিন্দুদের বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত করলেন। আর নির্দেশ দিলেন গোটা দেশে কোথাও গরু জবাই করা যাবে না। হিন্দুরা গরু জবাই বৈধ মনে করে না। কেউ গরু জবাই করলে তাকে গরুর চামড়ার ভেতরে ঢুকিয়ে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হতো। তিনি গরুকে অসম্ভব রকমের ভক্তি করতেন। সওয়াবের জন্য এবং ওষুধ হিসেবেও গরুর প্রশ্রাব পান করতেন। গোবর দ্বারা ঘর ও দেওয়াল মুছতেন। খসরু খান চাইতেন মুসলিমরাও তাই করুক। এজন্য জনসাধারণ তার প্রতি রুষ্ট হয়ে ওঠে এবং সবাই তুঘলক শাহের পক্ষ নেয়।[১]

শায়খ রুকনুদ্দিন কুরাইশি মুলতানির কাছে আমি শুনেছি, তুঘলকরা তুর্কি বংশোদ্ভূত।[২] এই লোকেরা তুর্কিস্তান ও সিন্ধের মাঝামাঝি পাহাড়ি এলাকায় থাকত। তুঘলক খুবই দরিদ্র ছিলেন। সিন্ধে এসে কোনো সওদাগরের শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত হন। এটা সুলতান আলাউদ্দিনের শাসনকালের কথা। ওই সময় বাদশাহর ভাই উলু খান (আলগ খান) ছিলেন সিন্ধের গভর্নর। তুঘলক তার খাদেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। প্রথমে পদাতিক সেনাদের মধ্যে ভর্তি হন। আলগ খান যখন তার নম্রতা-ভদ্রতা সম্পর্কে জানতে পারলেন তখন অশ্বারোহীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে তার পদোন্নতি দেন। পরে তাকে অফিসার বানান। পরে মির আখোর অর্থাৎ আস্তাবলের দারোগা পদে নিযুক্ত করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি শীর্ষ আমিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

আমি মুলতানে তুঘলকের বানানো মসজিদে এই শিলালিপি দেখেছি যে, তিনি ৩৮ বার তাতারিদের সঙ্গে লড়াই করে তাদের পরাজিত করেন। এজন্য মালিক গাজি উপাধি লাভ করেন।[৩] সুলতান কুতুবুদ্দিন তাকে দিপালপুরের গভর্নর নিযুক্ত করেন। আর তার ছেলে জুনা খানকে 'মির আখোর'[৪] পদে চাকরি দেন। খসরু খানও তাকে একই পদে বহাল রাখেন। তখন তুঘলক খসরু খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইচ্ছা করলেন তখন তার কাছে তিনশ সেনা ছিল। যাদের ওপর তার পুরোপুরি ভরসা ছিল। তিনি মুলতানের গভর্নর কিসলু খানকে লিখলেন (মুলতান সেখান থেকে তিন মঞ্জিল দূরত্বে ছিল) আপনি আমাকে সহযোগিতা করুন এবং খুনের বদলা নিন। কিসলু খান

---

[১] কেননা তারা একজন মুরতাদের বাদশাহ হওয়ার বিষয়টি কোনোভাবেই গ্রহণ করতে পারছিল না।

[২] মিশ্র বংশ, অর্থাৎ বাবা তুর্কি ও মা হিন্দি।

[৩] গাজি উপাধি তিনিই পান যিনি অস্বাভাবিক কোনো কীর্তি স্থাপন করেন।

[৪] আস্তাবলের দারোগা, এটি তখন অনেক বড় পদ ছিল।

জবাব পাঠালেন, যদি আমার ছেলে খসরু খানের কাছে না থাকত তাহলে অবশ্যই আমি আপনাকে সহযোগিতা করতাম।

মালিক গাজি অর্থাৎ গিয়াসুদ্দিন তুঘলক তার ছেলে জুনা খানকে লিখলেন, আমার[১] ইচ্ছা হলো যেকোনো মূল্যে কিসলু খানের ছেলেকে নিয়ে দিল্লি থেকে বেরিয়ে এসো। মালিক জুনা ভাবছিলেন কী উপায় বের করা যায়। এর মধ্যেই সুযোগ মিলে যায়। আর সেটা এভাবে, খসরু মালিক তাকে একদিন বললেন, ঘোড়া অনেক মোটা হয়ে গেছে। শরীর নাড়াতে পারে না। এটাকে একটু দৌড়াও। সুতরাং প্রতিদিন মালিক জুনা ঘোড়া নিয়ে বাইরে বের হতেন। কখনো এক ঘণ্টায় ফিরে আসতেন আবার কখনো তিন ঘণ্টায়। একদিন যোহরের সময় হয়ে গেল, কিন্তু তিনি ফিরে এলেন না। খাবারের সময় হয়ে গেল। বাদশাহ অশ্বারোহীদের নির্দেশ দিলেন তার খবর নিতে। তারা অনেক খোঁজাখুঁজির পর ফিরে এসে জানাল কোথাও তাকে পাওয়া যায়নি। জানা গেল, তিনি তার বাবার কাছে পালিয়ে গেছেন। আর তার সঙ্গে কিসলু খানের ছেলেও চলে গেছেন।

নিজের ছেলে চলে আসতেই তুঘলক বিদ্রোহের ঘোষণা দিয়ে দিলেন। তিনি কিসলু খানের সহযোগিতায় সেনাবাহিনী প্রস্তুত করতে থাকলেন। বাদশাহ তার ভাই খান খানানকে তাদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য পাঠালেন। কিন্তু তিনি পরাজিত হয়ে ফিরে এলেন। তার সাথীসঙ্গীরা মারা গেল এবং যাবতীয় আসবাবপত্র ও সম্পদ তুঘলকের হাতে চলে গেল। তুঘলক এবার দিল্লির দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। খসরু মোকাবেলার জন্য তার বাহিনী নিয়ে দিল্লি থেকে বের হলেন এবং আসিয়াবাদ নামক স্থানে তাঁবু ফেললেন। তিনি হাত খুলে তার ভান্ডার থেকে খরচ করলেন। সাধারণ মানুষ ও সেনা সদস্যদের বিপুল পরিমাণ অর্থকড়ি দান করলেন। খসরু খানের বাহিনীতে থাকা হিন্দুরা অনেক সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করল। অবশেষে তুঘলকের বাহিনী পালাতে বাধ্য হলো এবং তার তাঁবু লুটে নিয়ে গেল।

তুঘলক জীবন বাজি রাখা তার তিনশ সঙ্গীকে এক জায়গায় জড়ো করলেন। তাদের উদ্দেশে বললেন, এখন পালিয়ে যাওয়ার মতো কোনো পথ নেই। সুতরাং যখন খসরুর বাহিনী লুটপাটে ব্যস্ত হয়ে পড়ল এবং খসরুর কাছে

---

[১] জুনা খান অর্থাৎ মুহাম্মাদ তুঘলক এই বিপ্লবের সময় দিল্লিতে ডিউটিরত ছিলেন। আর বিপ্লবের পরে বাবার কাছে পৌঁছার কোনো উপায় ছিল না।

কেউ থাকল না, তখন তুঘলক সঙ্গীদের নিয়ে সেখানে হামলা করে বসলেন। হিন্দুস্তানে বাদশাহকে চেনার প্রতীক হলো চাদোয়া। মিশরে এটাকে কাবাহ বলে। শুধু ঈদের দিন বাদশাহ এটি মাথায় লাগায়। কিন্তু হিন্দুস্তান ও চীনে সফরে হোক কিংবা বাড়িতে, চাদোয়া সবসময় বাদশাহর মাথায় ঝুলে থাকে। যখন তুঘলক বাদশাহর ওপর হামলা করে বসলেন তখন তুমুল লড়াই হলো। টিকতে না পেরে বাদশাহর বাহিনী পালাল এবং বাদশাহর সঙ্গে কেউ রইল না। বাদশাহ তার ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন এবং গায়ের কাপড় ও হাতিয়ার ফেলে দিলেন। আর মাথার চুল পেছন দিকে ঝুলিয়ে নিলেন। যেমনটা হিন্দুস্তানের ফকির-দরবেশরা করে থাকে। এই অবয়ব ধারণ করে বাদশাহ একটি বাগানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

লোকেরা তুঘলকের কাছে জড়ো হয়ে গেল। তিনি শহরে এলেন। শহরের চাবি তার কাছে সোপর্দ করা হলো। তিনি রাজমহলে প্রবেশ করলেন এবং এক কোণে অবস্থান নিলেন। কিসলু খানকে বললেন, আপনি বাদশাহ হোন।[১] কিসলু খান বললেন, না আমি হবো না, আপনিই হোন।[২] এভাবে দুজনের মধ্যে বাদশাহ হওয়া নিয়ে পীড়াপীড়ি হলো। এক পর্যায়ে কিসলু খান বললেন, আপনি যদি বাদশাহ হতে সম্মত না হন তাহলে আমি আপনার ছেলেকে বাদশাহ ঘোষণা করে দেব। এটা তুঘলকের পছন্দ হলো না। অবশেষে তিনি নিজেই বাদশাহ হতে সম্মত হলেন। পরে সিংহাসনে বসে বাইআত গ্রহণ শুরু করলেন। জনসাধারণ ও বিশিষ্টজনেরা এসে তার হাতে বাইআত হতে থাকল।

এদিকে খসরু খান তিন দিন পর্যন্ত বাগানে পালিয়ে ছিলেন। তৃতীয় দিন ক্ষুধার জ্বালায় আর টিকতে পারছিলেন না। বাইরে বেরিয়ে এলেন। বাগানের পাহারাদারের কাছে খাবার চাইলেন। কিন্তু তাদের কাছে খাবারের মতো কিছু ছিল না। খসরু খান তাদের কাছে নিজের আংটি খুলে দিয়ে বললেন, এটা বিক্রি করে খাবার নিয়ে এসো। যখন তারা এই আংটি নিয়ে বাজারে এলো তখন তা দেখে লোকদের সন্দেহ হলো। তারা ভেবে কূল পেল না, এই

---

[১] এর দ্বারা গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের ক্ষমতার প্রতি নির্মোহতা প্রকাশ পায়।

[২] এটা কিসলু খানের বন্ধুত্ব ও বিশ্বস্ততার অবিস্মরণীয় প্রমাণ।

তাদের দুজনের মধ্য থেকে একজনের বাদশাহ হওয়া এজন্য অনিবার্য ছিল যে, খিলজি বংশের কেউ আর তখন জীবিত নেই। অন্যথায় নিজের মনিবের কোনো সন্তানকে ক্ষমতার মসনদে বসানোর ইচ্ছা ছিল তুঘলকের।

আংটি কোথায় থেকে এলো। তারা আংটি পুলিশের কাছে নিয়ে গেল। পুলিশ এটা নিয়ে গেল তুঘলকের কাছে। তুঘলক তাদের সঙ্গে নিজের ছেলে জুনা খানকে পাঠালেন যাতে খসরু খানকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসেন। জুনা খান খসরু খানকে গ্রেফতার করে নিয়ে এলেন। তাকে ঘোড়ায় চড়ে বাদশাহর সামনে হাজির করা হলো। যখন তিনি বাদশাহর সামনে এসে দাঁড়ালেন, বললেন আমি খুবই ক্ষুধার্ত। বাদশাহ খাবার ও পানীয় আনার নির্দেশ দিলেন। বাদশাহ তাকে খাবার খাওয়ালেন, নাবিজ (পানীয়) পান করালেন এবং পান দিলেন।

খাবার শেষ হওয়ার পর তিনি তুঘলক বাদশাহকে বললেন, হে তুঘলক! আমাকে অপদস্থ করো না। আমার সঙ্গে বাদশাহসুলভ আচরণ করো। তুঘলক বললেন, অপেক্ষা করুন এবং দেখুন। এরপর তুঘলক নির্দেশ দিলেন কুতুবুদ্দিনকে যেখানে হত্যা করেছিল তাকে সেখানে নিয়ে হত্যা করো এবং তার মাথা ও লাশ ছাদ থেকে নিচে ফেলে দাও, যেমনটা সে কুতুবুদ্দিনের সঙ্গে করেছিল। এরপর নির্দেশ দিলেন, তার লাশ গোসল দিয়ে কাফন পরাও এবং তার প্রতিষ্ঠিত কবরেই দাফন করে দাও।[১]

সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুঘলক

সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুঘলক চার বছর পর্যন্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ন্যায়নিষ্ঠাবান ও যোগ্য শাসক ছিলেন। বাদশাহ হওয়ার পর তার ছেলেকে[২] তেলেং[৩] জয় করার জন্য পাঠালেন, দিল্লি থেকে যার দূরত্ব ছিল তিন মাসের পথ। তার সঙ্গে অনেক বড় বাহিনী যাতে মালিক তৈমুর, তাগিন এবং কাফুর মুহরেদারকে পাঠান। যখন ছেলে তেলেঙ্গানা পৌঁছলেন তখন বিদ্রোহের ইচ্ছা পোষণ করলেন। তার এক সাথী ছিলেন ওবায়েদ,[৪] যিনি কবিও ছিলেন, ফকিহও ছিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন, তুমি লোকদের মধ্যে প্রচার করো বাদশাহর ইন্তেকাল[৫] হয়ে গেছে। তার ধারণা ছিল এই খবর

---

[১] যেহেতু খসরু খান প্রকাশ্যে মুরতাদ হওয়ার ঘোষণা দেননি এজন্য গিয়াসুদ্দিন তুঘলক সন্দেহের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেন এবং মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করেন। আমাদের এই যুগে হলে খোদ গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের ওপর কুফুরির ফতোয়া জারি হয়ে যেত!

[২] জুনা খান (মুহাম্মাদ তুঘলক)।

[৩] তেলেঙ্গানা (ওয়ারেঙ্গাল)।

[৪] তিনি একজন বিদ্রূপকারী ও সমালোচক কবি ছিলেন।

[৫] এটা নিছক ওবায়েদের দুষ্টুমি ছিল, এখানে মুহাম্মাদ তুঘলকের কোনো হাত ছিল না।

শুনে সব অফিসার ও সেনা সদস্য তুঘলকের ছেলের কাছে বাইআত হয়ে যাবে।[১] কিন্তু কেউ এই খবর সত্য মনে করল না।

প্রত্যেক আমির এর বিরোধিতা করলেন এবং তার থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। এমনকি এক পর্যায়ে জুনা খানের সঙ্গে কেউই থাকল না।[২] লোকেরা তাকে হত্যা করে ফেলার প্রস্তুতি নিল।[৩] কিন্তু মালিক তৈমুর তাতে বারণ করলেন। জুনা খান তার দশজন সহযোগী নিয়ে দিল্লির পথ ধরলেন।[৪] বাদশাহ তাকে অর্থকড়ি ও বাহিনী দিয়ে আবার তেলেঙ্গানার দিকে পাঠালেন। পরবর্তী সময়ে বাদশাহ যখন প্রকৃত ঘটনা জানলেন তখন ওবায়েদকে হত্যা করেন। অন্যান্য আমিররা তখন ভয়ে বাঙলার দিকে পালিয়ে যান এবং সুলতান নাসিরুদ্দিনের ছেলে সুলতান শামসুদ্দিনের কাছে আশ্রয় নেন।

যখন সুলতান শামসুদ্দিনের ইন্তেকাল হয়ে গেল তখন তার স্থলাভিষিক্ত সুলতান শিহাবুদ্দিন বাঙলার বাদশাহ হলেন। কিন্তু তার ছোট ভাই গিয়াসুদ্দিন বোরা তার ভাইকে বরখাস্ত করেন। আর কিতলু খান তার আরেক ভাইকে হত্যা করেন। আরেক ভাই শিহাবুদ্দিন ও নাসিরুদ্দিন পালিয়ে তুঘলকের কাছে চলে আসেন। তুঘলক সহযোগিতার জন্য তাদের সঙ্গে গেলেন। আর নিজের ছেলেকে প্রতিনিধি হিসেবে দিল্লিতে রেখে যান। গিয়াসুদ্দিন বাহাদুরকে বন্দি করেন এবং দিল্লিতে ফিরে আসেন।

দিল্লিতে নিজামুদ্দিন অলি বাদায়ুনি থাকতেন।[৫] জুনা খান প্রায়ই তার দরবারে হাজির হতেন এবং তার কাছে দোয়ার আবেদন জানাতেন।[৬] একদিন তিনি

---

[১] মুহাম্মাদ তুঘলকের মতো সৌভাগ্যবান ছেলের ওপর এর চেয়ে বড় কোনো অপবাদ হতে পারে না। তার গোটা জীবনে একটি ঘটনাও এমন নেই, যেখানে তিনি বাবার কোনো নির্দেশের প্রতি অবাধ্যতা পোষণ করেছেন। স্বীকৃত ঐতিহাসিকদের কেউই এই ঘটনার সঙ্গে মুহাম্মাদ তুঘলকের কোনো সম্পৃক্ততা পাননি। ইবনে বতুতা এটা শোনা কথা লিখেছেন।

[২] এতো বড় ষড়যন্ত্রকারী ও সঙ্গী আর কেউ নেই।

[৩] এটাও একটি ভিত্তিহীন কথা।

[৪] এত বড় ষড়যন্ত্র যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, পালাচ্ছে কোথায়? দিল্লির দিকে বারার কাছে। যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করছিলেন তার কাছে? এই বর্ণনাকে যদি যুক্তির আলোকেও বিশ্লেষণ করা হয় তবুও তা একদম ভুল প্রমাণিত হবে।

[৫] সুলতানুল মাশায়েখ হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া মূলত বাদায়ুনের অধিবাসী ছিলেন।

[৬] মুহাম্মাদ তুঘলকের ঝোঁক সবসময়ই দীনদারির প্রতি ছিল।

তার খাদেমদের বললেন, যখন শায়খ আল্লাহপ্রেমে নিমগ্নতার চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকেন তখন আমাকে খবর দেবে। সুতরাং যখন এমন অবস্থা হলো তখন জুনা খানকে খবর দেওয়া হলো। তিনি এলেন। শায়খ তাকে দেখে বললেন, আমি তোমাকে সালতানাত দান করেছি। সেই সময়ই শায়খ ইন্তেকাল করেন। জুনা খান জানাযা পড়ে তাকে দাফন করেন। এই খবর যখন বাদশাহর কাছে পৌছে তখন তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হন।[১] জুনা খানের প্রশস্ত হৃদয়, উদার দানশীলতা, বেশি বেশি ক্রীতদাস কেনাবেচা এ ধরনের কিছু কাজের জন্য আগে থেকে বাদশাহর অসন্তুষ্টি ছিল তার ওপর। এবার বাদশাহ তার ওপর আরো বেশি রুষ্ট হলেন। এছাড়া জনৈক জোতিষী এই খবরও দিয়েছিলেন বাদশাহ এবারের সফর থেকে আর জীবিত ফিরে আসবেন না।

যখন রাজধানীর কাছাকাছি পৌছলেন তখন জুনা খানের কাছে নির্দেশ পাঠালেন তার জন্য যেন আফগানপুরে একটি নতুন রাজমহল তৈরি করে দেন।[২] জুনা খান তিন দিনের মধ্যে রাজমহল তৈরি করে দেন। এটি তৈরি করা হয় সম্পূর্ণ কাঠ দিয়ে, মাটি থেকে অনেক উঁচুতে। আহমাদ বিন আয়ায যিনি পরবর্তী সময়ে 'খাজা জাহাঁ' উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন[৩] তিনি তখন বাদশাহর ইমারত নির্মাণের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি এই মহলটি এমনভাবে নির্মাণ করেন, যদি এর একটি বিশেষ স্থানে হাতি দাঁড় করানো হয় তবে ভবনটি ভেঙে পড়বে। বাদশাহ এই ভবনে উঠেন এবং লোকদের দাওয়াত করেন। যখন লোকেরা খাওয়াদাওয়া সেরে চলে গেল তখন জুনা খান বাদশাহর কাছে হাতি উপস্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করলেন।[৪] মালপত্র বোঝাই অবস্থায় একটি হাতি উপস্থাপন করা হলো। আমাকে শায়খ রুকনুদ্দিন[৫] মুলতানি বলেছেন, তিনি তখন বাদশাহর কাছে ছিলেন।

---

[১] গিয়াসুদ্দিন তুঘলক সুলতানুল মাশায়েখের ব্যক্তিত্ব এবং তার প্রতি জনসাধারণের ভক্তিকে নিজের জন্য অনেক বড় শঙ্কার কারণ মনে করতেন। এজন্য তাকে তিনি ভয় পেতেন। দিল্লিতে তার অস্তিত্ব সহ্য করতে পারতেন না।

[২] এটি একটি নতুন কথা, যা ইবনে বতুতা লিখেছেন। আর এটা যুক্তিসঙ্গতও।

[৩] তিনি তেলেঙ্গানার রাজকুমার ছিলেন। তিনি সুলতানুল মাশায়েখের হাতে বাইআত হয়ে মুসলমান হন। তার দোয়ার বরকতে অনেক মর্যাদা ও উঁচু পদে আসীন হন।

[৪] রাজবংশে এভাবে উপঢৌকন পেশ করার প্রচলন ছিল।

[৫] শায়খ রুকনুদ্দিন মুলতানি যদিও বিশ্বস্ত বুযুর্গ ছিলেন, কিন্তু তিনি ভুল মতও দিতে পারেন। অন্যান্য শীর্ষ ঐতিহাসিকরা যেমন মোল্লা আবদুল কাদির বাদায়ুনি প্রমুখ, যারা কাউকে ক্ষমা করতেন না, তারা

বাদশাহর প্রিয় ছেলে মাহমুদও সেখানে ছিলেন। জুনা খান তাকে বললেন, হে আখুন্দে আলম! আসরের নামাযের সময় হয়েছে। আসুন নামায পড়ে নিই। সুতরাং তিনি মহল থেকে বেরিয়ে এলেন এবং সেই সময়ই হাতি নিয়ে আসা হলো। হাতি মহলে প্রবেশ করার সময় পুরো মহল বাদশাহ ও তার ছেলের ওপর ভেঙে পড়ল। শায়খ বলেন, আমি শোরগোল শুনে নামায না পড়েই ফিরে গেলাম। দেখলাম মহল ভেঙে পড়েছে। জুনা খান আটকে পড়া বাদশাহকে বের করার জন্য কুড়াল ও শাবল আনার নির্দেশ দিলেন। তবে কানে কানে বলে দিলেন একটু দেরিতে যেন আনা হয়।[১] যখন কাঠের স্তূপ সরানোর কাজ শুরু হয় তখন সূর্য ডুবে যায়। স্তূপ সরিয়ে দেখা গেল বাদশাহ তার ছেলের ওপর পড়ে আছেন। দেখে মনে হচ্ছে ছেলেকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে চাচ্ছেন। অর্থাৎ তিনি ছেলেকে উদ্ধার করতে চাচ্ছেন। কেউ কেউ বলেন, বাদশাহ তখনো জীবিত ছিলেন। কিন্তু তাকে তখন মেরে ফেলা হয়।[২] রাতেই তুঘলাবাদে নিজের জন্য বানানো কবরস্থানে বাদশাহকে দাফন করা হয়।

তুঘলাবাদ প্রতিষ্ঠার কারণ আমি আগে উল্লেখ করে এসেছি। এই শহরে বাদশাহর রাজভান্ডার ও রাজমহল ছিল। এই দুর্গে বাদশাহ একটি বড় মহল প্রতিষ্ঠা করেন, যার ইটে সোনা মোড়ানো ছিল। যখন সূর্য অস্ত যেত তখন এটি এমন ঝিলিক দিত, যার দিকে কেউ তাকিয়ে থাকতে পারত না। এখানে বাদশাহ অনেক আসবাবপত্র জমা করেছিলেন। বলা হয়ে থাকে, এখানে একটি হাউজ নির্মাণ করেন, যাতে সোনা গলিয়ে ঢালাই দেওয়া হয়। তার ছেলে যাবতীয় এই সোনা খরচ করেন। যেহেতু খাজা জাহাঁ রাজমহল তৈরিতে কারিগরি দক্ষতার পরিচয় দেন, যে মহল ভেঙে পড়ে তিনি মারা যান, এজন্য বাদশাহর অন্তরে খাজার মতো আর কেউ জায়গা পাননি। কেউ তার সমপর্যায়ের হতেও পারেনি।[৩]

এই বর্ণনাকে মিথ্যা বলে সাব্যস্ত করেছেন।

এটাও বিস্ময়কর যে, জীবনভর মুহাম্মাদ তুঘলকের দেওয়া জায়গির, উপহার এবং তার প্রশস্ত হৃদয়ের দ্বারা উপকৃত হওয়া সত্ত্বেও নিজের উপকারকারী একজন মুরব্বির বিরুদ্ধে এত জঘন্য অভিযোগ একজন বিদেশির কাছে তুলে ধরতে একটুও কুণ্ঠিত হননি!

[১] এটাও ভুল।

[২] এটা আরো ভুল।

[৩] খাজা জাহাঁর ওপর মুহাম্মাদ তুঘলক বেশি অনুগ্রহশীল হওয়ার কারণ হলো, প্রথমত তিনি নওমুসলিম ছিলেন। দ্বিতীয়ত তিনি হযরত সুলতানুল মাশায়েখের অনুরাগী ছিলেন।

আবুল মুজাহিদ
সুলতান ইবনে মুহাম্মাদ শাহ্ তুঘলক
হিন্দ ও সিন্ধের বাদশাহ্

[তুঘলকের অবস্থা, স্বভাব-প্রকৃতি, রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, গুণাগুণ ও শারীরিক গঠনপ্রকৃতি সম্পর্কে ইবনে বতুতার প্রত্যক্ষ দর্শন ও প্রতিক্রিয়া]

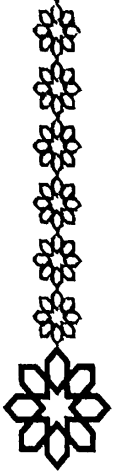

দৃশ্যপটের দুটি দিক

প্রথম দিক

[দান-অনুদান, দয়া-অনুগ্রহ, মানবিকতা, দরিদ্রবান্ধব
ও সহমর্মিতার বিস্ময়কর ও বিরল উদাহরণসমূহ]

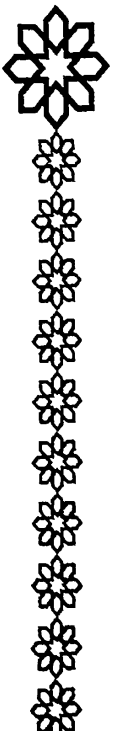

মহান বাদশাহ

অভ্যাস, বৈশিষ্ট্য, চরিত্র ও গঠনপ্রকৃতির আলোচনা

গিয়াসুদ্দিনের পর মুহাম্মাদ তুঘলক কোনো বাধাবিপত্তি ও বিরোধিতা ছাড়াই সিংহাসনে বসেন। আমি আগেই বলেছি, তার প্রকৃত নাম ছিল জুনা খান। সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি আবুল মুজাহিদ মুহাম্মাদ শাহ নাম ধারণ করেন। আগেকার বাদশাহদের সম্পর্কে আমি যা কিছু আলোচনা করেছি এর সবটাই প্রধান বিচারপতি শায়খ কামালুদ্দিন বিন বুরহান গজনবির কাছ থেকে শুনেছি। তবে এই বাদশাহ সম্পর্কে যা লিখছি—সেটা আমার নিজের দেখা।

এই বাদশাহ রক্তপাত এবং বিভিন্ন স্থানে দানশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ। তার শাসনামলে এমন কোনো দিন যেত না যেদিন কোনো দরিদ্র লোক ধনী হয়নি এবং জীবিত কেউ হত্যার শিকার হয়নি। তার দানশীলতা ও বীরত্ব, উদারতা ও রক্তপাতের ঘটনা জনসাধারণের মুখে মুখে ফিরতো। তবে আমি তার চেয়ে বিনয়ী ও ভারসাম্যপূর্ণ কোনো মানুষ দেখিনি। শরিয়তের পুরোপুরি অনুসারী। নামাযের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। যে নামায পড়ে না তাকে সাজা দেন। মোটকথা, তিনি ওই শাসকদের একজন যাদের সৌভাগ্য ও বরকতময়তা সীমাতিরিক্ত। আমি তার অবস্থা তুলে ধরতে গিয়ে এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করব, যা বিস্ময়কর বলে মনে হবে। তবে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ফেরেশতাদের সাক্ষ্য রেখে বলছি, আমি যা কিছু বর্ণনা করব সবই সত্য। তার কার্যক্রম সম্পর্কে আমি যা কিছু লিখেছি তা বেশির ভাগই মানুষের বুঝে আসে না। তারা এটাকে বাড়াবাড়ি মনে করে। কিন্তু আমি যা লিখেছি তা হয়ত নিজ চোখে দেখেছি অথবা এমন কারো কাছ থেকে শুনেছি, যাদের বর্ণনা গোটা প্রাচ্যে অবিচ্ছেদ্য পরম্পরায় পৌঁছে গেছে।[১]

---

[১] ইবনে বতুতার এই নির্মোহ আলোচনা অসম্ভব রকমের চিত্তাকর্ষক। ঘটনা হলো, তার দীর্ঘ ভ্রমণকালে কোথাও তাকে নিষ্ঠুর প্রকৃতির আবার কোথাও দয়া ও অনুগ্রহশীল দেখা যাবে। ইবনে বতুতা মূলত দরবেশ গুণের অধিকারী একজন পর্যটক ছিলেন। কিন্তু এখানে এসে তিনি এমনভাবে ফেঁসে যান, 'বলতেও পারে না আবার সইতেও পারে না' এমন একটা অবস্থায় পড়েন। লোকদের হত্যা করা হচ্ছে, এটা তিনি নিজ চোখে দেখেন। না জানি কবে বাদশাহর চোখ থেকে পড়ে যাবেন আর নিজের পরিণতিও এমন হবে, এটা ভেবে ছিলেন ভীতসন্ত্রস্ত। কারণ তিনি এখানে মরতে আসেননি, জীবন উপভোগ করতে এসেছেন। কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়ায়, দিনে কয়েক বার আতঙ্কে মরে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়।

ইবনে বতুতা তুঘলকের মেজাজ-প্রকৃতি সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন তা একদম সঠিক। ঐতিহাসিক

কাসারে সুলতানি : হাজার স্তম্ভের একটি দৃষ্টিনন্দন মহল

দিল্লির শাহি মহলকে 'দারে সিরা' বলে। কয়েকটি দরজা পেরিয়ে মহলে ঢুকতে হয়। প্রথম দরজায় নিরাপত্তা প্রহরী থাকে। সেখানে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে লোকজন বসা থাকে। যখন কোনো আমির অথবা বড় কেউ আসে তখন তারা সেই বাদ্যযন্ত্রগুলো বাজাতে থাকে। বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে এমন শব্দ বেরিয়ে আসে যে, অমুক এসেছেন। এমনিভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দরজায়ও একই ব্যবস্থাপনা। প্রথম দরজার বাইরে প্যাভিলিয়ন আছে, সেখানে জল্লাদ বসে থাকে। যখন বাদশাহ কাউকে হত্যার নির্দেশ দেন তখন হাজার স্তম্ভের মহলের[১] সামনে তাকে হত্যা করা হয়। তবে প্রথম দরজার বাইরে তার মাথা তিন দিন পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় দরজার মধ্যখানে বড় একটি করিডোর রয়েছে, দুই পাশে প্যাভিলিয়ন বানানো। সেখানে বাদ্যযন্ত্র বাদকরা বসে থাকে। দ্বিতীয় দরজায় সেই দরজার নিরাপত্তা প্রহরীরা থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দরজার মাঝখানে বড় একটি প্যাভিলিয়ন। সেখানে প্রধান নকিব (রেজিস্টার রক্ষক) বসা থাকত। তার হাতে থাকত একটি সোনার লাঠি। মাথার ওপর স্বর্ণ ও জরির কাজ করা টুপি। এর ওপরে ময়ূরের ডানা লাগানো থাকত। আর বাকি রক্ষীদের কোমরে জরির পট্টি, মাথায় সোনায় মোড়ানো টুপি, হাতে চাবুক, যার হাতল হতো সোনার অথবা রুপার। দ্বিতীয় দরজায় একটি বড় দরবার হল। এখানে সর্বসাধারণ বসে। তৃতীয় দরজায় কেরানি বসা থাকে। তার কাজ হলো, কারো নাম তালিকাভুক্ত না করে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয় না। প্রত্যেক আমিরের সহযোগীদের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট এবং তা লিপিবদ্ধ থাকে। কেরানিরা তাদের রোজনামচায় লিখে রাখে অমুক ব্যক্তি এই পরিমাণ সহযোগী নিয়ে অমুক সময় এসেছেন। বাদশাহ এই রোজনামচা ইশার নামাযের পর দেখে থাকেন। যেসব ঘটনা ঘটে তা ওই রোজনামচায় লেখা হয়। বাদশাহর ছেলেদের মধ্যে একজনের দায়িত্ব হলো এই রোজনামচা বাদশাহর সামনে পেশ করা।

ফেরেশতার ভাষ্যেও সেভাবেই এসেছে। একদিকে তিনি ছিলেন হত্যাকারী আবার অন্যদিকে প্রাণভিক্ষা দাতা। আলেমও আবার উলামা-মাশায়েখের শত্রুও। কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত হননি। একটির বেশি বিয়ে করেননি। কুরআনে কারিম হিফয করেন। মিষ্ট ভাষা ও সুন্দর লিখনি তার যোগ্যতার প্রমাণ বহন করে। নামায-রোযার ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দিতেন। মুস্তাহাবও অনেক গুরুত্ব দিয়ে আদায় করতেন। কিন্তু তার তলোয়ার ছিল নাঙ্গা। যেকোনো সময় তা সক্রিয় হয়ে উঠত। এমন একজন শাসকের আতিথেয়তায় থেকে ইবনে বতুতার রক্ত শুকিয়ে যায় দুশ্চিন্তায়।

[১] বিস্তারিত জানতে স্যার সাইয়েদের আসারুস সানাবিদ দেখা যেতে পারে।

বাদশাহর দরবার

বাদশাহর দরবারে হাজির হওয়ার আদব ও আইনকানুন

এখানকার আইন হলো, যে আমির তিন দিন অথবা এর চেয়ে বেশি বিনা কারণে কিংবা কোনো কারণে অনুপস্থিত থাকবেন, তিনি আর দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না, যতক্ষণ না নতুন করে বাদশাহর বিশেষ অনুমতি লাভ করবেন। তিনি কোনো অসুস্থতা বা যৌক্তিক কোনো কারণে অনুপস্থিত থাকলে যেদিন আসবেন নিজের সাধ্য অনুযায়ী হাদিয়া পেশ করবেন। মৌলভি হলে হাদিয়া কুরআন শরিফ অথবা কোনো কিতাব। গরিব হলে জায়নামায, তাসবিহ বা মিসওয়াক। ধনী হলে ঘোড়া, উট অথবা কোনো অস্ত্র। তৃতীয় দরজার ভেতরে অনেক বড় একটি মাঠ আছে, যেখানে একটি বৈঠকখানা বানিয়ে রাখা হয়েছে। এই বৈঠকখানার নাম 'হাজার স্তম্ভ'। কেননা এর ছাদ দাঁড়িয়ে আছে এক হাজার কাঠের স্তম্ভের ওপর। স্তম্ভগুলো তেল মাখানো। আর ছাদেও তেল মাখানো। সেখানে নানা ধরনের নকশা করা। সবাই এখানে এসে বসে। আর বাদশাহও সর্বসাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এখানে এসে বসেন।

বাদশাহর বৈঠক বেশির ভাগই হয় আসরের পর। কখনো চাশতের সময়ও হয়। বাদশাহর বসার জায়গাটি একটি শাহি জায়গা। অন্যান্য স্থান থেকে উঁচু। এখানে কার্পেট বিছানো। বাদশাহর কোমরের পেছনে বড় কুশন আর ডানে-বামে দুই পাশে ছোট দুটি কুশন। আর বসা এমনভাবে বসেন যেন নামাযে বৈঠক করছেন। বেশির ভাগ হিন্দুস্তানি এভাবেই বসে।[১] বাদশাহর বসা অবস্থায় উযির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। কাতিব থাকে উযিরের পেছনে। আর তার পেছনে নিরাপত্তা প্রহরীদের সর্দার বাদশাহর চাচাতো ভাই মালিক ফিরোজ নিয়োজিত। এর পেছনে তার সহযোগী। এরপর বিশেষ নিরাপত্তা প্রহরী, তাদের পেছনে সহযোগী বিশেষ নিরাপত্তা প্রহরী। এরপর 'ওকিলুদ দার' ও তার সহযোগী, এরপর 'শারিফুল হিজাব' ও সাইয়্যিদুল হিজাব। তাদের পরে থাকে নিরাপত্তারক্ষীরা, যাদের সংখ্যা শ খানেক।

বাদশাহ যখন বসে যান তখন নিরাপত্তা প্রহরীরা বিসমিল্লাহ বলেন। বাদশাহর পেছনে মালিক কাবুলা দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি মশা-মাছি তাড়ান।

---

[১] অর্থাৎ দুই জানু। এইভাবে বসা আদবের পরিচায়ক।

বাদশাহর ডানে-বামে অস্ত্রধারী যুবক দাঁড়ানো থাকে। তাদের হাতে ঢাল, তলোয়ার ও কামান থাকে। বৈঠকখানার ডানে-বামে লম্বালম্বিভাবে প্রধান বিচারপতি, এরপর প্রধান খতিব, অন্যান্য বিচারক ও বড় বড় ফকিহরা বসেন। পরে পর্যায়ক্রমে সাইয়েদ, মাশায়েখ, বাদশাহর ভাই, জামাতা বসেন। তাদের পেছনে বসেন বড় বড় আমির, বিদেশি মেহমান ও দূতরা। এর পেছনে সেনা অফিসাররা দাঁড়িয়ে থাকেন।

ষাটটি ঘোড়া হাজির থাকে সেখানে। রাজকীয় লাগাম বাঁধা। নানা ধরনের সাজসজ্জা ও অলংকারে সজ্জিত। কোনোটার লাগাম হালকা কালো রেশমের আবার কোনোটার লাগাম সাদা রেশমের। এসব ঘোড়ায় বাদশাহ ছাড়া আর কেউ আরোহণ করতে পারে না। এগুলোর মধ্যে অর্ধেক ডানে এবং অর্ধেক বাঁ পাশে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় যে, বাদশাহ তাকালে যাতে সবগুলো দেখতে পারেন। এরপর আসে পঞ্চাশটি হাতি। তাদের ওপর স্বর্ণ রেশম সংযুক্ত কাপড় পরানো। আর তাদের দাঁতগুলো লোহা দিয়ে বাঁধানো। এগুলো দ্বারা অপরাধীদের হত্যা করা হয়। প্রত্যেক হাতির গর্দানে মাহুত বসা থাকে। তাদের হাতে লোহার শিকল, এর দ্বারা তারা হাতিকে পরিচালিত করে। প্রত্যেক হাতির পিঠে একটি করে বড় সিন্ধুক[১] থাকে। যাতে কমবেশি ২০ জন সেনা বসতে পারে।

এই হাতিগুলো প্রশিক্ষিত। যখন নিরাপত্তা প্রহরীরা বিসমিল্লাহ বলে তখন এই হাতিগুলো মাথা নুইয়ে সম্মান জানায়। অর্ধেক হাতি এক দিকে দাঁড় করানো থাকে আর বাকি অর্ধেক অন্য দিকে দাঁড় করানো। এই হাতিগুলো মানুষজনের পেছনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। প্রত্যেকেই প্রথমে বাদশাহর সামনে আসে। তাকে সম্মান জানিয়ে নির্ধারিত স্থানে চলে যায় এবং সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। যখন কোনো হিন্দু লোক বাদশাহকে সম্মান জানাতে আসে তখন প্রহরীরা বিসমিল্লাহর পরিবর্তে 'হাদাকাল্লাহ'[২] বলে।

বাদশাহর ক্রীতদাসরা লোকজনের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের হাতে ঢাল ও তলোয়ার থাকে। তাদের মধ্যখান দিয়ে কেউ ভেতরে ঢুকতে পারে না। বরং যারা আসে তারা নকিব ও প্রহরীদের দাঁড়িয়ে থাকার জায়গা হয়ে আসে। যখন কোনো বিদেশি নাগরিক সালাম দিতে আসে তখন দরজায় এসে অবগত করে। সর্বপ্রথম প্রহরীদের সর্দার, এরপর তার সহযোগী,

---

[১] হাওদাজ (উটের পিঠে বসার স্থান)।

[২] অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে হেদায়াত দিন।

এরপর সাইয়্যিদুল হিজাব, এরপর শরফুল হিজাব পর্যায়ক্রমে বাদশাহর দরবারে হাজির হয়। তারা তিন দফা সম্মান প্রদর্শন করে এবং আরজ করে—অমুক ব্যক্তি এসেছেন সালাম জানাতে।

যখন অনুমতি মেলে তখন তাদের আনা উপঢৌকন হাতির ওপরে রেখে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যেন বাদশাহর নজর এর ওপর পড়ে। এরপর নির্দেশ আসে, উপঢৌকনদাতাকে ডাকো। তারা বাদশাহর কাছে পৌঁছার আগে তিন দফা সম্মান প্রদর্শন করে। এরপর প্রহরীদের দাঁড়ানোর জায়গায় এসে সম্মান প্রদর্শন করে। বড় কেউ এলে প্রধান প্রহরীর কাতারে এসে দাঁড়ান। অন্যথায় তার পেছনে। আর বাদশাহ তাদের সঙ্গে অত্যন্ত নম্র ও কোমলভাবে কথাবার্তা বলেন। তাদেরকে মোবারকবাদ জানান। তারা বেশি সম্মানী হলে বাদশাহ তাদের সঙ্গে মুসাফাহা করেন। কারো কারো সঙ্গে কোলাকুলিও করেন। তাদের উপঢৌকনের কোনো কোনোটি সামনে আনতে বলেন। কোনো কাপড় বা অস্ত্র হলে উলট-পালট করে দেখান। তাদেরকে খুশি করার জন্য প্রশংসা করেন। পরে তাদেরকে খিলআত (বিশেষ পোশাক) দেওয়া হয়। উপঢৌকনদাতার স্তর অনুযায়ী তাদের জন্য উপহার বরাদ্দ হয়।

যখন সরকারি কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী কোনো উপঢৌকন পেশ করে অথবা কোনো দেশ থেকে রাজস্ব আদায় করে আনে তখন সোনার পাত্র উদাহরণস্বরূপ বাটি, বদনা বা অন্য কিছু বানিয়ে নেয়। সোনার ইটও বানায়, যাকে 'খুশক' বলা হয়। বাদশাহর ক্রীতদাসরা হাতে হাতে এসব জিনিস বা সোনার ইট নিয়ে বাদশাহর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। উপঢৌকন হিসেবে হাতি নিয়ে এলে সেই হাতি পেশ করা হয়। এরপর আনা হয় আসবাবপত্র বোঝাই ঘোড়া। এরপর খচ্চর, এরপর উট আনা হয়। এগুলোর ওপর মালপত্র বোঝাই থাকে।

যখন বাদশাহ দৌলতাবাদ থেকে এলেন তখন খাজা জাহাঁ উযির উপঢৌকন পেশ করলেন। তখন আমিও সেখানে ছিলাম। খাজা জাহাঁ শহরের সীমানা থেকে বাইরে এসে উপঢৌকন পেশ করেন। তিনি সেই পদ্ধতিতেই উপঢৌকন পেশ করেন, যা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি। এই উপঢৌকনের মধ্যে একটি পাত্র জমরদ দ্বারা ভর্তি এবং আরেকটি পাত্র ছিল মোতি দ্বারা ভর্তি। সেই সময় ইরানের বাদশাহ সুলতান আবু সাঈদের চাচাতো ভাই ও হাজি গাওন উপস্থিত ছিলেন। বাদশাহ উপঢৌকনের একটি বড় অংশ তাদের দিয়ে দেন।

ঈদ উৎসব

ঈদের নামাযের জন্য হিন্দুস্তানের বাদশাহর আনুষ্ঠানিকতা

চাঁদ রাতে বাদশাহ নিজের পক্ষ হতে আমির, সাথীসঙ্গী, মুসাফির, প্রহরী, নকিব, অফিসার, ক্রীতদাস ও পত্র লেখকদের জন্য প্রত্যেকের স্তর অনুযায়ী পোশাক পাঠান। সকাল বেলা হাতি সাজানো হয়। হাতির ওপর রেশমের তৈরি সোনালি রঙের কাপড় দেওয়া হয়। শ খানেক হাতি বিশেষভাবে প্রস্তুত থাকে বাদশাহর আরোহণের জন্য। প্রত্যেক হাতির ওপর একটি করে ছাতা ঝুলানো থাকে। ছাতা রেশম দ্বারা বানানো এবং মণি-মুক্তা খচিত। প্রতিটি ছাতার হাতল খাঁটি সোনা দ্বারা তৈরি। প্রতিটি হাতির ওপর একটি গদি রাখা, যা মণি-মুক্তা খচিত। একটি হাতিতে বাদশাহ চড়ে বসেন। এর জিনেও মণি-মুক্তা খচিত। হাতির আগে আগে ক্রীতদাস ও পাইক-পেয়াদারা ছুটে চলে। তাদের প্রত্যেকের মাথায় বিশেষ ধরনের টুপি থাকে। আর কোমরে বাঁধা থাকে একটি পট্টি। এর কোনো কোনোটিতে মণি-মুক্তা খচিত। বাদশাহর সামনে নকিবরাও থাকে, যারা সংখ্যা তিনশ। তাদের প্রত্যেকের মাথায় পশমের টুপি এবং কোমরে পট্টি বাঁধা। আর হাতে থাকে চাবুক—যার হাতল সোনার।

সদরে জাহাঁ কাজিউল কুজাত কামালুদ্দিন গজনবি ও সদরে জাহাঁ কাজিউল কুজাত নাসিরুদ্দিন খাওয়ারিজমি, সমস্ত বিচারপতি, বিদেশিদের মধ্যে স্তর অনুযায়ী ইরাকি, খুরাসানি ও পশ্চিমারা হাতিতে আরোহণ করেন এবং তাকবির ধ্বনি বলতে থাকেন। এইভাবে বাদশাহ রাজপ্রাসাদ থেকে বের হন। আর বাইরে বাহিনী অপেক্ষায় থাকে। প্রত্যেক আমির নিজ নিজ বাহিনী পৃথক স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখেন। প্রত্যেকের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রও থাকে।

সর্বপ্রথম বাদশাহর বাহন ছুটে চলে। আর বাদশাহর সামনে থাকে কিছু লোক, যাদের কথা আমি ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি। কাজি ও মুয়াযযিনও থাকেন, যারা তাকবির পাঠ করেন। বাদশাহর ঠিক পেছনে বাদ্যযন্ত্র বাদকরা থাকেন। আর তাদের পেছনে থাকেন বাদশাহর খাদেমরা। এরপর বাদশাহর ভাই মুবারক খান, তার সঙ্গে বাহিনী ও বাদ্যযন্ত্রও থাকে। এরপর বাদশাহর পেছনে বাহরাম খানের বাহন। এরপর বাদশাহর চাচাতো ভাই মালিক ফিরোজ[১] থাকেন। এরপর মালিক মুজির যিররিজা, এরপর মালিক কাবুলা থাকেন। এই আমিররা বাদশাহর একদম পাশাপাশি থাকেন। তারা অনেক

[১] ফিরোজ তুঘলক যিনি মুহাম্মাদ তুঘলকের স্থলাভিষিক্ত হন।

সম্পদশালীও। আমাকে দেওয়ান মালিক আলাউদ্দিন মিশরি, যিনি ইবনে সারশি নামে পরিচিত, তিনি বলেছেন, তার এবং তার সঙ্গে থাকা বাহিনী ও খাদেমদের বার্ষিক খরচ ৩৬ লাখ রুপি। এরপর থাকেন মালিক নুকবা, এরপর মালিক বাগরা। এরপর মালিক মুখলিস। তাদের পরে থাকেন কুতবুল মালিক। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে বাহিনী ও বাদ্যযন্ত্র থাকে।

কুরবানির ঈদের দিন বাদশাহ কীভাবে কুরবানি করেন?

আমি ওপরে যাদের কথা আলোচনা করেছি, তারা সবাই আমির। সবসময় বাদশাহর কাছে থাকেন। ঈদের দিন তারা বাদশাহর সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রসহ যান আর অন্যরা বাদ্যযন্ত্র ছাড়া। তারা মূলত স্তরের দিক থেকে ছোট আমির। ঈদের দিন প্রত্যেকে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিজ নিজ ঘোড়া নিয়ে হাজির হন। বাদশাহ যখন ঈদগাহের দরজায় পৌঁছেন তখন তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে যান এবং নির্দেশ দেন কাজি, মুয়াযযিন, বড় বড় আমির ও মর্যাদা অনুযায়ী বিদেশিরা যেন আগে প্রবেশ করে। বাদশাহ তাদের পর প্রবেশ করেন। ইমাম নামায শুরু করেন এবং খুতবা পড়েন। কুরবানির ঈদ হলে বাদশাহ বর্শা দ্বারা উট নহর[১] করেন। এর আগে গায়ের জামার ওপর একটি রেশমের কাপড় পরে নেন, যাতে রক্তের ছিটা পোশাকে না লাগে। কুরবানি করার পর বাদশাহ হাতিতে সওয়ার হয়ে রাজমহলে চলে আসেন।

ঈদের দিনে রাজমহল

ইসলামি আভিজাত্যের মনোরম দৃশ্য

ঈদের দিন পুরো দরবার হলে বিছানা বিছানো হয় এবং নানা ধরনের সাজসজ্জা করা হয়। আর দরবার হলের বারান্দায় বড় মঞ্চ বানানো হয়। এটি নানা ধরনের ফুল দিয়ে সাজানো হয়। দরবার হলে তিন দিকে গাছের সারির মধ্যখানে একটি সোনার খাট পাতা হয়। এর মধ্যে একটি গদি পাতা হয়। গদির ওপরে একটি রুমাল বিছানো থাকে।

দরবার হলের মাঝখানে একটি বড় কাঠ থাকে। এটি সোনার তৈরি এবং নানা মণি-মুক্তা খচিত। এর দৈর্ঘ্য ৩২ বিঘত এবং প্রস্থে এর অর্ধেক। এটা আলাদা আলাদা টুকরো অবস্থায় থাকে। যখন দরবার হলে স্থাপন করা হয়

[১] জবাই করা।

তখন জোড়া লাগানো হয়। এক একটি টুকরো কয়েকজন মিলে উঠাতে হয়। এর ওপর একটি চেয়ার পাতা থাকে। আর বাদশাহর মাথার ওপর থাকে একটি ছাতা। বাদশাহ যখন চেয়ারে বসেন তখন প্রহরী ও নকিবরা জোরে বিসমিল্লাহ বলেন।

পরে এক ব্যক্তি সালাম দিতে সামনে এগিয়ে আসে। প্রথমে কাজি, খতিব, আলেম, সাইয়েদ, শায়খগণ, বাদশাহর ভাই এবং নিকটাত্মীয়রা আসে। পরে আসে বিদেশিরা। এরপর আসে সেনাবাহিনীর বড় বড় অফিসাররা। এরপর বৃদ্ধ ক্রীতদাসরা। পরে সেনাবাহিনীর সদস্যরা প্রত্যেকে সালাম জানিয়ে সামনে দিয়ে অতিবাহিত হতে থাকে এবং নিজ নিজ জায়গায় গিয়ে বসে যায়। এটাও নিয়ম রয়েছে, যাদের জায়গির দেওয়া হয়েছে তারা ঈদের দিন কিছু মুদ্রা নিয়ে আসে হাদিয়া হিসেবে। সেই মুদ্রা রুমালে বাঁধা থাকে। এর ওপরে দাতার নাম লেখা থাকে। এভাবে অনেক মুদ্রা জমা হয়। বাদশাহ এগুলো যাকে ইচ্ছা দান করে দেন।

সালাম পর্ব সম্পন্ন হওয়ার পর খাবার আসে। ঈদের দিন বড় এস্ট্রে বের করা হয়। এটি গম্বুজ আকৃতির খাঁটি সোনা দ্বারা বানানো। এটিও টুকরো টুকরো অবস্থায় রাখা হয়। যখন বের করা হয় তখন টুকরোগুলো জোড়া লাগানো হয়। এর মধ্যে তিনটি স্তর থাকে। এর মধ্যে পরিচালনাকারী নেমে উদ, এলাচি এবং আম্বর প্রজ্বলন করে। এতে পুরো বৈঠকখানা মোহিত হয়ে যায়। ক্রীতদাসদের হাতে স্বর্ণ ও রুপার পাত্রে গোলাপজল থাকে। উপস্থিত সবার মধ্যে সেটা ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এরপর ফুলের পাপড়ি ছিটানো হয়। এই বড় কাঠ ও এস্ট্রে শুধু ঈদের দিনই বের করা হয়।

ঈদের পর বাদশাহ আরেকটি আসনে বসেন। এটি সোনার সিংহাসন। এই হলের তিনটি দরজা। প্রথম দরজায় ইমাদুল মুলক সারতিজ দাঁড়িয়ে থাকেন। দ্বিতীয় দরজায় মালিক নাকবা এবং তৃতীয় দরজায় ইউসুফ বাগরাওয়ার দাঁড়িয়ে থাকেন। তাদের ডানে-বামে অন্য আমিররা দাঁড়িয়ে থাকেন। দরবার হলের কোতোয়াল মালিক তাগি। তার হাতে সোনার লাঠি থাকে। আর তার সহযোগীর হাতে থাকে রুপার লাঠি। তারা দুজন দরবারের লোকদের যথাস্থানে বসান এবং কাতার সোজা করেন। উযির এবং কাতিব তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকেন। হাজিব ও নকিব ও নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে।

এরপর পরিদর্শক ও গায়ক দল আসে। প্রথমে আসে রাজা-বাদশাহদের মেয়েরা যাদেরকে এই বছর রণাঙ্গন থেকে আটক করা হয়েছে। তারা গানবাদ্য করে এবং নাচ দেখায়। তাদেরকে বাদশাহ নিজের ভাই-বন্ধু, জামাতা ও শাহজাদাদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। এই বৈঠক আসরের সময় শুরু হয়। দ্বিতীয় দিনও এই বৈঠক যথারীতি আসরের সময়ই শুরু হয়। ঈদের তৃতীয় দিন বাদশাহর আত্মীয়স্বজনদের বিয়ের আয়োজন করা হয়। তাদেরকে বিভিন্ন জায়গির উপহার হিসেবে দেওয়া হয়। চতুর্থ দিন ক্রীতদাস মুক্ত করা হয়। পঞ্চম দিন ক্রীতদাসী মুক্ত করা হয়। ষষ্ঠ দিন ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদের বিয়ের আয়োজন করা হয়। আর সপ্তম দিন দান-খয়রাতের জন্য অবারিত থাকে।

সফর থেকে ফেরা

বাদশাহর বাহনের দৃশ্য

বাদশাহ যখন সফর থেকে ফিরে আসেন তখন হাতিগুলো সজ্জিত করা হয়। ১৬টি হাতির মাথার ওপর বড় বড় ছাতা ঝুলানো থাকে। এগুলোও মণি-মুক্তা খচিত। কাঠের বড় বড় প্যাভিলিয়ন বানানো হয়। সেগুলো আবার কয়েক তলা। এগুলো সজ্জিত করা হয় রেশমের কাপড় দ্বারা। প্রতি তলায় বাঁদিরা ভালো কাপড়চোপড় ও অলংকারাদি পরে বসে থাকে। প্রতিটি প্যাভিলিয়নের মাঝখানে চামড়ার তৈরি ট্যাঙ্ক থাকে, যার মধ্যে গোলাবের শরবত রাখা হয়। এই বাঁদিরা স্থানীয় বা মুসাফির প্রত্যেককে পানি পান করায়। যখন তাদের পানীয় পান সম্পন্ন হয়ে যায় তখন পান-সুপারি খেতে দেওয়া হয়।

শহর থেকে শাহি মহল পর্যন্ত পুরো রাস্তার দুই পাশের দেয়াল রেশমের কাপড় দিয়ে মোড়ানো হয়। আর রাস্তা বিছানো থাকে রেশমের কাপড়। বাদশাহর ঘোড়া এর ওপর দিয়ে অতিক্রম করে। বাদশাহর সামনে হাজারও ক্রীতদাস থাকে এবং সেনারা পেছনে পেছনে আসে।

মাঝে মাঝে আমিও দেখেছি—হাতির ওপর তিনটি বা চারটি ছোট ছোট কামান উঠানো হয়। এগুলো দ্বারা মানুষের মধ্যে দিনার বা দিরহাম ছিটিয়ে দেওয়া হয়। শহরের দরজা থেকে নিয়ে শাহি মহলের দরজা পর্যন্ত এটা অব্যাহত থাকে।

শাহি দস্তরখান

বন্ধু কিংবা শত্রু সবার জন্য অবারিত

এক. বাদশাহর রাজপ্রাসাদে দুই ধরনের খাবার থাকে। একটি বিশেষ খাবার, আরেকটি সাধারণ খাবার। বিশেষ খাবার হলো যা বাদশাহ নিজে খান। সেখানে তার ঘনিষ্ঠ আমির, তার চাচাতো ভাই ফিরোজ, ইমাদুল মুলক সারতিজ ও মির মজলিস কিংবা বিদেশি মেহমানদের মধ্য থেকে কেউ, যাদের ওপর বাদশাহর বিশেষ দৃষ্টি পড়ে। অনেক সময় উপস্থিত লোকদের মধ্যে কারো প্রতি বেশি অনুগ্রহ দেখাতে গিয়ে বাদশাহ নিজে পাত্র হাতে নিয়ে রুটি তার পাতে তুলে দেন। ওই ব্যক্তি বাঁ হাতে পাত্র ধরেন আর ডান হাতে সালাম করেন। কখনো এই বিশেষ খাবার থেকে অনুপস্থিত কারো জন্য খাবার পাঠানো হয়। তিনিও এভাবেই খাবার গ্রহণ করেন এবং সালাম করেন। নিজের সঙ্গে যত লোক থাকে সবাইকে নিয়ে বাদশাহ খাবার শুরু করেন। আমার বারবার তার সঙ্গে খাবারে শরিক হওয়ার সুযোগ হয়েছে।

দুই. এই খাবার আনা হয় রান্নাঘর থেকে। খাবার আনার সময় তাদের সামনে নকিব থাকে এবং বিসমিল্লাহ বলে। সবার আগে থাকেন প্রধান নকিব। তার হাতে থাকে স্বর্ণের লাঠি। আর তার সহযোগীর হাতে থাকে রুপার লাঠি। যখন নকিবরা চতুর্থ দরজা দিয়ে প্রবেশ করে এবং বৈঠকখানায় উপস্থিত লোকেরা তাদের আসার আওয়াজ পায় তখন সবাই দাঁড়িয়ে যায়। একমাত্র বাদশাহ ছাড়া আর কেউ বসা থাকে না।

যখন খাবার মাটিতে রাখা হয় তখন নকিবরা কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আর তাদের সর্দার সবার আগে দাঁড়িয়ে বাদশাহর গুণকীর্তন করতে থাকেন। এরপর মাটিতে চুমু খান। তার সঙ্গে সব নকিব মাটিতে চুমু খায়। উপস্থিত সবাই মাটিতে চুমু খায়। এটাও নিয়ম রয়েছে, যখন নকিবরা আসছে বলে কেউ শব্দ শুনতে পান তখন যেখানে আছেন সেখানেই দাঁড়িয়ে যান। যতক্ষণ নকিব বাদশাহর গুণকীর্তন সম্পন্ন না করেছে তখন কেউ তার জায়গা থেকে নড়েন না। এরপর একইভাবে প্রধান নকিবের সহযোগীরা প্রশংসা করেন। এরপর সবাই মাটিতে চুমু খান। পরে সবাই বসতে পারেন।

কেরানি উপস্থিত সবার নাম লিখে নেয়। এমনকি কারো আসার খবর বাদশাহ জানলেও। পরে বাদশাহর ছেলেদের মধ্য থেকে কেউ এই তালিকাটি বাদশাহর কাছে নিয়ে যান। এই তালিকা দেখে বাদশাহ নির্দেশ

দেন, অমুক আমির আজ খাবার খাওয়াবে। তাদের খাবার চাপাতি রুটি, ভুনা গোশত, ভাত, মোরগ ও সমুচা ইত্যাদি হয়ে থাকে। দস্তরখানের মধ্যখানে কাজি, খতিব, ফকিহ, সাইয়েদ, শায়খরা বসেন। এরপর বাদশাহর আত্মীয়স্বজন এবং বড় বড় আমিররা স্তর অনুযায়ী বসেন। প্রত্যেকের বসার জায়গা নির্ধারিত থাকে। যারা খুব পরিচিত তাদের বসার জায়গায় একদম ভিড় হয় না।

যখন সবাই বসে যায় তখন পানকারী আসে। তাদের হাতে সোনা, রুপা, তামা ও কাচের পাত্র থাকে এবং এর মধ্যে ভরা থাকে শরবত। খাবারের আগে সবাই শরবত পান করে। যখন শরবত পান শেষ হয়ে যায় তখন প্রহরী বিসমিল্লাহ বলে। তখন সবাই খাবার শুরু করে। সবার সামনে সব ধরনের খাবার সম্বলিত একটি পাত্র থাকে। একটি পাত্রে দুজন শরিক হন না। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা খান। খাবার শেষ হওয়ার পর নাবিজ (এক ধরনের পানীয়) এর গ্লাস আনা হয়। যখন প্রহরী বিসমিল্লাহ বলে তখন সবাই তা পান শুরু করে।

এরপর সবাই পান চিবায়। প্রত্যেককে একটি বাটা ভরা সুপারি এবং ১৫টি পান দেওয়া হয়। যা লাল রেশমের সুতা দিয়ে বাঁধা থাকে। সবার কাছে যখন পান এসে যায় তখন প্রহরী বিসমিল্লাহ বলে। তখন সবাই দাঁড়িয়ে যায়। যে আমির খাবারের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন তিনি মাটিতে চুমু খান। পরে উপস্থিত সবাই মাটিতে চুমু খায় এবং চলে যায়। খাবারদাবার হয়ে থাকে দুই পর্বে। একটি যোহরের আগে, আরেকটি আসরের পরে।[১]

তুঘলকের দান-খয়রাতের দাস্তান

বাদশাহর দান-অনুদান প্রসঙ্গে শুধু ওই ঘটনাগুলোই উল্লেখ করব যা আমার সামনে ঘটেছে। যার প্রত্যক্ষদর্শী আমি। যে ঘটনাগুলোর ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারি।[২]

---

[১] বিশেষ দস্তরখানে দুশ এবং সাধারণ দস্তরখানে ২০ হাজার লোক অংশ নিতেন। শাহি বাবুর্চিখানায় প্রতিদিন আড়াই হাজার গরু এবং দুই হাজার ভেড়া-ছাগল জবাই করা হতো।

এর দ্বারা অনুমান করা যায়, বাদশাহর দস্তরখান কতটা প্রশস্ত ছিল। তার খরচের হাত কতটা লম্বা ছিল। বাস্তবতা হলো, আজকাল এসব কথা কল্পকাহিনির মতো মনে হতে পারে। কিন্তু সেই যুগে এমনটাই ছিল। তখন এই কল্পকাহিনির মতো শোনা যাওয়া ঘটনাগুলোই ছিল বাস্তব ও সত্য।

[২] ঐতিহাসিক ফেরেশতা তার দান-অনুদানের কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন, 'ধনী-দরিদ্র, আপন-পর

কথায় কথায় এক বিদেশিকে সম্পদে ভরপুর করে দিলেন

গাওযুন[১] নামক এলাকার এক ব্যক্তি ছিলেন মালিক পারভেজ। শিহাবুদ্দিন নামে তার এক বন্ধু ছিলেন। মালিক পারভেজের জায়গিরে বাদশাহ 'কুনবায়ত'[২] নামে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করেন। আর তাকে উযির পদ দেওয়ার ওয়াদা করেন। তিনি তার বন্ধু শিহাবুদ্দিনকে ডেকে পাঠালেন। যখন তিনি এলেন তখন মালিক পারভেজ তাকে বাদশাহর সঙ্গে উপঢৌকন প্রস্তুত করতে বললেন।

তিনি যে উপঢৌকন প্রস্তুত করেন এর মধ্যে একটি কুঠুরি ছিল যা স্বর্ণের বুটিক দ্বারা তৈরি। এর সামনের সামিয়ানাও ছিল স্বর্ণের কারুকার্যপূর্ণ। এছাড়া একটি তাঁবু ছিল, যা মূলত পার্টিশনযুক্ত বিশ্রামস্থল। এছাড়া অনেকগুলো খচ্চরও ছিল।

যখন শিহাবুদ্দিন এসব জিনিস নিয়ে তার বন্ধু মালিক পারভেজের কাছে এলেন তখন তিনিও রাজস্ব ও বিভিন্ন উপঢৌকন নিয়ে রওনা হলেন। বাদশাহর উযির খাজা জাহাঁর জানা ছিল বাদশাহ মালিক পারভেজকে উযির পদ দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। তিনি এটাকে ভালোভাবে নিলেন না। কেননা আগে কুম্বায়ত ও গুজরাট তার জায়গিরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে তার আন্তরিক সম্পর্ক ছিল।[৩] সেখানকার অধিবাসীদের বেশির ভাগ ছিল হিন্দু। অনেকেই বাদশাহর প্রতি বিদ্রোহীও ছিল।

খাজা জাহাঁ মালিক পারভেজকে রাস্তায় মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করলেন। মালিক পারভেজ উপঢৌকন ও রাজস্ব নিয়ে রাজধানীর দিকে রওনা করে একদিন দুপুরে একটি মনযিলে অবস্থান করছিলেন। বাহিনীর সবাই নিজ নিজ প্রয়োজন পূরণে ব্যস্ত হয়ে গেল। যখন বেশির ভাগ লোক শুয়ে পড়ল তখন হিন্দুদের একটি বড় দল অতর্কিত হামলা চালিয়ে মালিক পারভেজকে হত্যা করল। তার সমস্ত মালামাল লুটে নিল। বাদশাহর জন্য আনা উপঢৌকন ও রাজত্বও ছিনিয়ে নিল। শিহাবুদ্দিনেরও সব মালামাল লুটে নিল। তবে তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেন।

সবাই তার নজরে একরকম ছিল।'

[১] সিরাজের কাছে একটি স্থানের নাম।

[২] একে কম্বায়তও বলে। এখন সেখানে পেট্রোলও আবিষ্কার হয়েছে। হিন্দুস্তান ভাগ হওয়ার পর ভারত সরকার মুসলিম সাম্রাজ্যগুলো কেড়ে নিয়েছে।

[৩] তিনি সেখানকার অধিবাসী নওমুসলিম ছিলেন।

পত্রের মাধ্যমে বাদশাহ এই ঘটনা জানতে পারলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন নাহরাওয়ালার রাজস্ব থেকে ত্রিশ হাজার দিনার যেন তাকে (শিহাবুদ্দিন) দিয়ে দেওয়া হয় এবং তিনি যেন নিজ দেশে ফিরে যান। শিহাবুদ্দিনকে যখন এই কথা বলা হলো তখন তিনি বললেন, আমি বাদশাহর দর্শন লাভের জন্য যাচ্ছি। তার দহলিযে একটু চুম্বন খেতে চাই। বাদশাহকে তার এই কথা জানানো হয়। এতে বাদশাহ খুব খুশি হন। আর শিহাবুদ্দিনকে রাজধানীতে আসার অনুমতি দেন।

শিহাবুদ্দিন যেদিন রাজধানীতে পৌঁছেন সেদিন আমিও বাদশাহর দরবারে হাজির হয়েছিলাম। বাদশাহ আমাকে খিলআত (বিশেষ পোশাক) দান করলেন এবং থাকার অনুমতি দিলেন। শিহাবুদ্দিনকেও অনেক কিছু দিলেন। একদিন বাদশাহ আমাকে ছয় হাজার রুপি দিতে নির্দেশ দিলেন। ওই দিনই জিজ্ঞেস করলেন শিহাবুদ্দিন কোথায়? বাহাউদ্দিন ফালাকি বললেন, আখুন্দে আলম! আমি জানি না। তবে পরে বললেন, শুনেছি তিনি অসুস্থ। বাদশাহ বললেন, 'এই মুহূর্তে রাজকোষ থেকে এক লাখ টিঙ্গা (মুদ্রা) দাও এবং বলো যা খুশি কিনতে।'

বাদশাহ নির্দেশ দিলেন, হিন্দুস্তানের তৈরি যেকোনো আসবাব চাইলে তিনি কিনতে পারেন। যতক্ষণ তার কেনাকাটা শেষ না হবে ততক্ষণ যেন আর কেউ না কিনে। আর এটাও নির্দেশ দিলেন, তিনটি জাহাজ মালপত্র বোঝাই করে তাকে যেন দেওয়া হয়। শিহাবুদ্দিন হারমুযে পৌঁছেন এবং সেখানে বিশাল বাড়ি তৈরি করেন। এই শিহাবুদ্দিনকে আমি শিরাজ শহরে সুলতান আবু ইসহাকের করুণাপ্রার্থী হিসেবে দেখেছি। ইতিমধ্যে তিনি সব সম্পদ খরচ করে ফেলেছেন। হিন্দুস্তানের সম্পদের এটাই অবস্থা। প্রথমত সেখানকার বাদশাহ কোনো সম্পদ বাইরে যেতে দিতেন না। আর গেলেও আল্লাহ তাআলা সেই সম্পদ আহরণকারীকে কোনো না কোনো বিপদে ফেলতেন। শিহাবুদ্দিনের সম্পদের অবস্থাও তাই হয়। তার ভাতিজারা হারমুযের বাদশাহর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে সব সম্পদ নষ্ট করে।

আব্বাসী খলিফার দূতের সঙ্গে সদাচারের বিস্ময়কর উদাহরণ

বাদশাহ খলিফা আবুল আব্বাসের[১] কাছে পত্র পাঠিয়ে দরখাস্ত করেন যাতে

---

[১] এই অনুমতির প্রয়োজন দেখা দেওয়ার কারণ হলো, হিন্দুস্তানের রাজা-বাদশাহরা প্রকৃতিগতভাবে বেশ ধার্মিক ছিলেন। তারা খলিফাকে মুসলিম দুনিয়ার প্রকৃত কান্ডারি মনে করতেন এবং তার অনুমতি

তাকে হিন্দুস্তান ও সিন্ধে বাদশাহি করার অনুমতিপত্র দান করেন। এই দরখাস্ত ছিল নিছক ভক্তির কারণে। আবুল আব্বাস একটি অনুমতিপত্র লিখে শায়খুশ শুয়ুখ রোকনুদ্দিনকে পাঠালেন। যখন শায়খ রোকনুদ্দিন রাজধানীতে পৌঁছলেন তখন বাদশাহকে তাকে স্বাগত জানানো এবং আদর-আপ্যায়নে কোনো কমতি রাখেননি। যখন ওই দূত বাদশাহর কাছে আসেন তখন সম্মান দেখাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে যান। আর অনুদান হিসেবে যা কিছু দেন এর কোনো হিসাব নেই। ঘোড়ার সব সাজসরঞ্জাম ছিল সোনার। বাদশাহর নির্দেশ ছিল, যখন জাহাজ থেকে নেমে ঘোড়ায় চড়বেন তখন ঘোড়ার পায়ে সোনার জুতা লাগিয়ে নেবেন।

শায়খ কম্বায়তের দিকে গিয়ে জাহাজে চড়ে দেশে ফিরে যান। রাস্তায় কাযী জালালুদ্দিন বিদ্রোহ করেন এবং ইবনুল কাওলামি ও শায়খ রোকনুদ্দিন উভয়ের মালপত্র লুটেপুটে নেন। শায়খ প্রাণ নিয়ে কোনো রকম বাদশাহর দরবারে ফিরে আসেন। বাদশাহ তাকে দেখে হাসলেন এবং মজা করে বললেন,

آمدی زر ببری و با صنم دلربا خوری زر نبردی و سر نہی.

এরপর বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, আমি শত্রুদের ওপর হামলা করব এবং আপনার কাছ থেকে যা কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে, এর দুই চার গুণ আপনাকে দেওয়া হবে। যখন আমি হিন্দুস্তান থেকে চলে আসি তখন শুনেছি বাদশাহ তার ওয়াদা পূর্ণ করেন এবং তাকে আগের চেয়ে বেশি দেন।

মিষ্টভাষী এক বক্তাকে বিপুল পরিমাণ উপহার প্রদান

নাসিরুদ্দিন নামে তুরমুযের একজন বক্তা নিজ দেশ থেকে বাদশাহর দরবারে এলেন। তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত রাজধানীতে থাকলেন। যখন ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন তখন বাদশাহ অনুমতি দিলেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত তার ওয়ায শোনার মতো সুযোগ বাদশাহর হয়ে ওঠেনি। তিনি বিদায় হওয়ার আগে তার ওয়ায শোনার ইচ্ছা পোষণ করলেন বাদশাহ। নির্দেশ দিলেন

ছাড়া রাজত্ব করাকে ভুল মনে করতেন। মাহমুদ গজনবি এবং অন্যান্য শাসকেরা অত্যন্ত ভক্তির সঙ্গে খলিফার কাছ থেকে সনদ লাভ করেন। তুঘলক শুরুর দিকে এ দিকে খেয়াল করেননি। যখন এদিকে খেয়াল হলো তখন তার ভক্তি অন্যদের চেয়ে অনেক বেড়ে যায়। এমনকি খলিফার জন্য নিজে ক্ষমতা ছেড়ে দিতেও প্রস্তুত হয়ে যান।

একটি উন্নতমানের মিম্বর প্রস্তুত করতে, যার লোহা-পেরেকগুলোও যেন স্বর্ণের হয়। এর ওপরে একটি বড় পদ্মরাগমণি লাগালেন। নাসিরুদ্দিনকে স্বর্ণখচিত ও মূল্যবান পাথর লাগানো কালো রঙের আব্বাসী একটি খিলআত (বিশেষ পোশাক) এবং পাগড়ি পরতে দিলেন। বাদশাহ নিজ আসনে বসলেন এবং তার ডানে-বাঁয়ে দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, কাজি ও মৌলভিরা নিজ নিজ আসনে বসলেন। বক্তা অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ ও সাবলীল ভাষায় বয়ান করলেন। তার বয়ানের ধরন ছিল খুবই আকর্ষণীয়।

বক্তা যখন মিম্বর থেকে নিচে নামলেন তখন বাদশাহ এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে কোলাকুলি করলেন এবং বক্তাকে হাতির ওপর আরোহণ করালেন। আর সবাইকে নির্দেশ দিলেন তার সঙ্গে যেন পায়ে হেঁটে সামনে অগ্রসর হয়। বক্তাকে একটি বিশেষ তাঁবুতে নিয়ে গেলেন, যা তার জন্যই বানানো হয়েছিল। এর রশিগুলোও ছিল রেশমের। তাঁবুর এক দিকে ছিল স্বর্ণের পাত্র, যা সুলতান তাকে দিয়েছিলেন। এর মধ্যে একটি বড় চুলা ছিল যাতে একজন মানুষ অনায়াসে উঠে বসতে পারত। আর ছিল দুটি ডেগ। প্লেট কতটি ছিল সেটার সংখ্যা আমার মনে নেই। এছাড়া কয়েকটি পানপাত্র, একটি লোটা, একটি বড় ট্রে, যার ছিল পা বিশিষ্ট আর বইপত্রের একটি সিন্দুক। এই সবগুলোই ছিল সোনার তৈরি। ইমাদুদ্দিন সামতানি তাঁবুর দুটি পেরেক উঠিয়ে দেখেন এর একটি পিতলের আর অন্যটি তামার। তবে দেখলে মনে হতো সোনার তৈরি। যদিও প্রকৃতপক্ষে এগুলো সোনার ছিল না। এই বক্তাকে বাদশাহ এক লাখ দিনার এবং দুশ ক্রীতদাস দেন। এর মধ্যে কিছুসংখ্যক তিনি ফিরিয়ে দেন এবং কিছু রাখেন।

আব্বাসী খেলাফতের প্রতি ভক্তি

আবদুল আজিজ ছিলেন ফকিহ ও মুহাদ্দিস। দামেশকে তিনি তাকিউদ্দিন ইবনে তামিয়া, বোরহানউদ্দিন আবারকোহ, জামালুদ্দিন মুযযি ও শামসুদ্দিন যাহাবি প্রমুখের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি যখন বাদশাহর দরবারে আসেন তখন তাকে অনেক খাতির-যত্ন করেন। একদিন তিনি ঘটনাক্রমে হযরত আব্বাস রা. এবং তার বংশধরের ফযিলতের ওপর কিছুস বর্ণনা করেন। আব্বাসি খলিফাদের কয়েকজনের আলোচনাও করেন। বনু আব্বাসের প্রতি বাদশাহর বেশ ভালোবাসা ছিল। এই হাদীসগুলো তার বেশ পছন্দ হলো। বাদশাহ তখন আবদুল আজিজের কদমবুসি করেন। স্বর্ণের

থালায় দুই হাজার আশরাফি (মুদ্রা) আনার পরামর্শ দেন। থালাভর্তি এই মুদ্রা তিনি ফকিহ আবদুল আজিজকে দিয়ে দেন।

প্রতি পঙ্ক্তির জন্য এক হাজার আশরাফির অতুলনীয় অনুদান

ফকিহ শামসুদ্দিন আন্ধগানি একজন চিকিৎসক ও কবি ছিলেন। তিনি বাদশাহর প্রশংসায় একটি ফারসি কবিতা পাঠ করেন। এই কবিতায় ২৭টি পঙ্ক্তি ছিল। বাদশাহ তাকে প্রতিটি পঙ্ক্তির জন্য এক হাজার আশরাফি দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এক্ষেত্রে একটি পঙ্ক্তির জন্য এর চেয়ে বেশি হাদিয়া দেওয়ার কথা আমরা আর শুনিনি। যদিও বাদশাহর দান-অনুদানের যে ধারা তাতে এটা কিছুই ছিল না।

না দেখেই এক বিশিষ্টজনকে ১০ হাজার রুপি পাঠিয়ে দিলেন

শুনকারি আয়ুদুদ্দিন তার দেশে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কথা মুখে মুখে চর্চিত ছিল। বাদশাহও তার প্রশংসা শোনেন। তার জন্য দশ হাজার রুপি পাঠিয়ে দিলেন। অথচ বাদশাহ তাকে কখনো দেখেননি এবং তার কাছে কোনো দূতও পাঠাননি।

কাজী মাজদুদ্দিনের জন্য দশ হাজার রুপি পাঠিয়ে দিলেন

যখন বাদশাহ কাজী মাজদুদ্দিনের প্রশংসা শোনেন তখন তার জন্য শিরাযে শায়খজাদা দিমাশকির নিকট ১০ হাজার রুপি হাদিয়া হিসেবে পাঠিয়ে দেন।

এক বিদেশি বক্তাকে চল্লিশ হাজার দিনার অনুদান

বোরহানউদ্দিন সাগেরজি নামে একজন বক্তা ছিলেন। তিনি এতোটা দানশীল ছিলেন যে, নিজের কাছে যা কিছু থাকত ফকির-মিসকিনদের দিয়ে দিতেন। অনেক সময় ধারকর্জ করে দান করতেন। বাদশাহর কাছে তার এই গুণের খবর পৌঁছে। তখন তার কাছে চল্লিশ হাজার দিনার পাঠিয়ে দিলেন এবং তাকে হিন্দুস্তানে আসার অনুরোধ জানালেন। বোরহানউদ্দিন সেই দিনার গ্রহণ করলেন। এর দ্বারা নিজের ধারকর্জ আদায় করেন। কিন্তু তিনি হিন্দুস্তানে আসতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, বাদশাহ হিন্দুস্তানের আলেমদের তার সামনে দাঁড় করিয়ে রাখেন। আমি এমন ব্যক্তির চাকরি করতে ইচ্ছুক না। পরে মালিক খাতার কাছে চলে গেলেন।

ইরানের এক শাহজাদার সঙ্গে সদাচার

হাজি গাওন ছিলেন ইরানের বাদশাহ সুলতান আবু সাইদ চাচাতো ভাই। তার ভাই মুসা ইরাকের কোনো একটি এলাকার গভর্নর ছিলেন। তিনি হাজি গাওনকে দূত হিসেবে বাদশাহর দরবারে পাঠালেন। বাদশাহ তাকে অনেক সম্মান করলেন এবং অনেক কিছু দিলেন।

এক দিনের ঘটনা। উযির খাজা জাহাঁ হাদিয়া পাঠালেন। এর মধ্যে তিনটি থালা ছিল। একটিতে ইয়াকুত (চুনি), দ্বিতীয়টিতে জামরাদ (মূল্যবান সবুজ পাথর) ও তৃতীয়টিতে মোতি ছিল। হাজি গাওনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে এসব থেকে তাকে অনেক হাদিয়া দিলেন। পরবর্তী সময়ে বিদায়ের সময় আরো দিলেন। হাজি গাওন ইরাকে যাওয়ার পর তার ভাই মারা গেলেন। তার পরিবর্তে সুলাইমান গভর্নর হয়ে যান। হাজি গাওন তার ভাইয়ের উত্তরাধিকারী হিসেবে সম্পদের দাবি তুললেন এবং শাসনকর্তৃত্বেরও ভাগীদার হতে চাইলেন। সেনাবাহিনী তার হাতে বাইআত গ্রহণ করল এবং তিনি পারস্যের দিকে চলে গেলেন।

যখন শুনকার শহরে পৌঁছলেন তখন সেখানকার বহু উলামা-মাশায়েখ তার দরবারে হাজির হতে একটু দেরি করলেন। তারা হাজির হওয়ার পর জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেন দেরি করেছ? তারা কিছু অপারগতা পেশ করলেন। কিন্তু তিনি এসব অপারগতা মানলেন না। তার বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন তলোয়ার চালাতে। সেনারা তাদের শিরশ্ছেদ করলেন। সেখানে অনেক লোক হাজির ছিল। আশপাশের আমিরদের কাছে বিষয়টি ভালো লাগলো না। তারা শামসুদ্দিন সামনানি নামে একজন বড় আমির ও ফকিহকে চিঠি লিখলেন এবং তার সহযোগিতা কামনা করলেন। তিনি নিজে বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং সাধারণ জনতাও শুনকারের উলামা-মাশায়েখের হত্যার বিচারের জন্য সমবেত হলো। তারা রাতের বেলা হাজি গাওনের বাহিনীর ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে পরাজিত করলেন। হাজি গাওন তখন শহরে রাজপ্রাসাদে ছিলেন। তাকে অবরুদ্ধ করা হলো। তিনি গোসলখানায় গিয়ে পালালেন। তাকে সেখান থেকে বের করে শিরশ্ছেদ করা হয় এবং তার কাটা মাথা সুলাইমানের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর শরীরের বাকি অংশ বিভিন্ন স্থানে বণ্টন করে পাঠানো হয়।

খলিফাতুল মুসলিমিনের ছেলে দিল্লিতে

বাদশাহর পক্ষ থেকে আদর-যত্ন ও ভালোবাসাপূর্ণ শ্রদ্ধার ঘটনা

আমির গিয়াসুদ্দিন মুহাম্মাদ আব্বাসী বিন ইউসুফ বিন আবদুল আজিজ বিন খলিফা আল-মুসতানসির বিল্লাহ আব্বাসি বাগদাদি মাওরাউন নাহারের বাদশাহ আলাউদ্দিন তারমিশরিনের কাছে এলেন। সুলতান তাকে কাসাম বিন আব্বাসের খানকার মুতাওয়াল্লি বানিয়ে দেন। সেখানে তিনি কয়েক বছর থাকেন। পরে তিনি জানতে পারলেন হিন্দুস্তানের বাদশাহ বনু আব্বাসের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করেন। এজন্য তিনি নিজের পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ হামদানি সুফি ও মুহাম্মাদ ইবনে শারাফি হারইয়াবিকে দূত বানিয়ে পাঠান। তারা দুজন বাদশাহর দরবারে হাজির হলেন। বাদশাহ দূতদের পাঁচ হাজার দিনার হাদিয়া দেন এবং এবং আমির গিয়াসুদ্দিনের পথ খরচের জন্য ৩০ হাজার দিনার পাঠিয়ে দেন। আর বাদশাহ নিজ হাতে একটি পত্র লিখেন এবং তাকে হিন্দুস্তানে আসার দাওয়াত করেন।

চিঠি পেয়েই গিয়াসুদ্দিন হিন্দুস্তানের দিকে রওনা করেন। যখন তিনি সিন্ধে পৌঁছেন তখন পত্রবাহকেরা বাদশাহর কাছে বার্তা পৌঁছান। বাদশাহ যথারীতি তাকে স্বাগত জানানোর জন্য লোক পাঠালেন। যখন তিনি সারসায় পৌঁছলেন তখন কাজি কামালুদ্দিন সদরে জাহাঁকে নির্দেশ দিলেন কয়েকজন ফকিহকে সঙ্গে নিয়ে যেন তার অভ্যর্থনায় যান। পরে তিনি আমিরদের পাঠালেন অভ্যর্থনার জন্য। যখন তিনি মাসউদ নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন বাদশাহ নিজে আমিরদেরসহ অভ্যর্থনার জন্য হাজির হলেন।

বাদশাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় গিয়াসুদ্দিন বাহন থেকে নিচে নেমে যান। বাদশাহও নিচে নেমে যান। নিয়ম অনুযায়ী গিয়াসুদ্দিন বাদশাহর সম্মানার্থে মাটি স্পর্শ করেন। বাদশাহও মাটি স্পর্শ করেন। আমির গিয়াসুদ্দিন বাদশাহর জন্য কিছু উপঢৌকন নিজের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। এর মধ্যে কাপড়ের থানও ছিল। বাদশাহ এই কাপড়ের থান নিজের কাঁধে বহন করেন। যেভাবে লোকেরা এসে বাদশাহকে সম্মান জানায় তেমনিভাবে বাদশাহ গিয়াসুদ্দিনকে সম্মান জানালেন। বাদশাহ নিজে একটি ঘোড়া ধরে এনে আমির গিয়াসুদ্দিনের সামনে রাখলেন এবং তাকে এতে চড়ার অনুরোধ করলেন। এ সময় তিনি নিজে ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। পরে বাদশাহ ঘোড়ায় আরোহণ করলেন এবং সাথীসঙ্গীরাও আরোহণ করলেন। উভয়ের ওপর শাহি ছাতা টানানো ছিল।

পরে বাদশাহ নিজ হাতে পান তুলে দেন। এটা ছিল বিনয়ের সর্বোচ্চ পর্যায়। কেননা বাদশাহ নিজ হাতে কাউকে পান তুলে দেননি। বাদশাহ এটাও বলেন, আমি খলিফা আবুল আব্বাসের কাছে বাইআত না হলে আপনার কাছে বাইআত হতাম। গিয়াসুদ্দিন জবাবে বললেন, আমি নিজেও আবুল আব্বাসের কাছে বাইআত গ্রহণ করেছি। আমির গিয়াসুদ্দিন বিনয় দেখিয়ে বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস রয়েছে, যিনি অনাবাদি জমি আবাদ করেন সেই জমি তার মালিকানায় হয়ে যায়। বাদশাহর অনুগ্রহ যেন আমাকে পুনর্জীবন দান করেছে। বাদশাহ অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে এই কথার জবাব দেন। বাদশাহ যখন তার জন্য নির্মিত তাঁবুতে পৌঁছলেন তখন সেখানে খলিফার ছেলেকে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। আর নিজের জন্য আলাদা তাঁবু বানিয়ে নিলেন। সেই রাত তারা রাজধানীর বাইরে থাকেন।

দ্বিতীয় দিন শহরে প্রবেশ করেন এবং 'ছিরি'তে যে প্রাসাদ আলাউদ্দিন খিলজি ও সুলতান কুতুবুদ্দিন খিলজি বানিয়েছিলেন তাতে আমির গিয়াসুদ্দিনের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। বাদশাহ নিজে আমিরদের নিয়ে সেই প্রাসাদে যান এবং সব আসবাবপত্র ব্যবস্থা করে দেন। সেই প্রাসাদে সোনা-রুপার পাত্র ছাড়াও স্বর্ণের তৈরি একটি গোসলখানা ছিল। পরে তার খরচপাতির জন্য চার লাখ দিনার পাঠিয়ে দেন। সেবা-শুশ্রূষার জন্য গোলাম-বাঁদি তো ছিলই। এছাড়া প্রতি দিনের খরচের জন্য তিনশ দিনার নির্ধারণ করে দেন। প্রতি বেলায় তার জন্য বিশেষ দস্তরখান থেকে খাবার যেত। পুরো 'ছিরি' শহর ঘরবাড়ি, বাগান, জমি, গুদামসহ তাকে জায়গির দিয়ে দেন। এর বাইরেও একশ গ্রাম দেন। দিল্লির পূর্ব দিকের রাজত্ব দান করেন। ত্রিশটি খচ্চর তার কাছে পাঠিয়ে দেন এবং এগুলোর খাবার যেত সরকারি গুদাম থেকে। তাকে বলে দেওয়া ছিল, তিনি যখন রাজপ্রাসাদে আসবেন তখন যেন ঘোড়া থেকে অবতরণ না করেন। অথচ আর কারো বাহনে চড়ে রাজপ্রাসাদের ভেতরে ঢোকার অনুমতি ছিল না। রাজদরবারের সবার জন্য নির্দেশনা ছিল—বাদশাহকে যেভাবে মাটি স্পর্শ করে সম্মান জানায় তাকেও যেন সেভাবে সম্মান জানায়।

তিনি যখন বাদশাহর দরবারে আসতেন তখন বাদশাহ নিজের আসন থেকে নেমে যেতেন। আর চৌকির ওপর থাকলে দাঁড়িয়ে যেতেন। তারা পরস্পরকে সম্মান দেখাতেন। বাদশাহ তাকে নিয়ে নিজের আসনের পাশে

বসাতেন। তিনি যখন যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতেন তখন বাদশাহও দাঁড়িয়ে যেতেন। পরে বাদশাহ তাকে সালাম করতেন। তিনি বাদশাহর মজলিস থেকে যখন বেরিয়ে যেতেন তখন তার জন্য একটি আসন পাতা হতো। তিনি সেখানে যতক্ষণ খুশি বসে থাকতেন। প্রতি দিন দুইবার এটা হতো।

আমির গিয়াসুদ্দিন দিল্লিতে অবস্থানকালে বাংলার উযির এলেন। বাদশাহ নির্দেশ দিলেন বড় বড় আমিররা যেন তাকে স্বাগত জানান। পরে তিনি নিজে তার অভ্যর্থনার জন্য বের হন এবং তাকে অনেক সম্মান জানান। কোনো বাদশাহ শহরে ঢোকার সময় যে জাঁকজমক হওয়ার কথা সেটাই হয়। ওই অভ্যর্থনায় খলিফার ছেলে আমির গিয়াসুদ্দিনও ছিলেন। এছাড়াও কাজি, ফকিহ ও বহু মাশায়েখ ছিলেন। যখন বাদশাহ ফিরে এলেন তখন উযিরকে বললেন, তুমি মাখদুমজাদার ঘরে যাও। উযির সেখানে গেলেন এবং দুই হাজার আশরাফি (মুদ্রা) ও কাপড়ের থান পেশ করলেন। তার সঙ্গে তখন আমির কাবুলা ও আমি (ইবনে বতুতা) ছিলাম।

একবার বাদশাহর কাছে গজনির শাসক বাহরাম এলেন। তার সঙ্গে খলিফার ছেলের পুরোনো শত্রুতা ছিল। গজনির শাসককে 'ছিরি'র একটি স্থানে থাকার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিলেন বাদশাহ। গজনির শাসকের জন্য সেখানে একটি নতুন ঘর বানানোর নির্দেশও দেন। ইবনে খলিফা যখন এই খবর জানতে পারলেন তখন তিনি রাগ করলেন। তিনি বাদশাহর দরবারে গেলেন। যথারীতি গিয়ে নিজের জন্য নির্ধারিত স্থানে বসলেন। আর উযিরকে ডেকে বললেন, আখুন্দে আলমকে (বাদশাহ) বলো, তিনি আমাকে যা কিছু দিয়েছিলেন সবই আমার থাকার জায়গায় রয়েছে। সেখান থেকে কোনো কিছু খরচ করা হয়নি, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাড়তিও আছে। আমি আর এখানে অবস্থান করতে চাচ্ছি না। এই কথা বলে তিনি রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেন। উযির তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তখন জানা গেল, বাদশাহ গজনির শাসকের জন্য 'ছিরি'তে প্রাসাদ নির্মাণের নির্দেশ দেওয়ায় তিনি রাগ করেছেন।

উযির গিয়ে বাদশাহকে এই খবর দিলেন। বাদশাহ সঙ্গে সঙ্গে আরো দশজনকে নিয়ে বাহনে চড়ে সরাসরি ইবনে খলিফার বাসস্থানে চলে এলেন। প্রাসাদের বাইরে ঘোড়া থেকে নেমে ভেতরে আসার অনুমতি চাইলেন। বাদশাহ ইবনে খলিফার কাছে নিজের অপারগতা পেশ করলেন। ইবনে

খলিফা তা গ্রহণ করলেন। কিন্তু বাদশাহ বললেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত স্বস্তিবোধ করব না যতক্ষণ না আপনি আমার গর্দানে পা রেখেছেন। ইবনে খলিফা বললেন, এটা আমি কখনো করতে পারব না। এমনকি বাদশাহ আমাকে হত্যা করে ফেললেও। বাদশাহ নিজের মাথার কসম দিলেন এবং নিজের গর্দান মাটিতে রাখলেন। মালিক কাবুলা ইবনে খলিফার পা নিজের হাত দিয়ে ধরে বাদশাহর গর্দানের ওপর রাখেন। বাদশাহ এবার দাঁড়ালেন এবং বললেন, এতক্ষণে আমি স্বস্তি পেয়েছি, আপনি এবার আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। এত বিস্ময়কর ও বিরল ঘটনা আজ পর্যন্ত আমি কোনো রাজা-বাদশাহর দরবারে আর দেখিনি।

ঈদের দিন আমিও মাখদুমজাদাকে সালাম করতে গেলাম। মালিক কাবির বাদশাহর পক্ষ থেকে তিনটি পোশাক নিয়ে এলেন। মালিক কাবির দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। যখন ইবনে খলিফা প্রাসাদ থেকে নিচে নামলেন তখন তাকে জামা পরানো হলো। বাদশাহ তাকে অগণিত ধন সম্পদ দেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ব্যক্তি ছিলেন কৃপণ। বাদশাহর মধ্যে যে পরিমাণ দানশীলতা ছিল, তার মধ্যে ততই কৃপণতা ছিল। আমার সঙ্গে ইবনে খলিফার গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। তার কাছে অনেক বেশি আসা-যাওয়া হতো। আমি যখন সফরে বের হই তখন আমার ছেলে আহমাদকে তার কাছে রেখে আসি। জানি না তার কী অবস্থা।

আমি একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি একা একা খান কেন? দস্তরখানের নিজের বন্ধুবান্ধবদের শরিক করেন না কেন? তিনি জবাবে বললেন, এত বেশি লোক আমার সঙ্গে খাবার খাবে এটা আমি চাই না। এজন্য আমি একা একা খাই। শুধু নিজের খাবার থেকে তার বন্ধু মুহাম্মাদ বিন আবিশ শারাফিকে কিছু দিতেন। আর বাকি সব খাবার তিনি নিজে খেতেন। আমি যখন তার প্রাসাদে যেতাম দেখতাম আঙিনা অন্ধকার। সেখানে কোনো বাতির ব্যবস্থা নেই। আমি তাকে অনেক বার বাগানে লাকড়ি সংগ্রহ করতে দেখেছি। তিনি লাকড়ি দ্বারা গুদাম ভরে রাখেন। আমি একবার তাকে জিজ্ঞেস করলাম, মাখদুমজাদা সাহেব! আপনি এটা কেন করেন? তিনি বললেন, অনেক সময় লাকড়ির প্রয়োজন পড়ে।

নিজের ক্রীতদাস, শ্রমিক ও বন্ধুবান্ধবদের দ্বারা বাগানের কাজ করাতেন। আর বলতেন, এই লোকেরা আমার এখানে ফ্রি খাবার খাবে এটা আমি চাই

না। একবার আমার কিছু ঋণ হয়ে যায়। আমি তাকে সেই ঋণ পরিশোধের অনুরোধ করলাম। একদিন আমাকে বললেন, আমার তো অনেক মনে চায় আপনার ঋণ পরিশোধ করে দিই, কিন্তু সাহস করতে পারি না। একবার আমার সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে বলেন, আমরা চারজন বাগদাদ থেকে বাইরে গেলাম। আমরা পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। আমাদের কাছে খাবারের মতো কিছু ছিল না। একটি ঝরনার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, সেখানে একটি দিরহাম পড়ে থাকতে দেখলাম। আমরা ভাবতে থাকলাম, এক দিরহাম দিয়ে কী করব। পরে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, এই এক দিরহাম দিয়ে রুটি কিনব। আমাদের একজন রুটি কিনতে গেলেন। কিন্তু রুটি বিক্রেতা বললেন, আমি রুটি ও ভুসি একসঙ্গে বিক্রি করি। শুধু রুটি বিক্রি করি না। অবশেষে ওই লোক এক কিরাত (মুদ্রা) রুটি এবং এক কিরাত দ্বারা ভুসি কিনেন। আমাদের ভুসির কোনো প্রয়োজন ছিল না। এজন্য ভুসি ফেলে দেন এবং রুটি আমরা ভাগ করে খেয়ে ফেলি। তিনি বলেন, এখন আল্লাহ তাআলা আমাকে সম্পদশালী বানিয়েছেন। আমি তাকে বললাম, আল্লাহর শোকর আদায় করুন এবং ফকির-মিসকিনদের জন্য সদকা করুন। তখন তিনি বললেন, আমার দ্বারা এই কাজ হবে না।

আমি তাকে কখনো দানখয়রাত করতে কিংবা কারো সঙ্গে সদাচরণ করতে দেখিনি। আল্লাহ যেন সবাইকে এমন কৃপণ লোকদের থেকে রক্ষা করেন। হিন্দুস্তান থেকে যাওয়ার পর আমি একবার বাগদাদে গেলাম। মাদরাসায়ে মুস্তানসিরিয়ার দরজায় বসা ছিলাম। যে প্রতিষ্ঠানটি তার দাদা খলিফা মুসতানসির বিল্লাহ বানিয়েছিলেন। এ সময় আমি এক যুবককে দেখলাম, এক লোকের পেছনে দৌড়াচ্ছে, যিনি চলে যাচ্ছেন। এক তালিবুল ইলম আমাকে জানালেন, ওই যুবক হিন্দুস্তানে অবস্থানরত আমির গিয়াসুদ্দিনের ছেলে। আমি ওই যুবককে ডেকে জানালাম, আমি হিন্দুস্তান থেকে এসেছি, তার বাবার খবরবার্তা আমার কাছে রয়েছে। যুবক বলল, আমার কাছে সদ্যই তার খবরবার্তা এসেছে। এই কথা বলে যুবক ওই লোকের পেছনে দৌড়ে চলে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যার পেছনে আব্বাসী বংশের এই লোক দৌড়াচ্ছে তিনি কে? জানানো হলো, ওই লোক জেলখানার পরিদর্শক। আর এই যুবক কোনো একটি মসজিদের ইমাম। সেই মসজিদ থেকে এই যুবক দিনে এক দিরহাম করে পায়। ওই ব্যক্তির কাছে সে তখন নিজের মজুরি চাচ্ছিল। আমি খুবই বিস্মিত হলাম আর ভাবলাম, ইবনুল খলিফা তার

পোশাকের একটি বোতাম এখানে পাঠিয়ে দিলে তার ছেলে সারা জীবনের জন্য ধনী হয়ে যাবে।

এক গরিব দেশের আমির

যার ওপর তুঘলক কৃপার বন্যা বইয়ে দেন

সাইফুদ্দিনের সঙ্গে শাহজাদি ফিরোজার বিয়ের জমকালো অনুষ্ঠান

আরবের (শামের) একজন আমির সাইফুদ্দিন গাদা ইবনে হেবাতুল্লাহ ইবনে মুহান্না[১] বাদশাহর কাছে এলেন। বাদশাহ তাকে ব্যাপক খাতির-যত্ন করেন। সুলতান জালালুদ্দিনের প্রাসাদ যা 'কোশক'[২] নামে পরিচিত, সেখানে থাকার ব্যবস্থা করেন। এই প্রাসাদটি অনেক বড়। এর একটি অনেক বড় বারান্দা রয়েছে। এর আঙিনাটিও অনেক বড়। সেই আঙিনায় একটি টাওয়ার আছে, যা থেকে এর ভেতরের ও বাইরের উভয় বারান্দা দেখা যায়। সুলতান জালালুদ্দিন সেই টাওয়ারে বসে ভেতরের বারান্দায় ঘোড়দৌড় দেখতেন।

যখন আমির সাইফুদ্দিনকে এই প্রাসাদে থাকতে দেওয়া হয় তখন আমি সেই প্রাসাদটি দেখি। আসবাবপত্রে ভরপুর ছিল। কিন্তু সব জিনিসপত্র পুরোনো হয়ে গিয়েছিল। হিন্দুস্তানের নিয়ম হলো, বাদশাহ যখন মারা যান তখন তার প্রাসাদ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। নতুন বাদশাহ থাকার জন্য নতুন করে প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এই প্রাসাদের কোনো জিনিসপত্রও সরান না। এটি ছিল একটি শিক্ষার মতো জায়গা। আমার চোখ দিয়ে পানি চলে আসে। ফকিহ জালালুদ্দিন মাগরেবি গারনাত্বি যিনি শৈশবে তার বাবার সঙ্গে হিন্দুস্তানে চলে আসেন, তখন তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি এই শের (কবিতা) পড়লেন,

وسلاطينم سل الطين عنهم + فالرؤوس العظام صارت عظاما

অর্থাৎ, মাটি হয়ে যাওয়া ওই বাদশাহদের অবস্থা জিজ্ঞেস করো, যাদের বড় মাথা এখন খুলি হয়ে রয়ে গেছে।

---

[১] এই ব্যক্তি আরবের বিখ্যাত একটি পরিবারের সদস্য। যিনি আব্বাসী খেলাফত পুনর্বহাল করতে অনেক চেষ্টা-তদবির করেন।

[২] সুলতান জালালুদ্দিন খিলজি এটি নির্মাণ করেন। স্যার সাইয়েদের 'আসারুয যাবিদ' গ্রন্থে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

এই প্রাসাদে আমির সাইফুদ্দিনের বিয়ের খাবারের আয়োজন হয়েছিল। বাদশাহ আরবের ভক্ত ছিলেন। এজন্য এই আমিরের সঙ্গে সদাচার করেন এবং বারবার তার জন্য বড় বড় হাদিয়া পাঠান। একবার মানকপুরের শাসক মালিক আযম বায়েযিদির পক্ষ থেকে বাদশাহর জন্য হাদিয়া পেশ করা হলো। এর মধ্যে এগারোটি ঘোড়া ছিল। বাদশাহ সেগুলো আমির সাইফুদ্দিনকে দিয়ে দেন। এরপর সোনার জিন লাগানো আরো দশটি ঘোড়া তাকে দিয়ে দেন। এক পর্যায়ে নিজের বোন ফিরোজা আখুন্দাকে তার সঙ্গে বিয়ে দেন।

বাদশাহ যখন তার বোনকে আমির সাইফুদ্দিনের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিলেন তখন ওলিমার প্রস্তুতি এবং যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দিলেন মালিক ফাতহুল্লাহ শাওনাবিসকে। আর আমাকে নির্দেশ দিলেন যেন আমির সাইফুদ্দিনের সঙ্গে থাকি। মালিক ফাতহুল্লাহ বড় বড় দুটি সামিয়ানা আনলেন এবং দুটি বারান্দায় তা টানিয়ে দিলেন। আর একটি বারান্দায় তাঁবু টানালেন। সেখানে নানা ধরনের উন্নত বিছানা বিছালেন। শামসুদ্দিন তাবরিযি গায়ক ও নর্তকিদের নিয়ে এলেন। তারা সবাই বাদশাহর ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী ছিল। নানা ধরনের খাদ্য পাকানোর জন্য আনা হলো বাবুর্চি। পান-তামাকের ব্যবস্থা করা হয়। জবাই করা হয় নানা ধরনের পশুপাখি। টানা পনেরো দিন পর্যন্ত লোকজনকে অনবরত খাওয়ানো হলো। বড় বড় আমির ও বিদেশিরা দুই বেলা খাবারে শরিক হতেন।

বিয়ের দুই রাত আগে বাদশাহর প্রাসাদ থেকে নারীরা এলেন এবং তারা জায়গাটি সাজসজ্জা করলেন। নানা ধরনের বিছানা বিছালেন। এরপর আমির সাইফুদ্দিনকে ডাকা হলো। তিনি ছিলেন বিদেশি। এখানে তার কোনো আত্মীয়স্বজন ছিল না। ওই নারীরা তাকে চার দিক দিয়ে ঘিরে ধরে। তাকে একটি আসনে বসায়। বাদশাহর নির্দেশে তার সৎ মা যিনি মোবারক খানের মা ছিলেন, আমির সাইফুদ্দিনের মা হন। এক বেগম বোন হন, আরেকজন ফুফু, আরেকজন খালা। যাতে তিনি মনে করেন আমার পুরো পরিবার পাশেই আছে। তারা সাইফুদ্দিনকে চৌকিতে বসালেন এবং হাতে মেহেদি লাগিয়ে দিলেন। আর অন্যান্য নারীরা গান-গীত গাইতে থাকলেন। বেগমরা সবকিছু প্রস্তুত করে দিয়ে বর-কনের জন্য তৈরি সোনার ঘরে চলে গেলেন আর তিনি (সাইফুদ্দিন) তার বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বাইরে রইলেন।

বাদশাহ নির্দেশ দিলেন কিছু আমির যেন তার (সাইফুদ্দিন) জামাতে যুক্ত হয় আর কিছু আমির যেন কনের জামাতে যুক্ত হয়। এখানকার নিয়ম হলো, যেখান থেকে কনেকে সঙ্গে নেয় বর, সেই ঘরের দরজায় কনেপক্ষের লোকজন দাঁড়িয়ে যায়। যখন বরপক্ষের লোকজন আসে তখন তাদের পথ আটকানো হয়। বরপক্ষ জোরে পার হয়ে যেতে পারলে পার হয়ে যাবে। কিন্তু যেতে না পারলে হাজার রুপি উপঢৌকন হিসেবে দিতে হবে। মাগরিবের নামাযের পর আমির সাইফুদ্দিনের কাছে নীল রেশমের জামা আনা হলো। এতে এই পরিমাণ অলংকারাদি যুক্ত ছিল যে, কাপড়ের রং দেখা যাচ্ছিল না। মাথার মুকুটও একই ধরনের ছিল। আমি এ ধরনের জামা আর কোথাও দেখিনি। যে পোশাক বাদশাহ তার অন্যান্য জামাতাদের দিয়েছেন, যেমন ইমাদুদ্দিন সামনানি, মালিকুল উলামার ছেলে, শাইখুল ইসলামের ছেলে এবং সদরে জাহাঁ বুখারীর ছেলেকে; কোনোটাই এর মতো নয়।

পরে আমির সাইফুদ্দিন নিজের সাথীসঙ্গী ও ক্রীতদাসদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়লেন, তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে লাঠি ছিল। নানা ধরনের ফুল দিয়ে বানানো একটি মুকুট আনা হলো, যার ঝুলগুলো মুখ ও সিনার ওপর এসে পড়ছিল। এটা আমির সাইফুদ্দিনের মাথায় রাখতে গেলে তিনি তা পরতে অস্বীকৃতি জানালেন। কেননা আরবের লোকেরা এতে অভ্যস্ত ছিল না। আমি এ ব্যাপারে অনুরোধ করলাম। অবশেষে তিনি রাজি হলেন। পরে সবাই যখন হেরেমের দরজায় পৌঁছলাম সেখানে কনেপক্ষের লোকজন পথ আড়ালে দাঁড়ানো ছিল। আমির সাইফুদ্দিন তার সাথীসঙ্গীদের নিয়ে সজোরে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। বাদশাহ যখন এই খবর জানতে পারলেন তখন খুব খুশি হলেন। ভেতরে ঢোকার পর বারান্দায় একটি মঞ্চ সাজানো ছিল। সেখানে কনেকে বসানো হয়েছিল। গায়ক ও নর্তকিরা অপেক্ষায় ছিল। বরকে দেখে সবাই দাঁড়িয়ে গেল এবং আমির সাইফুদ্দিনের ঘোড়া কনের মঞ্চ পর্যন্ত চলে গেল। এখানে এসে আমির ঘোড়া থেকে নামলেন এবং মঞ্চের প্রথম সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে মাটিতে চুমু খেলেন। এ সময় কনে দাঁড়িয়ে গেলেন। এরপর কনে নিজ হাতে আমির সাইফুদ্দিনকে পান দিলেন। এরপর আমির কনে থেকে এক সিঁড়ি নিচে বসে গেলেন। তখন তাদের সাথীসঙ্গীদের ওপর দিরহাম-দিনার ছিটানো শুরু হলো। নারীরা বিভিন্ন স্লোগানও দিচ্ছিল। গানও বাজাচ্ছিল। আর বাইরে বাজছিল নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র।

পরে আমির দাঁড়ালেন এবং কনের হাত ধরে মঞ্চ থেকে নিচে নেমে এলেন। আমির ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। আর কনেকে পালকিতে চড়ালেন। তাদের ওপর দিনার-দিরহামের বর্ষণ হতে থাকলো। ক্রীতদাসরা পালকি তাদের কাঁধে তুলে নিল। বেগমরা ঘোড়ায় চড়লেন এবং অন্য নারীরা পায়ে হেঁটে ছুটলেন। বর ও কনের এই কাফেলা কোনো আমিরের ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তারা বেরিয়ে আসতেন এবং তাদের ওপর দিনার-দিরহামের বর্ষণ করতেন। দ্বিতীয় দিন কনে তার বরের বন্ধুদের ঘরে কাপড় ও দিনার-দিরহাম পাঠালেন। বাদশাহও তাদের প্রত্যেকের জন্য আসবাবপত্রে সজ্জিত একটি করে ঘোড়া পাঠালেন। সঙ্গে একটি থলি পাঠালেন, যেখানে দুশ থেকে শুরু করে হাজার দিনার রাখা ছিল। আর মালিক ফাতহুল্লাহ বেগমদের নানা ধরনের রেশমের কাপড় ও থলি উপহার হিসেবে দেন।

এগুলো হলো হিন্দুস্তানের নিয়ম। আরবের লোকেরা বর ছাড়া আর কাউকে কিছু দেয় না। ওই দিনই লোকদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয় এবং এর মধ্য দিয়ে বিয়ে সম্পন্ন হয়। বাদশাহ নির্দেশ দিলেন আমিরকে যেন মালুহ, গুজরাত, কুম্বাইত ও নহরওয়ালা জায়গির দেওয়া হয়। আর মালিক ফাতহুল্লাহকে যেন তার সহযোগী নিযুক্ত করা হয়। আমিরের সম্মান ও মর্যাদায় যেন কোনো ত্রুটি না করা হয় সে ব্যাপারে নির্দেশ দেন বাদশাহ। কিন্তু তিনি মরু অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তিনি নিজের মূল্য নিজে বুঝতে সক্ষম হননি। মাত্র বিশ দিনের মধ্যে মরুভূমির মূর্খতা তাকে পেয়ে বসে।

বিয়ের বিশ দিন পর তিনি রাজপ্রাসাদে যান এবং ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করেন। প্রধান নিরাপত্তারক্ষী বাধা দেন। এটাকে তিনি পাত্তা দিতে চাইলেন না এবং জোরজবরদস্তি করে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা চালান। দরবারের লোকেরা তার কলার চেপে ধরেন। আমির তখন তার হাতে থাকা লাঠি দিয়ে প্রহরীকে আঘাত করেন। এর দ্বারা প্রহরীর শরীর থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। এই ব্যক্তি বড় আমির ছিলেন। তার বাবা ছিলেন গজনির কাজি। যিনি সুলতান মাহমুদ সবুক্তগিনের বংশধর। বাদশাহ তাকে বাবা বলে সম্বোধন করতেন। আর তার ছেলে অর্থাৎ যাকে মেরেছে তাকে ভাই বলে ডাকতেন। তিনি বাদশাহর কাছে গেলেন। তার কাপড় রক্তে রঞ্জিত ছিল। তিনি বললেন আমির সাইফুদ্দিন আমাকে মেরেছেন। বাদশাহ কিছু সময় ভাবলেন। এরপর

বললেন, কাজির কাছে গিয়ে নালিশ করো। এটি এমন অপরাধ, যার জন্য বাদশাহ কাউকে ক্ষমা করেন না। আর এর সাজা সবসময় মৃত্যুদণ্ডই হয়ে থাকে। তবে বিদেশি হওয়ার কারণে তাকে কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়। বাদশাহ মালিক তাতারকে বললেন, তাদের দুজনকে কাজির কাছে নিয়ে যেতে। কাজি কামালুদ্দিন দেওয়ানখানায় ছিলেন। মালিক তাতার হাজি ছিলেন এবং আরবি ভালো বলতে পারতেন। তিনি আমিরকে বললেন, আপনি এই লোককে মেরেছেন। যদি না মেরে থাকেন তাহলে বলুন, আমি মারিনি। এই বক্তব্যের মধ্যে ইশারা ছিল, তিনি যেন মারার কথা অস্বীকার করেন। কিন্তু আমির ছিলেন একজন মূর্খ মানুষ। তার মধ্যে কিছুটা অহংকারও চলে এসেছিল। তিনি জবাবে বললেন, আমিই মেরেছি। ইতিমধ্যে যাকে মেরেছে তার বাবা চলে এলেন। তিনি চাচ্ছিলেন বিষয়টি যেন আপস-মীমাংসা হয়ে যায়। কিন্তু সাইফুদ্দিন তাতে সম্মত হলেন না। কাজি নির্দেশ দিলেন তাকে যেন রাতভর বন্দি করে রাখা হয়। তার স্ত্রী বাদশাহর ভয়ে তার জন্য বিছানাও পাঠাননি এবং খাবারের খোঁজও নেননি। তার বন্ধুরাও ভয় পেয়ে গেলেন। তারা তাদের সম্পদ লোকদের কাছে আমানত রেখে দিলেন।

আমি ইচ্ছা করলাম কয়েদখানায় গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। একজন আমির আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং আমার উদ্দেশ্যের কথা বুঝতে পেরে বললেন– তুমি ভুলে গেছ তুমি শায়খ শিহাবুদ্দিন বিন শায়খ আহমাদ জামের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা পোষণ করেছিলে। আর বাদশাহ তোমাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (এর আলোচনা আমি সামনে করব)। এই কথা শুনে আমি ফিরে এলাম। পরদিন দুপুরে আমির সাইফুদ্দিন মুক্তি পেয়ে গেলেন। বাদশাহ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তাকে জায়গির দেওয়ার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা রহিত করে দিলেন। আর তাকে দেশান্তর করার ইচ্ছা করলেন।

বাদশাহর এক ভগ্নিপতি ছিলেন, যার নাম ছিল মুগিসুদ্দিন মালিকুল মুলুক। বাদশাহর বোন তার ব্যাপারে অভিযোগ করতে করতে মারা গেছেন। এ সময় ক্রীতদাসিরা সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ সময় বাদশাহ নিজ হাতে নির্দেশনামা লিখলেন– 'হারামি' ও 'মুশখার' উভয়কে দেশান্তর করো। 'মুশখার' দ্বারা উদ্দেশ্য আমির সাইফুদ্দিন। আর 'হারামি' দ্বারা আমির মুগিসুদ্দিন। কেননা আরবের বেদুইনরা হিংস্র প্রাণী খায়, এজন্য তাদের

আচরণ জংলি ধরনের। চোবদার (শাস্তি প্রয়োগকারী) এলেন তাকে দেশান্তর করে দিতে। তিনি ঘরে গিয়ে স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় আনতে চাইলেন। কিন্তু চোবদার তার পিছু পিছু এলেন, তিনি কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন। আমি এ সময় রাজপ্রাসাদে যাই এবং রাতে সেখানেই থাকি। একজন আমির জিজ্ঞেস করলেন– তুমি রাতে এখানে থাকছ কেন? বললাম, আমি আমির সাইফুদ্দিনের ব্যাপারে বাদশাহকে কিছু কথা বলতে চাই। আমি বলতে চাই, তাকে যেন ফিরিয়ে আনা হয় এবং দেশান্তর যেন না করা হয়। তিনি বললেন, এটা কখনো সম্ভব নয়। আমি বললাম, আমাকে যদি এখানে শত রাত কাটাতে হয় তবুও রাজি আছি। যতক্ষণ আমার উদ্দেশ্য পূরণ না হবে ততক্ষণ আমি এখানেই থাকব। বাদশাহর কাছেও এই খবর পৌঁছে যায়। এক পর্যায়ে বাদশাহ নির্দেশ দিলেন আমির সাইফুদ্দিনকে যেন ফিরিয়ে আনা হয়। পরে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন মালিক কাবুলা লাহোরির কাছে অবস্থান করেন। সুতরাং চার বছর পর্যন্ত তিনি সেখানে থাকেন। বাড়িতে অবস্থান কিংবা সফর সবকিছুর আদব শিখে যান। এতে বাদশাহ তার মর্যাদা ও অবস্থান ফিরিয়ে দেন। তাকে আবার জায়গির দান করেন এবং সেনাবাহিনীর সর্দার বানিয়ে দেন।

খাজা জাহাঁর মেয়েদের বিয়ে

বাদশাহ নিজে প্রতিনিধি হয়ে সব কাজ আঞ্জাম দেন

তিরমিযের কাজি খোদাওয়ান্দজাদা কাওয়ামুদ্দিন যার সঙ্গে আমি মুলতান থেকে দিল্লি এসেছিলাম, দিল্লিতে পৌঁছার পর বাদশাহ তাকে অনেক খাতির-যত্ন করেন। তার সঙ্গে অনেক উন্নত আচরণ করেন। তার দুই ছেলের সঙ্গে উযির খাজা জাহাঁর মেয়েদের বিয়ে দেন।

উযির ওই সময় রাজধানীতে ছিলেন না। বাদশাহ মেয়েদের বাবার স্থলাভিষিক্ত হয়ে উযিরের প্রাসাদে এসে তার মেয়েদের বিয়ে দেন। যতক্ষণ প্রধান বিচারপতি বিয়ে পড়ান বাদশাহ দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমির ও উপস্থিত সবাই বসা ছিলেন। বাদশাহ নিজ হাতে থলি ও কাপড় তুলে কাজি ও খোদাওয়ান্দজাদার মেয়েদের দেন। এই দৃশ্য দেখে অন্যান্য আমিররাও দাঁড়িয়ে গেলেন। তারা আরজ করলেন, হুযুর! আপনি এই কাজ করবেন না। বাদশাহ নির্দেশ দিলেন, তোমরা বসে যাও। পরে নিজের জায়গায় একজন আমিরকে দাঁড় করিয়ে নিজে চলে গেলেন।

দীনদার বাদশাহ

বাদশাহর বিরুদ্ধে এক হিন্দুর দাবি, মজলুমের সাহায্য, দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সহায়তা

এক হিন্দু আমির বাদশাহর বিরুদ্ধে দাবি করলেন, বাদশাহ কোনো কারণ ছাড়াই তার ভাইকে হত্যা করেছেন। বাদশাহ একদম অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া, পায়ে হেঁটে কাজির আদালতে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে গিয়ে সালাম করলেন এবং সম্মান প্রদর্শন করলেন। কাজিকে আগেই নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমি যখন আসব কাজি যেন আমার সম্মানে দাঁড়িয়ে না যান। কোনো ধরনের নড়াচড়াও যেন না করেন। বাদশাহ কাজির সামনে দাঁড়ালেন। কাজি নির্দেশ দিলেন বাদশাহ যেন মামলার বাদীকে কোনোভাবে সম্মত করান। না হলে দণ্ড কার্যকর হবে। বাদশাহ তাকে সম্মত করালেন।[১]

একবার এক মুসলিম তার বিরুদ্ধে সম্পদ হরণের অভিযোগ তুললেন। এই বিবাদ কাজির সামনে পর্যন্ত গড়াল। কাজি নির্দেশ দিলেন, বাদশাহ যেন ওই ব্যক্তির সম্পদ দিয়ে দেন। এই নির্দেশ পেয়ে বাদশাহ সম্পদ দিয়ে দেন।

একবার এক আমিরের ছেলে দাবি করলেন, বাদশাহ কোনো কারণ ছাড়া আমাকে মেরেছেন। কাজি নির্দেশ দিলেন– হয়ত ওই ছেলেকে সন্তুষ্ট করান, না হলে দণ্ড কার্যকরের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। আমি দেখলাম, তিনি দরবারে এসে ওই ছেলেকে ডাকালেন। তার হাতে লাঠি তুলে দিয়ে বললেন, তুমি আমার কাছ থেকে বদলা নাও। এরপর শপথ করিয়ে তাকে বললেন, আমি তোমাকে যেভাবে মেরেছি তুমিও সেভাবেই আমাকে মারো। ওই ছেলে হাতে লাঠি নিয়ে বাদশাহকে একুশটি আঘাত করল। এমনকি এক পর্যায়ে তার মুকুট মাথা থেকে পড়ে গেল।

জামাতে নামায না পড়লে বাদশাহর ধার্যকৃত শাস্তি

বাদশাহ নামাযের ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব দিতেন। তার নির্দেশ ছিল– যে ব্যক্তি জামাতে নামায আদায় করবে না তাকে শাস্তি দিতে হবে।

একদিন তিনি নয়জন মানুষকে এই অপরাধে হত্যা করেন। এর মধ্যে একজন সঙ্গীতশিল্পীও ছিলেন। এই কাজে অনেক লোককে নিয়োজিত

---

[১] প্রাণের ক্ষতিপূরণ দিয়ে।

করেছিলেন। জামাত চলাকালে কাউকে বাজারে পেলে তাকে ধরে আনা হতো। এমনকি ঘোড়াচালক যারা রাজদরবারের সামনে ঘোড়া এনে দাঁড় করিয়ে রাখত তাদেরও ধরা শুরু হয়। নির্দেশ ছিল প্রত্যেক ব্যক্তি নামাযের নিয়মকানুন এবং ইসলামের শর্তাবলি শিখবে। লোকদের প্রশ্ন করা হতো, কেউ ভালোমতো উত্তর দিতে না পারলে তাকে শাস্তি দেওয়া হতো। সবাই নামাযের মাসআলা ভালোমতো রপ্ত করে বাজারে আসত। অনেকে প্রয়োজনীয় দোয়া-কালাম কাগজে লিখে আনত।

শরয়ি বিধান পরিপালনের ব্যাপারেও তিনি খুব কঠোর ছিলেন। তার ভাই মুবারক খানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারালয়ে কাজির পাশে বসে যেন সুবিচার নিশ্চিত করেন। তার প্রতি নির্দেশ ছিল, তিনি যেন একটি উঁচু টাওয়ারে বসেন এবং কাজির জন্য সেই টাওয়ারে বাদশাহর মতো একটি আসন পাতা হয়। মুবারক খান কাজির ডান পাশে বসতেন। কেউ কোনো বড় আমিরের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নিয়ে এলে মুবারক খানের বাহিনী ওই আমিরকে কাজির দরবারে হাজির করতেন। কাজি সবকিছু তদন্ত করে বিচার করতেন।

৭৪১ হিজরিতে বাদশাহ নির্দেশ দিলেন যাকাত ও উশর ছাড়া সব ধরনের ট্যাক্স যেন ক্ষমা করে দেওয়া হয়। তিনি নিজে সোম ও বৃহস্পতিবার বিচারালয়ের সামনে বসতেন এবং জনসাধারণের অভিযোগের কথা শুনতেন।

ওই দিন তার পাশে দরবারিদের মধ্যে আমির হাজিব, খাস হাজিব, সাইয়েদুল হিজাব ও শারফুল হিজাব এই চারজন উপস্থিত থাকতেন। সবার জন্য অনুমতি ছিল, যে কেউ চাইলে অভিযোগ করতে পারত। চারটি দরজায় চারজন আমির নিযুক্ত করতেন। তারা অভিযোগকারীদের অভিযোগ লিখে রাখতেন। তাদের মধ্যে চতুর্থজন মালিক ফিরোজ বাদশাহর চাচাতো ভাই ছিলেন। প্রথম দরজার আমির অভিযোগ লিখে পাঠালে ভালো, না হলে দ্বিতীয় দরজার আমিরের কাছে আসত। তিনিও না লিখলে তৃতীয় ও চতুর্থ দরজার আমিরের কাছে এসে লেখাতেন। তারাও না লিখলে সদরে জাহাঁ কাজিয়ুল কুজাতের কাছে আসতেন। তিনিও না লিখলে সরাসরি বাদশাহর কাছে চলে আসার অনুমতি ছিল। বাদশাহ যদি জানতেন, এই ব্যক্তি তাদের কারো কাছে গেছে কিন্তু তিনি অভিযোগ লেখেননি তাহলে কড়া ধমক

দিতেন। লিখিত সব অভিযোগ ইশার পর বাদশাহ নিজে পড়তেন।

যখন হিন্দুস্তান ও সিন্ধে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, এমনকি গমের মণ ছয় দিনার হয়ে গেল, তখন বাদশাহ নির্দেশ দিলেন দিল্লির সব নাগরিককে প্রতিদিন আড়াই রতল করে ছয় মাসের খাদ্যশস্য যেন সরকারি গুদাম থেকে দিয়ে দেওয়া হয়। ফকিহ ও কাজি নাগরিকদের তালিকা করতে লাগলেন। সেই তালিকা অনুযায়ী এক একজন আসতেন আর ছয় মাসের খাদ্যশস্য নিয়ে যেতেন।[১]

[১] তখন তরিতরকারি আমেরিকা থেকেও আসত না, অস্ট্রেলিয়া থেকেও নয়।

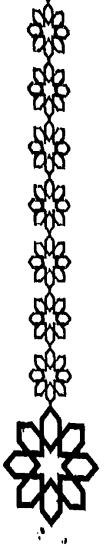

দৃশ্যপটের দ্বিতীয় দিক

- নির্মম প্রতিশোধ
- নির্বিচারে হত্যা
- জল্লাদের তলোয়ার
- ফাঁসির কুঠুরি
- জেলখানার দাস্তান
- জায়গির ও রাজত্ব দখল

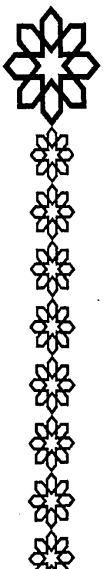

রক্তপিপাসু নিষ্ঠুর বাদশাহ

এতক্ষণ পর্যন্ত বাদশাহর গুণাগুণ, ন্যায়বিচার এবং তার সদাচারের ঘটনাগুলো উল্লেখ করা হলো। অস্বাভাবিক ও স্বভাববিরুদ্ধ ঘটনাগুলো আমি এখানে উল্লেখ করলাম। কিন্তু ঘটনা হলো, তিনি অত্যন্ত রক্তপিপাসু শাসক ছিলেন। তার দরজায় কাউকে হত্যা করা হয়নি এমন দিন খুব কমই যেত। বেশির ভাগ লাশ দরজায় পড়ে থাকত।

একদিনের ঘটনা। আমি আমার ঘরের দিকে যাচ্ছিলাম। আমার ঘোড়া একটি সাদা কিছু দেখে থমকে দাঁড়াল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কী? আমার সঙ্গী বললেন, এটি এক ব্যক্তির সিনা, যাকে তিন টুকরো করা হয়েছে।

এই বাদশাহ ছোটখাটো অন্যায়ের জন্য বড় সাজা দিতেন। জ্ঞানী লোকদের যেমন কোনো ছাড় দিতেন না তেমনি ভদ্র-সজ্জন মানুষদের কথাও বিবেচনা করতেন না। বিচারালয়ে প্রতিদিন হাজারও মানুষকে হাতকড়া পরিয়ে হাজির করা হতো। তাদের অনেককে হত্যা করা হতো। কাউকে অন্য সাজা দেওয়া হতো। তার নিয়ম ছিল, জুমার দিন ছাড়া প্রতিদিন কারাগারের সব বন্দিকে বিচারালায়ে হাজির করা হতো। জুমার দিন কয়েদিরা গোসল ও হিজামা করত। সেদিন তারা একটু আরাম করত। আল্লাহ এমন শাসকের হাত থেকে আমাদের মুক্তি দিন!

সৎ মা ও ভাইকে হত্যা

একসঙ্গে তিনশ সেনাকে হত্যা

বাদশাহর এক ভাই ছিলেন মাসউদ খান। তার মা ছিলেন সুলতান আলাউদ্দিনের মেয়ে। এই ব্যক্তি এমন সুদর্শন ছিলেন যে, আমি তার মতো সুন্দর পুরুষ আর দেখিনি। তিনি বিদ্রোহ করতে চাচ্ছেন, তার ওপর এমন অপবাদ আরোপ করা হলো। যখন তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো তখন শাস্তির ভয়ে তিনি স্বীকার করে ফেললেন। কেননা তার জানা ছিল, এমন অভিযোগ অস্বীকারকারীদের নানা ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়। এর চেয়ে একবারে মরে যাওয়া শ্রেয়।

বাদশাহ নির্দেশ দিলেন, তাকে বাজারে নিয়ে গর্দান উড়িয়ে দাও। হত্যার পর তিন দিন পর্যন্ত কাফন-দাফন ছাড়া তার লাশ সেখানে পড়ে রইল। তার মাকে দুই বছর আগে সেখানে পাথর ছুড়ে হত্যা করা হয়। কেননা, তিনি যিনার কথা স্বীকার করেছিলেন। কাজি কামালুদ্দিন তাকে পাথর মেরে হত্যা করেন।[১]

একবার বাদশাহ মালিক ইউসুফ বাগড়ার নেতৃত্বে পার্বত্য অঞ্চলের হিন্দুদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য একটি বাহিনী পাঠালেন। ইউসুফ তার বাহিনী নিয়ে শহর থেকে বের হলেন। তখন ৩৫০ জন সেনা আত্মগোপন করল এবং তারা বাড়িতে ফিরে এলো। ইউসুফ এটা জানিয়ে বাদশাহকে পত্র লিখলেন। বাদশাহ নির্দেশ দিলেন, অলিগলিতে খোঁজ করে পালিয়ে আসা সেনাদের ধরে আনো। এভাবে ৩৫০ সেনাকেই ধরে আনা হয়। পরে তাদের সবাইকে একসঙ্গে হত্যা করা হয়।

ফকির ও বাদশাহর লড়াই

হযরত শায়খ শিহাবুদ্দিনকে অবজ্ঞা ও নির্মমভাবে হত্যা

শায়খ শিহাবুদ্দিন[২] বিন শায়খ আহমাদ জাম খুরাসানের শুমার শহরের বিশিষ্ট মাশায়েখদের অন্যতম ছিলেন। তিনি ১৪ দিন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখতেন। সুলতান কুতুবুদ্দিন ও সুলতান গিয়াসুদ্দিন তার যিয়ারতের জন্য যেতেন। তার কাছ থেকে দোয়া আনতেন।

সুলতান মুহাম্মাদ শাহ যখন বাদশাহ হলেন তখন তিনি মাশায়েখ ও আলেমদের কাছ থেকে তাদের স্তর অনুযায়ী খেদমত নিতে চাইলেন। তিনি এটাকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করলেন যে, খুলাফায়ে রাশেদিন আলেম ও শুদ্ধাচার ব্যক্তিদের ছাড়া কাউকে কোনো দায়িত্ব দিতেন না। কিন্তু শায়খ শিহাবুদ্দিন কোনো দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। যখন বাদশাহ প্রকাশ্য দরবারে তাকে এই অফার দিলেন তখনো তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

---

[১] সন্ত্রাসের কারণে, তবে এই ঘটনার সত্যতা নিয়ে সন্দেহ আছে।

[২] শায়খ শিহাবুদ্দিন শায়খ আহমাদ জাম ছিলেন শরিয়ত ও তরিকতের একজন বুযুর্গ। দিল্লিতে তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অনন্য। দিল্লির সুলতানদের মধ্য থেকে যেসব বাদশাহর (যেমন গিয়াসুদ্দিন তুঘলক প্রমুখ) নিযামুদ্দিন আউলিয়ার সঙ্গে বিরোধ ছিল, তারা তাকে নিজেদের মুরশিদ বানাতেন। কেননা দুই অলির মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য ছিল।

বাদশাহ এতে প্রচণ্ড রাগ করলেন। তিনি শায়খ জিয়াউদ্দিন সামনানিকে নির্দেশ দিলেন, শায়খ শিহাবুদ্দিনের দাড়ি যেন উপড়ে ফেলেন। জিয়াউদ্দিন অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন, আমার দ্বারা এই কাজ সম্ভব নয়। তখন বাদশাহ নির্দেশ দিলেন তাদের দুজনের দাড়ি যেন উপড়ে ফেলা হয়। সুতরাং তাই করা হলো। জিয়াউদ্দিনকে তেলেঙ্গানার দিকে পাঠিয়ে দিলেন এবং কিছুদিন পর ওয়ারেঙ্গলের কাজি নিযুক্ত করলেন। আর শিহাবুদ্দিনকে পাঠিয়ে দিলেন দৌলতাবাদের দিকে। সেখানে সাত বছর কাটানোর পর তাকে আবার ডেকে পাঠানো হলো। তাকে অনেক সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে স্বাগত জানানো হয় এবং মহকুমার আমেলদের (কর্মকর্তাদের) কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। আমিরদের নির্দেশ দিলেন তাকে যেন গিয়ে সালাম করে এবং তিনি যে নির্দেশ দেন তা যেন পালন করে। এমনকি রাজদরবারে তাকে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়।

বাদশাহ যখন গঙ্গা নদের তীরে গিয়ে সেখানে নিজের জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন আর এর নাম রাখেন 'সরং দুয়ারা', তখন লোকদের নির্দেশ দিলেন তারাও যেন সেখানে নিজ নিজ বাড়ি বানিয়ে নেয়। শায়খ শিহাবুদ্দিন তখন দিল্লিতে থাকার ব্যাপারে বাদশাহর কাছে অনুমতি চাইলেন। বাদশাহ তাকে সেই অনুমতি দিয়ে দিলেন। শহর থেকে ছয় মাইল দূরত্বে বড় একটি এলাকা তাকে দান করেন। শায়খ শিহাবুদ্দিন বড় একটি গুহা খনন করেন এবং সেখানে ঘর, গুদাম, গোসলখানা, রান্নাঘর সব নির্মাণ করেন। যমুনা নদ থেকে একটি খাল কেটে পানির ব্যবস্থা করে পুরো এলাকা আবাদযোগ্য করে তোলেন। যেহেতু তখন দুর্ভিক্ষের কাল ছিল, এজন্য ফসল অনেক উপকারে আসে। আড়াই বছর বাদশাহ দিল্লির বাইরে ছিলেন। শায়খ শিহাবুদ্দিন তখন নিজের সেই গুহায় অবস্থান করেন। তার খাদেমরা দিনের বেলা জমিতে কাজ করত আর রাতের বেলা তাদের গবাদি পশু নিয়ে গুহায় ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিত। কেননা আশপাশের পাহাড়ে চোরের উপদ্রব ছিল।

বাদশাহ যখন রাজধানীতে ফিরে এলেন তখন শায়খ শিহাবুদ্দিন সাত মাইল এগিয়ে গিয়ে বাদশাহকে স্বাগত জানালেন। বাদশাহও তার অনেক সম্মান করলেন। তার সঙ্গে কোলাকুলি করলেন। এরপর শায়খ শিহাবুদ্দিন নিজের গুহার দিকে চলে গেলেন। কিছুদিন পর বাদশাহ আবার শায়খ শিহাবুদ্দিনকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু শায়খ শিহাবুদ্দিন হাজির হতে অস্বীকৃতি জানালেন।

বাদশাহ বিশিষ্ট আমির মুখলিসুল মালিক নদরবারিকে তার কাছে পাঠালেন। তিনি অত্যন্ত মোলায়েমভাবে কথাবার্তা বলে বাদশাহর রাগ সম্পর্কে তাকে বোঝালেন। শায়খ বললেন, আমি এই জালেম বাদশাহর কোনো খেদমত আর করব না।

মুখলিসুল মালিক বাদশাহর কাছে ফিরে এলেন। শায়খ যা কিছু বলেছেন তা এসে বললেন। বাদশাহ নির্দেশ দিলেন শায়খকে ধরে আনতে। সুতরাং তাকে ধরে আনা হলো।

বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন– তুমি আমাকে জালেম বলেছ?

শায়খ বললেন : হ্যাঁ, আপনি জালেম, অমুক অমুক জুলুম করেছেন।

শায়খ তখন দিল্লি থেকে তাকে বের করে দেওয়া এবং এখানকার অধিবাসীদের দৌলতাবাদে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ করলেন।

বাদশাহ তলোয়ার বের করলেন এবং সদরে জাহাঁর হাতে দিলেন। আর বললেন, আমাকে জালেম প্রমাণ করো এবং এই তলোয়ার দিয়ে আমার গর্দান উড়িয়ে দাও।

শায়খ শিহাবুদ্দিন বললেন, যে ব্যক্তি আপনাকে জালেম হিসেবে সাক্ষ্য দেবে আপনি তাকেই হত্যা করবেন। কিন্তু আপনি ভালো করেই জানেন আপনি একজন জালেম।

বাদশাহ শায়খকে নিরাপত্তারক্ষীদের কাছে সোপর্দ করেন। তারা তার দুই পায়ে বেড়ি পরায় এবং হাতে পরায় হাতকড়া। ১৪ দিন পর্যন্ত শায়খকে কোনো খাবারদাবার দেওয়া হয়নি। প্রতিদিন তাকে বিচারালয়ে হাজির করা হতো। ফকিহ ও মাশায়েখের সামনে নিয়ে তাকে বলা হতো, আপনি আপনার কথা প্রত্যাহার করে নিন।

শায়খ বলতেন, আমি আমার কথা প্রত্যাহার করব না। আমি শহীদদের কাতারে শামিল হতে চাই।

চৌদ্দতম দিন বাদশাহ মুখলিসুল মালিকের হাতে শায়খের জন্য খাবার পাঠালেন। কিন্তু শায়খ সেই খাবার খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। আর বললেন, দুনিয়া থেকে আমার রিযিক উঠে গেছে। বাদশাহর খাবার ফিরিয়ে নাও।

বাদশাহ যখন এটা জানতে পেলেন তখন নির্দেশ দিলেন তাকে দেড় সের গোবর খাওয়াও। এই কাজে হিন্দুদের নিযুক্ত করা হয়। তারা শায়খকে মাটিতে ফেলে পানি মিশিয়ে গোবর মুখে ঢেলে দেয়। দ্বিতীয় দিন শায়খকে কাজি সদরে জাহাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৌলভি, মাশায়েখ ও বিদেশিরা তাকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেন। নিজের কথা ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি অনড়, কোনোভাবেই নিজের কথা ফিরিয়ে নিতে সম্মত হলেন না। অবশেষে তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহ তার ওপর রহম করুন।

দুই সিন্ধি আলেমকে হত্যা

মিথ্যা অভিযোগ স্বীকার করলেও হত্যা অস্বীকার করলেও হত্যা

একজন আলেমে দীনকে হত্যা

সিন্ধের দুজন ফকিহ বাদশাহর চাকুরে ছিলেন। বাদশাহ একবার কোনো আমিরকে একটি দেশের গভর্নর নিযুক্ত করেন। আর তাদের দুজনকে নির্দেশ দিলেন ওই আমিরের সঙ্গে যেতে। আর বললেন, আমি ওই দেশের রাজত্ব তোমাদের কাছে সোপর্দ করলাম, এই আমির সবসময় তোমাদের কথা অনুযায়ী চলবে।

দুই ফকিহ বললেন, আমরা সাক্ষী হিসেবে থাকব। যা কিছু সত্য সেটা বলব। বাদশাহ বললেন, তোমাদের নিয়ত সঠিক বলে মনে হচ্ছে না। তোমাদের উদ্দেশ্য হলো অর্থ খাবে আর ওই অজ্ঞ তুর্কির ওপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করবে।

ফকিহরা বললেন, হে আখুন্দে আলম! কখনো আমাদের উদ্দেশ্য এটা নয়।

বাদশাহ বললেন, না, এটাই তোমাদের উদ্দেশ্য।

তাদের দুজনকে শায়খজাদা নেহাওয়ান্দির কাছে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। এই ব্যক্তি লোকদের শাস্তি দেওয়ার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এই দুজনকে তার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি তাদের বোঝালেন। বললেন, বাদশাহ তোমাদের হত্যা করতে চাচ্ছেন। এজন্য যা কিছু বলেন তা তোমরা স্বীকার করে নাও। এর বিনিময়ে হলেও নিজেকে শাস্তি থেকে রক্ষা করো।

উভয়েই বললেন, আমাদের নিয়ত সেটাই যা আমরা বাদশাহর কাছে বলেছি।

শায়খজাদা নেহাওয়ান্দি তার সহযোগীদের বললেন, এই দুজনকে শাস্তি দিতে। সুতরাং তাদেরকে চিত করে শুইয়ে দেওয়া হয়। তাদের সিনার ওপর গরম একটি লোহা রাখা হয়। যখন সেই লোহাটি তোলা হয় তখন সোনার সব গোশত সেই লোহার সঙ্গে উঠে আসে। পরে ক্ষতস্থানে পেশাব ও ছাই লাগানো হয়। তখন তারা স্বীকার করেন, আমাদের নিয়ত সেটাই ছিল যা বাদশাহ বলেছেন। আমরা অপরাধী এবং হত্যাযোগ্য। আমাদেরকে হত্যা করলে দিন-দুনিয়ায় আমাদের আর কোনো দাবি থাকবে না।

সুতরাং এ ব্যাপারে তাদের দ্বারা একটি চিঠি লেখানো হয় এবং কাজির কাছে এর সত্যায়নের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। কাজি এতে সিলমোহর লাগিয়ে দেন। আর লিখে দিলেন, এই ব্যক্তিরা কোনো জোরজবরদস্তি ছাড়া তাদের অপরাধের কথা স্বীকার করেছেন। তারা যদি বলতেন, আমাদের কাছ থেকে এই স্বীকারোক্তি জোরজবরদস্তি করে নেওয়া হয়েছে তখন তাদের ওপর নানা ধরনের শাস্তি আরোপ করা হতো। এজন্য তারা মনে করলেন, একবার গর্দান উড়িয়ে দিলে সেই শাস্তি থেকে অন্তত রক্ষা পাওয়া যাবে। সুতরাং তাদের দুজনকে হত্যা করা হয়। আল্লাহ তাদের ওপর রহম করুন।[১]

দুর্ভিক্ষের সময় বাদশাহ নির্দেশ দিলেন, রাজধানীর বাইরে যেন কুয়া খনন করা হয় এবং এর দ্বারা যেন ক্ষেতে পানি সরবরাহ করা হয়। ফসলের জন্য জরুরি আসবাবপত্রও সরবরাহ করা হয়। কিন্তু ফসল উৎপন্ন হওয়ার পর সেই ফসল জোরজবরদস্তি করে রাষ্ট্রীয় গুদামে নিয়ে যাওয়া হয়।

ফকিহ আফিফুদ্দিন কাশানি যখন এই বিষয়টি জানতে পারলেন তখন তিনি বলেন, এ ধরনের ফসল উৎপন্ন করার দ্বারা কোনো লাভ হবে না।

কেউ গিয়ে বাদশাহর কাছে তার এই কথা জানিয়ে দেন। বাদশাহ তাকে বন্দি করার নির্দেশ দিলেন। আর বললেন, তুমি রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে কেন নাক গলাতে এসেছ!

কিছুদিন পর তাকে মুক্ত করে দেওয়া হলো। ফকিহ নিজের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় দুজন ফকিহের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলো, যারা ছিলেন তার বন্ধু। তারা বললেন, আল্লাহ শোকর তিনি তোমাকে মুক্ত করেছেন।

---

[১] অপরাধ স্বীকার করিয়ে হত্যার পদ্ধতি নতুন কিছু নয়। এটা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে।

আফিফুদ্দিন বললেন, আল্লাহর শোকর, তিনি আমাকে জালেমদের হাত থেকে মুক্ত করেছেন। আফিফুদ্দিন তার বাড়িতে চলে গেলেন আর অপর দুই ফকিহ নিজ নিজ বাড়িতে গেলেন।

এদিকে বাদশাহর কাছে যখন এই খবর পৌঁছে[১] তখন বাদশাহ তিনজনকে হাজির করার নির্দেশ দিলেন। বাদশাহ নির্দেশ দিলেন আফিফুদ্দিনকে যেন দুই টুকরো করে দেওয়া হয়। আর বাকি দুজনের গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারা বললেন, আফিফুদ্দিনের তো অপরাধ হলো তিনি আপনাকে জালেম বলেছেন। কিন্তু আমাদেরকে কোন অপরাধে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে? বাদশাহ বললেন, তোমাদের অপরাধ হলো, তার কথা শুনেও তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করোনি। এর অর্থ হচ্ছে তোমরাও তার কথার সঙ্গে একমত। সুতরাং তিনজনকেই হত্যা করা হয়। (আল্লাহ তাদের ওপর রহম করুন।)

শায়খজাদা হুদকে হত্যা

নিজেই গদিনশীন বানান, নিজেই হত্যা করেন

শায়খজাদা হুদ শায়খ রোকনুদ্দিন মুলতানির পৌত্র ছিলেন। বাদশাহ তার দাদা শায়খ রোকনুদ্দিন কুরাইশিকে অনেক সম্মান করতেন। এমনিভাবে তার ভাই ইমাদুদ্দিনেরও। এই ইমাদুদ্দিন গঠনপ্রকৃতিতে বাদশাহর অবিকল ছিলেন। সুতরাং কিসলু খানের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় লোকেরা তাকে বাদশাহ মনে করে হত্যা করে। ইমাদুদ্দিন মারা গেলে বাদশাহ তার ভাই শায়খ রোকনুদ্দিনকে খানকার ব্যয় নির্বাহের জন্য জায়গির হিসেবে একশ গ্রাম দিয়ে দেন।

শায়খ রোকনুদ্দিনের ইন্তেকালের পর শায়খ হুদ তার দাদার অসিয়ত অনুযায়ী খানকার মুতাওয়াল্লি নিযুক্ত হন। কিন্তু শায়খ রোকনুদ্দিনের এক ভাতিজা বিরোধিতা করেন। আর বলেন, আমি আমার চাচার উত্তরাধিকারী হওয়ার বেশি যোগ্য। পরে তারা উভয়ে দৌলতাবাদে বাদশাহর কাছে আসেন। দৌলতাবাদ মুলতান থেকে আশি মনযিল দূরত্বে। বাদশাহ শায়খের অসিয়ত অনুযায়ী গদিনশীন করে দেন। হুদ বয়সে বড় ছিলেন, আর শায়খ রোকনুদ্দিনের ভাতিজা ছিলেন অল্প বয়সী। বাদশাহ নির্দেশ দিলেন হুদের যেন অনেক সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হয়। যে মনযিলে থামেন সেখানে যেন

---

[১] এর দ্বারা তুঘলকের গোয়েন্দা বিভাগের বিস্তৃতির কথা অনুমান করা যায়।

বাদশাহর পক্ষ থেকে আদর-আপ্যায়ন করা হয়। তাকে অভ্যর্থনা জানাতে শহরের শায়েখ ও হাকিমদের নির্দেশ দিলেন। তিনি যখন রাজধানীতে পৌঁছলেন শহরে সব মৌলভি, শায়েখ, কাজি, হাকিম ছুটে এলেন তার অভ্যর্থনায়। তিনি পালকিতে আরোহণ করেছিলেন। আমি তাকে সালাম করি। কিন্তু তার পালকিতে চড়া আমার পছন্দ হলো না। আমি একজনের সঙ্গে আলোচনা করলাম, তার উচিত পালকি থেকে নেমে ঘোড়ায় আরোহণ করা। কেউ গিয়ে তাকে সেই কথাটি বলে দেন। তিনি ঘোড়ায় চড়লেন। তবে অপারগতা প্রকাশ করলেন যে, ব্যথার কারণে তিনি ঘোড়ায় সওয়ার হতে পারেন না।

যখন রাজধানীতে পৌঁছলেন তখন বাদশাহর পক্ষ থেকে দাওয়াত করা হলো। সেখানে কাজি, মৌলভি ও বিদেশিদেরও ডাকা হলো। খাবারদাবার সম্পন্ন হওয়ার পর প্রত্যেককে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী উপহারও দেওয়া হয়। প্রধান বিচারপতিকে দেওয়া হয় পাঁচশ দিনার। আমাকে (ইবনে বতুতা) দেওয়া হয় আড়াইশ দিনার। এটা এই দেশের নিয়ম, প্রত্যেক শাহি দাওয়াতে খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি উপহারও দেওয়া হয়।

পরে শায়খ হুদ মুলতানের দিকে ফিরে যান। বাদশাহ তার সঙ্গে শায়খ নুরুদ্দিন শিরাজিকে পাঠান। সেখানে গিয়ে গদিনশীন হওয়ার আনুষ্ঠানিকতা উদযাপনের নির্দেশ দেন। বাদশাহর খরচে সেখানেও বড় দাওয়াতের আয়োজন করা হয়। শায়খ হুদ কয়েক বছর পর্যন্ত গদিনশীন থাকেন।

একবার সিন্ধের শাসক ইমাদুল মুলক বাদশাহকে লিখলেন, শায়খ হুদ ও তার স্বজনরা সম্পদ জমাচ্ছেন এবং অহেতুক কাজে তা ব্যয় করছেন। খানকায় কাউকে রুটি দেন না। বাদশাহ সঙ্গে সঙ্গে তাদের সম্পদ জব্দ করার নির্দেশ দিলেন। ইমাদুল মুলক তাকে তলব করলেন এবং অনেককে হত্যা করলেন। অনেককে মারপিটও করলেন। কিছুদিন দিনে ২০ হাজার দিনার করে উসুল করতে লাগলেন। এভাবে তাদের কাছে আর কিছু রইল না। তাদের ঘর থেকে অনেক সম্পদ জব্দ করা হয়। একটি জুতাজোড়া ছিল, যার মধ্যে স্বর্ণ ও ইয়াকুত যুক্ত ছিল। এর মূল্য ছিল সাত হাজার দিনার। কেউ কেউ বলেন, এই জুতা ছিল শায়খ হুদের মেয়ের। কারো কারো বক্তব্য এটা তার বাঁদির। যখন অনেক কড়াকড়ি আরোপ করা হয় তখন শায়খ পালিয়ে তুর্কিস্তানে চলে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু এক ব্যক্তি তাকে ধরে ফেলেন। ইমাদুল মুলক এ কথা বাদশাহকে লিখে পাঠান।

বাদশাহ নির্দেশ দিলেন, শায়খ হুদকে এবং তাকে যে ব্যক্তি ধরেছে তাকে একসঙ্গে বেঁধে পাঠিয়ে দাও। যখন উভয়কে রাজধানীতে আনা হয় তখন শায়খ হুদকে যে ধরেছে তাকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। আর শায়খকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কোথায় পালিয়ে যেতে চাচ্ছিলে? তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন।

বাদশাহ বললেন, তোমার ইচ্ছা ছিল তুর্কিস্তানে চলে যাওয়ার। আর সেখানে গিয়ে বলতে আমি বাহাউদ্দিন মুলতানির ছেলে। বাদশাহ আমার সঙ্গে এমন আচরণ করেছেন। এভাবে তুর্কিদেরকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে। তার গর্দান উড়িয়ে দাও। সঙ্গে সঙ্গে তা বাস্তবায়ন করা হয়। আল্লাহ তার ওপর রহম করুন।

নিহত ব্যক্তির ছেলেদের হত্যা, হুকুম তামিলকারী কাজিকে হত্যা

শায়খ সালেহ শামসুদ্দিন ইবনে তাজুল আরিফিন 'কুইল'[১] শহরে থাকতেন। তিনি দুনিয়াবিরাগী ও আল্লাহভীরু ছিলেন। যখন বাদশাহ কুইল গেলেন তখন শায়খ শামসুদ্দিনকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু তিনি এলেন না। তখন বাদশাহ নিজে তার কাছে গেলেন। যখন বাদশাহ তার বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছলেন তখন তিনি কোথাও চলে গেলেন এবং বাদশাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন না। এরপর ঘটনাক্রমে এক আমির বিদ্রোহ করেন এবং লোকেরা তার কাছে বাইআতও নেয়। বাদশাহর কাছে কেউ গিয়ে বলল, একবার শায়খ শামসুদ্দিনের মজলিসে এই আমিরের আলোচনা উঠে, তখন শায়খ তার প্রশংসা করেন। আর বলেন, তিনি বাদশাহ হওয়ার যোগ্য। এটা শুনে বাদশাহ একজন আমিরকে পাঠালেন শায়খ শামসুদ্দিনকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসতে। তিনি গিয়ে শায়খ, তার ছেলেদের এবং কুইলের কাজি ও কর্মকর্তাদের গ্রেফতার করেন। কেননা তারাও ওই মজলিসে হাজির ছিলেন, যে মজলিসে শায়খ বিদ্রোহী আমিরের প্রশংসা করেন।

বাদশাহ তাদেরকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিলেন। আর কাজি ও কর্মকর্তাদের চোখ সেলাই করার নির্দেশ দেন। শায়খ শামসুদ্দিনকে বন্দি করা হলো। আর কাজি ও কর্মকর্তাদের ভিক্ষার জন্য প্রতিদিন বাইরে নিয়ে যাওয়া হতো। পরে আবার কয়েদখানায় আনা হতো। বাদশাহর কাছে এই

---

[১] বর্তমান আলিগড়।

খবর পৌঁছে যে, শামসুদ্দিনের ছেলে হিন্দুদের সঙ্গে অনেক ওঠাবসা করেন এবং বিদ্রোহী হিন্দুদের কাছে তার অনেক যাতায়াত রয়েছে। যখন শায়খ শামসুদ্দিন মারা গেলেন তখন তার ছেলেদেরকে কারাগার থেকে বের করে আনা হয়। বাদশাহ তাদের বললেন, আর এমন করো না। তারা বললেন, আমরা এমন কিছু করিনি। এতে বাদশাহ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন এবং তাদের হত্যার নির্দেশ দিলেন।

উড়িয়ে দেওয়া হলো কাজি সাহেবের গর্দান

পরে কাজিকে ডাকা হলো। তাকে বলা হলো, ওই লোকদের নাম বলো, যারা এই খুন হওয়া ব্যক্তিদের সহযোগী এবং তাদের অনুসরণ করে। তিনি অনেক হিন্দু লোকের নাম বলে দিলেন। বাদশাহ যখন এই তালিকা দেখলেন তখন বললেন, এই ব্যক্তি আমাকে প্রজাশূন্য করতে চাচ্ছে। সুতরাং তার গর্দান উড়িয়ে দাও। সুতরাং কাজি সাহেবের গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হলো।

শায়খ আলী হায়দারকে হত্যা

শায়খ আলী হায়দারি থাকতেন কম্বাইত শহরে। এটি হিন্দুস্তানের একটি বন্দরনগরী। তার বুযুর্গির প্রসিদ্ধি ছিল দূর-দূরান্তে। লোকেরা সমুদ্রে তার নামে মানত মানত। যখন তার সামনে আসত তাকে সালাম করত। তিনি কাশফের মাধ্যমে সব কথা বলে দিতে পারতেন।

যখন কোনো সওদাগর বড় কোনো মানত মানত এবং সেটা তিনি গোপন রাখতেন, তখন শায়খ বলে দিতেন, তুমি এই পরিমাণ মানত করেছ, কিন্তু এখন দিচ্ছো এটা। কয়েকবার এ ধরনের ঘটনা ঘটার পর শায়খ হায়দারির নামডাক ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। যখন কাজি জালাল আফগানি কম্বাইত এলাকায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তখন বাদশাহর কাছে খবর পৌঁছে শায়খ হায়দারি কাজি জালালের জন্য দোয়া করেছেন। এমনকি নিজের মাথার টুপি তাকে হাদিয়া দিয়েছেন। শায়খ হায়দারি কাজি জালালের হাতে বাইআত হয়েছেন বলেও খবর পৌঁছে বাদশাহর কাছে।

বাদশাহ নিজে এই বিদ্রোহ দমনে যান। কাজি জালালকে তিনি পরাজিত করেন। পরে শারফুল মালিক আমির বখতকে কম্বাইতে রেখে আসেন। আর নির্দেশ দেন, সব বিদ্রোহীকে যেন খুঁজে বের করা হয়। আর তার সঙ্গে একজন ফকিহও রেখে আসেন। আর বলে দেন, তার ফতোয়া মতো যেন

কাজ করেন। শারফুল মালিক শায়খ আলী হায়দারিকে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। এটা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, আলী হায়দারি তার পাগড়ি কাজি জালালকে দিয়েছেন। আর তার জন্য দোয়াও করেছেন। ফকিহ তাকে হত্যার ফতোয়া দিয়ে দেন। কিন্তু জল্লাদ যখন তার ওপর তলোয়ার চালাল তখন তা কোনো কাজ করল না। এতে উপস্থিত সবাই খুবই বিস্মিত হলো। লোকদের ধারণা ছিল, এবার তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। কিন্তু শারফুল মালিক অন্য আরেক জল্লাদকে নির্দেশ দিলেন। সেই জল্লাদ তার গর্দান উড়িয়ে দিল।

ফারগানার সর্দারকে হত্যা

তুগান ও তার ভাই ছিলেন ফারগানার সর্দার। তারা বাদশাহর কাছে এসেছিলেন। বাদশাহ তাদের সঙ্গে ভালো আচরণও করেন। তারা বাদশাহর কাছে অনেক দিন পর্যন্ত থাকেন। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তারা নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। বরং পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাদের এক বন্ধু এই খবর বাদশাহর কানে দিয়ে দেন। বাদশাহ নির্দেশ দিলেন তাদের দুই টুকরো করে দাও।[১] আর তাদের যাবতীয় সম্পদ ওই লোককে দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন যিনি এই খবর বাদশাহর কাছে পৌঁছান।

সওদাগরের শিশু সন্তানকে হত্যা

বিনা অপরাধে আমির আলী তাবরেযির শাস্তি

খতিবুল খুতাবার দুর্গতি

মালিকুত তুজ্জারের এক শিশুসন্তান ছিল। যখন আইনুল মালিক বাদশাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন তখন মালিকুত তুজ্জারের ছেলে তার কাছে ছিল। তিনি তাকেও সঙ্গে নিয়ে যান। যখন আইনুল মালিক পরাজিত হলেন এবং তার সাথীসঙ্গীদের বন্দি করা হয় তখন তাদের মধ্যে মালিকুত তুজ্জারের ছেলেও ছিল। তার ভগ্নিপতি কুতবুল মালিকের ছেলেও ছিল।

বাদশাহ নির্দেশ দিলেন এই দুই শিশুকে কাঠের সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখতে। আর আমিরের ছেলেদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন তাদের লক্ষ করে তির

---

[১] কী অপরাধের কত বড় শাস্তি!–রইস আহমাদ জাফরি।

ছুড়ে মারে। এভাবে তাদের হত্যা করা হয়। যখন তাদের উভয়ের মৃত্যু হয় তখন খাজা আমির আলী তাবরেযি কাজি কামালুদ্দিনের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করেন। আর বলেন, এই দুই শিশু এমন শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত ছিল না। বাদশাহর কানে এই খবর চলে যায়। বাদশাহ বললেন, তুমি তাদের মৃত্যুর আগে কেন এটা বলোনি। তাকে দুশ দোররা মারার নির্দেশ দেন। পরে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। আর তার সব ধনসম্পদ জল্লাদের সর্দারকে দিয়ে দেন।

আমি পরদিন দেখলাম ওই ব্যক্তি আমির আলী তাবরেযির জামা, তার টুপি পরে তার ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছে। আমি দূর থেকে দেখে ভাবছিলাম, তিনি আমির আলি তাবরেযি। তিনি কয়েক মাস কারাগারে ছিলেন। কিছুদিন পর বাদশাহ তাকে মুক্ত করে দেন এবং তাকে আগের পদে পুনর্বহাল করেন। পরবর্তী সময়ে তার প্রতি আবার রুষ্ট হন এবং তাকে খুরাসানের দিকে বের করে দেন। তিনি হেরাতে অবস্থান করেন। বাদশাহর কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠান এবং তার করুণা ভিক্ষা চান। বাদশাহ সেই চিঠির অপর পিঠে লিখলেন, যদি তাওবা করে থাকো তাহলে ফিরে এসো। সুতরাং আমির আলী তাবরেযি ফিরে এলেন।

দিল্লির খতিবুল খুতাবাকে (প্রধান খতিব) একবার বাদশাহ নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন স্বর্ণখনির দেখভাল করেন। ঘটনাক্রমে এক রাতে চোর আসে। তারা সেখান থেকে কিছু স্বর্ণ চুরি করে নিয়ে যায়। বাদশাহ খতিবকে পেটানোর নির্দেশ দিলেন। এই পিটুনিতেই খতিব প্রাণ হারান।

দিল্লি শহর কীভাবে বিরান হলো?

বাদশাহর সবচেয়ে মারাত্মক যে অভিযোগ করা হয় সেটা হলো, তিনি দিল্লি শহরের সব অধিবাসীকে শহর ছাড়তে বাধ্য করেন। এর একটা কারণও ছিল। লোকেরা আজেবাজে ভাষায় চিঠি লিখে খামে ভরে পাঠিয়ে দিত। আর চিঠির ওপরে লিখত, বাদশাহর মাথার শপথ, বাদশাহ ছাড়া যেন কেউ এই চিঠি না খুলেন। এই চিঠি রাতের বেলা বাদশাহর দরবার হলে ছুড়ে মারতো।

বাদশাহ চিঠি খুলে দেখতেন এতে গালিগালাজে ভরা। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে বাদশাহ দিল্লি উজাড় করে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। তিনি সবার

জায়গা-জমি কিনে নিলেন এবং পুরো মূল্য পরিশোধ করে দিলেন। আর সবাইকে দৌলতাবাদে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। লোকদের কেউ কেউ তাতে অস্বীকৃতি জানাল। তখন ঘোষক দিয়ে ঘোষণা করা হলো, তিন দিন পর শহরে কেউ থাকতে পারবে না। এই ঘোষণা শুনে বেশির ভাগই চলে গেল। অল্প কিছু লোক রয়ে গেল। বাদশাহ তার ক্রীতদাসদের নির্দেশ দিলেন, শহরে গিয়ে দেখ কেউ রয়ে গেছে কি না। তারা গিয়ে দুজনকে পেল। এদের একজন অন্ধ, অন্যজন খোঁড়া। তাদের দুজনকে বাদশাহর সামনে আনা হলো। বাদশাহ খোঁড়া লোকটিকে ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা দূরে ছুড়ে মারলেন। এতেই তার মৃত্যু হয়। আর অন্ধ লোকটির ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন, তাকে টেনে-হিঁচড়ে দৌলতাবাদে নিয়ে যাও। দৌলতাবাদ ছিল চল্লিশ দিনের রাস্তা। সুতরাং তার একটি মাত্র পা দৌলতাবাদে পৌঁছেছিল। লোকজন যখন এই অবস্থা দেখল তখন সবাই নিজেদের ধনসম্পদ রেখেই পালাল। এভাবে শহর বিরানভূমিতে পরিণত হলো।

একজন নির্ভরযোগ্য মানুষ আমাকে বলেছেন, বাদশাহ এক রাতে নিজের রাজপ্রাসাদের ছাদে চড়লেন এবং শহরের দিকে তাকালেন। তিনি গোটা শহরে কোথাও আগুন, ধোঁয়া কিংবা বাতি দেখতে পেলেন না। বাদশাহ বললেন, এবার আমার অন্তর প্রশান্ত হয়েছে। পরে অন্য শহরের বাসিন্দাদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন দিল্লিতে এসে বসবাস করে। এতে অন্য শহরগুলোও নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু দিল্লি আর আবাদ হয়নি। আমরা যখন শহরে প্রবেশ করি তখন পর্যন্ত দিল্লি একদম অনাবাদ ছিল। এর কোনো কোনো বাড়ি আবাদ ছিল। এবার আমি আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করব, যা ওই বাদশাহর সময় সংঘটিত হয়।[১]

---

[১] দিল্লি উজাড় করে দেওয়া এবং দৌলতাবাদকে রাজধানী বানানোর বিষয়টি সম্পূর্ণ সঠিক। কিন্তু ইবনে বতুতা যে কারণ লিখেছেন এর স্বপক্ষে আর কোনো ঐতিহাসিকের বর্ণনা পাওয়া যায় না।

প্রকৃত বিষয় হলো, তিনি দক্ষিণ হিন্দুস্তানকে ইসলামী শান-শওকত, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র বানাতে চেয়েছিলেন। এই বিষয়টি ওই সময় পর্যন্ত সম্ভব ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত ইলমি ও সাংস্কৃতিক ছাঁচ, যা দিল্লির অধিবাসীদের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, তারা দৌলতাবাদে চলে আসে। শুধু এর দ্বারাই দৌলতাবাদ দিল্লির মর্যাদা লাভ করতে পারত। দিল্লির নাগরিকদের দেশান্তর করার উদ্দেশ্য থাকলে তাদের জায়গা-জমির মূল্য পরিশোধ করতেন না। যদিও এতে সন্দেহ নেই, এই পদক্ষেপ ছিল খুবই তাড়াহুড়ো করে নেওয়া। এটি সুচিন্তিতও নয়। তবে তুঘলকের মতো ব্যক্তির কাছ থেকে তা অবিশ্বাস্য কখনো নয়।

গিয়াসুদ্দিন বাহাদুরের অবাধ্যতা

যখন মুহাম্মাদ তুঘলক সিংহাসনে বসলেন এবং লোকেরা তার কাছে বাইআত হয়ে গেল তখন গিয়াসুদ্দিন[১] বাহাদুরকেও সামনে আনেন, যাকে তুঘলক কারাগারে বন্দি করেছিলেন। মুহাম্মাদ তুঘলক তার ওপর অনুগ্রহ করেন এবং কারাগার থেকে মুক্ত করে দেন। অনেক ধনসম্পদ, হাতি-ঘোড়া দিয়ে তাকে বিদায় করেন। আর তার সঙ্গে ইবরাহিম[২] খাঁকে দিয়ে দেন। তার কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নেন যে, দুজন একসঙ্গে মিলে রাজত্ব করবেন, মুদ্রায় দুজনের নামই লেখা থাকবে এবং দুজনের নামেই খুতবা পড়া হবে।

বাদশাহ গিয়াসুদ্দিনের কাছ থেকে এই শর্তও নেন যে, তিনি তার ছেলে মুহাম্মাদকে বাদশাহর কাছে জামানত হিসেবে পাঠাবেন। গিয়াসুদ্দিন নিজ দেশে চলে গেলেন এবং সব শর্ত পূরণ করলেন। কিন্তু নিজের ছেলেকে আর বাদশাহর কাছে পাঠালেন না। এই বলে অপারগতা পেশ করেন যে, আমার ছেলে কথা মানে না, সে অবাধ্য। বাদশাহ ইবরাহিম খাঁর কাছে বাহিনী পাঠালেন এবং দালজালি তাতারিকে তাদের সেনাপতি বানালেন। তারা গিয়াসুদ্দিনের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং তাকে হত্যা করেন। তার গায়ের চামড়া তুলে এর মধ্যে খড় ভরে পুরো দেশ ঘোরানো হয়।

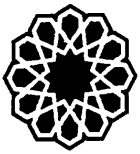

[১] তিনি বলবনের পৌত্র এবং বাংলার শাসক ছিলেন।

[২] ইবরাহিম খাঁ অথবা বাহরাম খাঁ, তারা গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের ছেলে ছিলেন।—রইস আহমাদ জাফরি।

তুঘলকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ ও আন্দোলন

তুঘলকের ভাতিজা

বাহাউদ্দিন গাস্তাসাপের বিদ্রোহ

সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের এক ভাতিজা ছিলেন। তার নাম ছিল বাহাউদ্দিন গাস্তাসাপ। বাদশাহ তাকে কোনো এলাকার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। গিয়াসুদ্দিন মারা যাওয়ার পর তিনি মুহাম্মাদ তুঘলকের কাছে বাইআত হতে অস্বীকৃতি জানান। এই ব্যক্তি অনেক বড় বীর ছিলেন। বাদশাহ তাকে দমনের জন্য বাহিনী পাঠান। মালিক মুজির ও খাজা জাহাঁকে এই বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন। প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর বাহাউদ্দিন 'রায় কুম্বিলা'য় পালিয়ে যান।[১] 'রায়' শব্দটি হিন্দি, ইংরেজি ভাষায়[২] যেমন বাদশাহর ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহার হয়। কুম্বিলা হচ্ছে ওই দেশের নাম, যার তিনি বাদশাহ ছিলেন। এই রাজার দেশ ছিল দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে। হিন্দু রাজাদের মধ্যে তাকে শীর্ষস্থানীয় গণ্য করা হতো।

যখন বাহাউদ্দিন তার কাছে গেলেন তখন বাদশাহর বাহিনীও পেছনে পেছনে গেল এবং ওই শহর অবরোধ করে ফেলল। যখন রায়ের কাছে থাকা খাদ্যভান্ডার শেষ হয়ে যায় এবং তার মধ্যে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় দেখা দেয় তখন বাহাউদ্দিনকে ডেকে বললেন, কী অবস্থা সেটা আপনি দেখছেন। আমি আমার নিজের এবং স্বজনদের নিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনি অমুক রাজার কাছে চলে যান। এরপর তিনি ওই রাজার কাছে চলে যান। রায় কুম্বিলা একটি বড় আগুন প্রজ্বলিত করলেন। নিজের সব ধনসম্পদ এতে ফেলে দিলেন। নিজের ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীদের বললেন, আমি এতে জ্বলতে চাচ্ছি। তোমাদের যার খুশি আমাকে অনুসরণ করতে পারো। সুতরাং এক একজন স্ত্রী গোসল করে চন্দন কাঠ নিয়ে তার সামনে মাটিতে চুমু খেতে থাকলেন এবং নিজেরা সেই আগুনে ঝাঁপ দিতে লাগলেন। তাদের সঙ্গে আমির, উযির ও প্রজাসাধারণের মধ্যে যাদের খুশি আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মারা যায়।

---

[১] মাদ্রাজের বালারি এলাকায় বেজানগরের কাছে এই সাম্রাজ্য ছিল।

[২] রায় অর্থ বাদশাহ। ইংরেজি ভাষায়ও একই অর্থ। যেমন ভাইসরায় অর্থাৎ সহযোগী বাদশাহ।

সবশেষ রাজা গোসল করেন। চন্দন কাঠ নেন। লৌহবর্ম পরে অস্ত্রশস্ত্রসহ নিজের সহযোগীদের নিয়ে বাদশাহর বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। সবাই লড়াই করতে করতে মারা যান। বাদশাহর বাহিনী শহরে প্রবেশ করে এবং সেখানে থাকা নাগরিকদের আটক করে। রাজার ছেলেদের মধ্যে এগার ছেলে ধরা পড়ে। তাদের বাদশাহর সামনে আনা হলে সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন। বাদশাহ তাদের বংশীয় আভিজাত্য এবং বাবার বীরত্বের কারণে সবাইকে নেতৃত্বের আসনে আসীন করেন। তাদের তিনজনকে আমিও দেখেছি। একজনের নাম ছিল নাসির, দ্বিতীয়জনের নাম বখতিয়ার। আর তৃতীয়জনকে মেহেরদার বলা হতো। তার কাছে বাদশাহর সিল থাকত। খাবারদাবারের প্রতিটি জিনিসের মধ্যে তা লাগানো হতো। তার উপনাম ছিল আবু মুসলিম। তার সঙ্গে আমার গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল।

যখন কুম্বিলার রাজা মারা গেলেন তখন বাদশাহর বাহিনী রাজার[১] ওই এলাকায় গেলেন, যেখানে বাহাউদ্দিন আশ্রয় নিয়েছিলেন। ওই রাজা বাহাউদ্দিনকে বললেন, আমি রায় কুম্বিলার মতো করব না। সুতরাং তিনি বাহাউদ্দিনকে ধরে বাদশাহর বাহিনীর কাছে সোপর্দ করে দেন। তাকে হাতকড়া এবং পায়ে বেড়ি পরিয়ে বাদশাহর সামনে হাজির করা হলো। যখন বাদশাহর কাছে তাকে নেওয়া হলো তখন বাদশাহ বললেন, তাকে হেরেমের ভেতরে নিয়ে যাও। সেখানে তার আত্মীয়স্বজনরা নারীরা তাকে নানা গালমন্দ করল এবং মুখে থুতু দিল। পরে বাদশাহ নির্দেশ দিলেন, জীবিত অবস্থায় তার শরীরের চামড়া উপড়ে ফেল। আর তার মাংসের একটি অংশ চালের সঙ্গে রান্না করে বাড়িতে স্ত্রী-সন্তানের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আর বাকি অংশ একটি স্ট্রেতে রেখে হাতির সামনে পেশ করা হলো। কিন্তু হাতি সেগুলো খেল না। এরপর হাতির চামড়ার ভেতরে খড় ঢুকিয়ে গিয়াসুদ্দিন বাহাদুরের চামড়াসহ পুরো দেশ ঘোরালো।

কিসলু খানের বিদ্রোহ

তুঘলকের মাথায় রাজমুকুট প্রদানকারীর পরিণতি

যখন সিন্ধে এই দুটি চামড়া পৌঁছল তখন সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের বন্ধু কিসলু খান ছিলেন সিন্ধের গভর্নর। মুহাম্মাদ তুঘলক তাকে অনেক সম্মান

---

[১] এটা স্পষ্ট, অন্যের জন্য নিজের প্রাণ দিয়ে দেওয়ার হিম্মত সবার হয় না।

করতেন। তাকে চাচা বলে সম্বোধন করতেন। যখন তিনি রাজধানীতে আসতেন তখন তিনি অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এগিয়ে যেতেন। কিসলু খান দুটি চামড়া দাফন করার নির্দেশ দিলেন। বাদশাহর কাছে যখন এই খবর পৌঁছল তখন তিনি এতে অসন্তুষ্ট হলেন এবং কিসলু খানকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি কিসলু খানকে ডেকে পাঠালেন। কিসলু খানের এটা জানা ছিল যে, বাদশাহ তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি যেতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে উদ্বুদ্ধ হলেন। খুরাসানবাসীর সহযোগিতা কামনা করলেন। তারা কিসলু খানের সহযোগিতার জন্য এগিয়ে এলো। এতে তার বাহিনী বাদশাহর বাহিনীর সমপর্যায়ের বরং অনেক বড় হয়ে গেল। বাদশাহ নিজে তার সঙ্গে লড়াই করতে গেলেন। মুলতান থেকে দুই মঞ্জিল দূরত্বে আবু হর বনে দুই পক্ষের মধ্যে লড়াই হয়।

বাদশাহ সেদিন কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করেন। নিজের পরিবর্তে রোকনুদ্দিন মুলতানির ভাই শায়খ ইমাদুদ্দিনকে দাঁড় করিয়ে দেন। বাদশাহর চেহারার সঙ্গে ইমাদুদ্দিনের চেহারার অনেকটা মিল ছিল। যখন লড়াই শুরু হলো তখন বাদশাহ চার হাজার সেনা নিয়ে অন্য দিকে চলে গেলেন। এদিকে কিসলু খানের বাহিনী শাহি চত্বরের কাছে ইমাদুদ্দিনকে হত্যা করে। পুরো বাহিনীতে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, বাদশাহকে হত্যা করা হয়েছে। কিসলু খানের পুরো বাহিনী ফিরে গেল এবং তাকে একা ফেলে রেখে গেল। তার সঙ্গে থাকা সেনার সংখ্যা ছিল খুবই কম।

বাদশাহ সুযোগ বুঝে তার সঙ্গে থাকা সেনাদের নিয়ে কিসলু খানের ওপর অতর্কিত হামলা করেন। তাকে হত্যার পর শিরশ্ছেদ করেন। কিসলু খানের বাহিনী যখন এই খবর পেল তখন তারা আবার ঘুরে দাঁড়ালো। বাদশাহ মুলতান শহরে প্রবেশ করেন এবং সেখানকার কাজি কারিমুদ্দিনকে ধরে তার গায়ের চামড়া তুলে ফেলেন এবং কিসলু খানের কাটা মাথা মুলতানের সদর দরজায় ঝুলিয়ে রাখলেন। আমি যখন মুলতানে পৌঁছি তখনো সেই কাটা মাথা সেখানে ঝুলছিল।[১] বাদশাহ শায়খ রোকনুদ্দিনের ভাই ইমাদুদ্দিন ও

---

[১] তিনি ওই কিসলু খান যার উপস্থিতিতে গিয়াসুদ্দিন তুঘলক শাহি মুকুট মাথায় তোলার সাহস পাচ্ছিলেন না। তিনি আবেদন করছিলেন কিসলু খান যেন বাদশাহ হন। কিন্তু কিসলু খান বড় মনের পরিচয় দিয়ে শাহি মুকুট নিজের মাথায় না তুলে গিয়াসুদ্দিনের মাথায় তুলে দেন। আফসোস, আজ তার এমন পরিণতি!

কিসলু খানের বিদ্রোহের আরো কিছু কারণ অন্যান্য ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন। তবে সবচেয়ে

তার ছেলে সদরুদ্দিনকে উপহার হিসেবে কয়েকটি গ্রাম দান করেন, যাতে এর উপার্জন দিয়ে তারা চলতে পারেন। এছাড়া শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানির খানকার লংগরখানা যাতে চালু রাখতে পারেন। এই কথা শায়খ রোকনুদ্দিন নিজে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

পরে বাদশাহ তার উযির খাজা জাহাঁকে নির্দেশ দিলেন যাতে তিনি কামালপুর[১] শহরের দিকে যান। এটি সমুদ্র তীরবর্তী একটি বড় শহর। সেখানকার অধিবাসীরাও বিদ্রোহ করেছিল। তখন কামালপুরে থাকা এক ফকিহ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, শহরের কাজি ও খতিবকে উযিরের সামনে হাজির করা হয়। উযির নির্দেশ দিলেন, তাদের দুজনের গায়ের চামড়া যেন উপড়ে ফেলা হয়।

হিমালয়ে অভিযান

চীন জয়ের সংকল্প অপূর্ণ রইল

কারাজিল[২] একটি বড় পাহাড়। যার দৈর্ঘ্য তিন মাস সফরের মতো। এটি দিল্লি থেকে দশ মঞ্জিল দূরে অবস্থিত। এর রাজা ছিলেন বড় রাজাদের অন্যতম। বাদশাহ মালিক নাকবাকে এক লাখ অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা দিয়ে ওই পাহাড়ে লড়াইয়ের জন্য পাঠালেন। তারা পাহাড়ের পাদদেশে গড়ে উঠা নতুন শহর দখল করে নেয়। সবকিছু জ্বালিয়ে দেয় এবং অনেক কাফেরকে বন্দি করে। এই দৃশ্য দেখে হিন্দুরা পাহাড়ে লুকিয়ে যায়। এই পাহাড়ের মাত্র একটি দরজা ছিল। অন্যদিকে সমুদ্র ছিল প্রবহমান। একসঙ্গে একজনের বেশি মানুষ এই পাহাড়ে চড়তে পারত না। বাদশাহর বাহিনী এভাবেই পাহাড়ে চড়ে এবং সেখানকার শহর ওয়ারেঙ্গল দখল করে নেয়। বাদশাহকে এই সুখবর জানানো হয়।

বাদশাহ একজন কাজি ও খতিব পাঠালেন এবং তাদেরকে সেখানে অবস্থান করতে বললেন। যখন বৃষ্টিপাতের সময় এল সেনাদের মধ্যে রোগ-বালাই

যৌক্তিক কারণ সেটাই যা ইবনে বতুতা উল্লেখ করেছেন।

[১] এটি ছিল কাঠিয়াওয়ারের একটি সাম্রাজ্য।

[২] কারাজির পাহাড় দ্বারা উদ্দেশ্য হিমালয় পর্বত, যেমনটা ঐতিহাসিক ফেরেশতা লিখেছেন। তুঘলকের উদ্দেশ্য ছিল চীন জয় করা, যা অন্যান্য নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের বর্ণনা দ্বারা জানা যায়। এটা ছিল তার অত্যন্ত দৃঢ়চেতা মনোভাবের পরিচয়।

এই বাহিনী কামালির পথ ধরে অগ্রসর হয় এবং সেখানকার রাজার সঙ্গে তাদের সন্ধি হয়।

ছড়িয়ে পড়ল। এতে সেনাবাহিনী অনেক দুর্বল হয়ে গেল। ঘোড়া মরে গেল এবং কামানগুলো জং ধরে অকেজো হয়ে গেল। আমিররা বাদশাহর কাছে পত্র লিখলেন এবং পাহাড় থেকে নেমে আসার অনুমতি চাইলেন। তারা বললেন, নিচে এসে পাহাড়ের পাদদেশে তারা অবস্থান করবেন এবং বৃষ্টিপাত শেষ হলে তারা আবার পাহাড়ে চড়বেন। বাদশাহ তাদের সেই অনুমতি দিয়ে দেন।

আমির নাকাবা সব ধনভান্ডার ও অলংকারাদি সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন এবং তাদের পাহাড়ের পাদদেশে নিয়ে এলেন। হিন্দুরা যখন এই খবর পেলো তারা তখন বিভিন্ন গর্ত ও গুহায় চুপি চুপি বসে গেল। সংকীর্ণ রাস্তাগুলোতে তারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল। বড় বড় গাছ কেটে এনে সেখানে ফেলল। এতে অনেকে মারা গেল এবং অনেককে গ্রেফতার করা হলো। তাদের সব আসবাবপত্র ও ঘোড়া লুটে নিল। পুরো বাহিনীর মধ্যে মাত্র তিনজন প্রাণে বাঁচলেন। একজন আমির নাকাবা, দ্বিতীয়জন বদরুদ্দিন দৌলত শাহ আর তৃতীয় ব্যক্তির নাম আমার মনে পড়ছে না। এর দ্বারা বাদশাহর বাহিনী প্রচণ্ড ধাক্কা খেল এবং তারা চরম বিপর্যয়ের শিকার হলো। বাদশাহ পাহাড়ের লোকদের সঙ্গে অল্প পরিমাণ ট্যাক্সের বিনিময়ে সন্ধি করে নিলেন। কেননা পাহাড়ের নিচেও ওই লোকদের জায়গা-জমি ছিল। কিন্তু বাদশাহর আনুগত্য ছাড়া তারা সেগুলো আবাদ করতে পারত না।

শরিফ জালালুদ্দিনের বিদ্রোহ

হাতির দ্বারা অপরাধীকে কিভাবে পিষে মারা হতো?

বাদশাহ মাবারের[১] গভর্নর (যা দিল্লি থেকে ছয় মাসের দূরত্বে) নিযুক্ত করেন সাইয়েদ জালালুদ্দিন আহসান শাহকে। তিনি বিদ্রোহ করেন এবং নিজেই বাদশাহ হওয়ার ঘোষণা দেন। নিজের নামে মুদ্রাও চালু করেন। দিনারের এক পাশে এই বাক্য লিখেন, "سلالة طه ويسين ابو الفقرا والمساكين جلال الدنيا والدين" অপর পাশে লেখেন, "الواثق بتائيد الرحمن احسن شاه السلطان"

বাদশাহ যখন তার অবাধ্যতার কথা জানতে পারলেন নিজে লড়াইয়ের জন্য চলে এলেন। 'কুশক যর' (স্বর্ণের মহল) নামক স্থানে আট দিন পর্যন্ত

---

[১] মাবার দ্বারা উদ্দেশ্য দক্ষিণ ভারতের ওই এলাকা যা কর্নাটক এসব অঞ্চল নিয়ে গঠিত।

অবস্থান করেন রণপ্রস্তুতির জন্য। ওই সময় উযির খাজা জাহাঁর ভাতিজা এবং চার পাঁচজন আমির যাদের হাতকড়া পরানো ছিল, বাদশাহর সামনে হাজির করা হয়। বাদশাহ উযিরকে আগে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি দিল্লি থেকে বিশ মাইল দূরত্বে 'ধার' শহরে পৌঁছে সেখানে অবস্থান করেন। তখন বীর হিসেবে পরিচিত তার ভাতিজা কয়েকজন আমিরকে নিয়ে একটি ষড়যন্ত্র করেন। উযিরকে হত্যা করে সব ধনসম্পদ লুটে সাইয়েদ জালালুদ্দিনের কাছে মাবার পালিয়ে যাওয়ার ফন্দি আঁটেন তারা। তাদের পরিকল্পনা ছিল জুমার নামাযের সময় হঠাৎ করে উযিরকে বন্দি করে ফেলা হবে।

তাদের সেই পরামর্শে শরিক ছিলেন এক ব্যক্তি, তার নাম ছিল মালিক হাজিব নুসরত। তিনি উযিরের কাছে গিয়ে তাদের ফন্দির কথা বলে দেন। আর বলেন, তাদের জামার নিচে লৌহবর্ম পরা আছে, এটাই তাদের বিদ্রোহ করার দলিল। উযির তাদের ডেকে পাঠালেন। মালিক নাসিরের তথ্য অনুযায়ী তাদের জামার নিচে লৌহবর্ম পাওয়া গেল। উযির তখন তাদের বন্দি করে বাদশাহর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তারা যখন বাদশাহর কাছে পৌঁছে তখন আমিও সেখানে ছিলাম। তাদের একজনকে দেখলাম, তার দাড়ি লম্বা লম্বা, তিনি ভয়ে কাঁপছেন। তিনি সূরা ইয়াসিন পড়ছেন। বাদশাহ ভাতিজাকে উযিরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং তাকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। আর বাকি আমিরদের পেশ করলেন হাতির সামনে। এই হাতি দ্বারা অপরাধীদের হত্যা করা হতো। হাতির দাঁতগুলো ছিল লাঙলের ফলার মতো দুই দিকেই ধারাল। কাউকে হাতির সামনে পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে হাতি শুঁড় দিয়ে তাকে উঠিয়ে দাঁত দ্বারা কামড়াতো। এরপর মাটিতে ফেলে পা দ্বারা চেপে ধরত। মাহুত বললে দাঁত দ্বারা তাকে দুই টুকরো করতো। আর যাকে দুই টুকরো করা হতো না তাদের শরীরের চামড়া টেনে তুলে ফেলা হতো। এই আমিরদের গায়ের চামড়াও টেনে তুলে ফেলা হয়।

আমি যখন বাদশাহর মহল থেকে মাগরিবের পর বের হলাম তখন কুকুর তাদের গোশত চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছিল। আর তাদের গায়ের চামড়ার ভেতরে খড় ঢোকানো হচ্ছিল। আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি। বাদশাহ যখন মাবারে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন তখন আমাকে রাজধানীতে থাকার নির্দেশ দিলেন। বাদশাহ যখন দৌলতাবাদে পৌঁছলেন তখন আমির হালাজুন বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। উযির খাজা জাহাঁ বাহিনী প্রস্তুত করার জন্য রাজধানীতে রয়ে গেলেন।

লাহোরের গভর্নরের বিদ্রোহ

আমির হালাজুন প্রমুখের অবাধ্যতার ভয়ানক শাস্তি

যখন বাদশাহ দৌলতাবাদে পৌঁছলেন এবং নিজের রাজত্ব থেকে অনেক দূরে চলে গেলেন তখন আমির হালাজুন লাহোরে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং নিজেই বাদশাহ হয়ে যান। আমির গুল চান্দ তাকে সহযোগিতা করেন। হালাজুন তাকে নিজের উযির হিসেবে নিযুক্ত করেন। এই খবর উযির খাজা জাহাঁর কাছে পৌঁছে। তিনি তখন দিল্লিতে ছিলেন। উযির সব খুরাসানি এবং দিল্লিতে থাকা অবশিষ্ট সেনাদের নিয়ে লাহোরের দিকে রওনা করলেন। আমার সাথীসঙ্গীরাও তার সঙ্গে গেলেন। বাদশাহ তার সহযোগিতার জন্য দুজন বড় আমির পাঠালেন। একজন মালিক কায়সারান সফদার এবং অপরজন মালিক তৈমুর শরাবদার অর্থাৎ পানকারী।

হালাজুন তার বাহিনী নিয়ে মুকাবেলার জন্য বের হলেন। একটি নদীর তীরে মোকাবেলা হয়। হালাজুন পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান। তার বাহিনীর অনেকে নদীতে ডুবে যায়। উযির শহরে ঢুকে শহরবাসীর অনেকের চামড়া উপড়ে ফেলেন এবং অনেককে হত্যা করেন। এই কাজের দায়িত্ব দেন তার সহযোগী মুহাম্মাদ বিন নাজিবকে। এই ব্যক্তিকে 'আযুরে মুলক' বলা হতো। 'সাগে সুলতান'ও ছিল তার উপাধি। এই ব্যক্তি অত্যন্ত জালেম ও কঠোর হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। বাদশাহ তাকে 'বাজারের সিংহ' বলতেন। এই লোক বেশির ভাগ অপরাধীকে নিজের দাঁত দ্বারা কেটে ফেলতেন।

উযির বিদ্রোহী পক্ষের প্রায় তিনশ নারীকে গোয়ালিয়ার দুর্গে পাঠিয়ে দেন। সেখানে তাদের বন্দি করে রাখা হয়। তাদের অনেককে আমি সেখানে দেখেছি। একজন ফকিহ ছিলেন, তার স্ত্রীও গোয়ালিয়ার দুর্গে বন্দি ছিলেন। ওই ফকিহ তার স্ত্রীর কাছে আসা-যাওয়া করতেন। এমনকি বন্দিশালায় তাদের সন্তানও জন্ম নেয়।

মালিক হোশেঙ্গের বিদ্রোহ

যখন বাদশাহ দৌলতাবাদ ফিরে আসছিলেন তখন রাস্তায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। লোকদের মধ্যে বাদশাহর মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়ে। এতে গোটা দেশে ফেতনা বিস্তার লাভ করে। ওই সময় মালিক কামালুদ্দিন গিরগের ছেলে মালিক হোসেঙ্গ ছিলেন দৌলতাবাদের গভর্নর। তিনি বাদশাহর কাছে

অঙ্গীকার করেছিলেন, তিনি বাদশাহর জীবদ্দশায় এমনকি মৃত্যুর পরও কারো কাছে বাইআত হবেন না।

কিন্তু যখন তিনি বাদশাহর মৃত্যুর খবর শুনলেন তখন তিনি পার্শ্ববর্তী এক রাজার কাছে পালিয়ে গেলেন। ওই রাজার নাম ছিল বারবারা। তার এলাকা ছিল দৌলতাবাদ ও কোকন থানার মাঝামাঝি। বাদশাহর কাছে এই খবর পৌঁছলো। ফেতনা ছড়িয়ে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় তিনি দ্রুত দৌলতাবাদে পৌঁছলেন। আর হোশেঙ্গের পেছনে পেছনে গিয়ে সেই রাজার রাজ্য অবরোধ করেন। রাজার কাছে বার্তা পাঠান, হোশেঙ্গকে আমার কাছে সোপর্দ করুন।

কিন্তু রাজা বললেন, একজন আশ্রয়প্রার্থীকে আমি ফেরত দেব না। যদিও আমাকে সেটাই করতে হবে, যা রায় কুম্বিলা করেছিলেন। হোশেঙ্গের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি হলো। তিনি বাদশাহর কাছে পত্র লিখলেন। সিদ্ধান্ত হলো, বাদশাহ দৌলতাবাদে ফিরে যাবেন, বাদশাহর উস্তাদ কাতলু খান পেছনে পেছনে যাবেন এবং হোশেঙ্গ তার কাছে চলে যাবেন।

বাদশাহ ফিরে গেলেন এবং হোশেঙ্গ কাতলু খানের সঙ্গে মিলিত হলেন। কাতলু খান তার সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন, বাদশাহ তোমাকে হত্যা করবেন না এবং তোমার মর্যাদারও কোনো হানি ঘটবে না। হোশেঙ্গ তার আসবাবপত্র এবং পরিবার-পরিজন নিয়ে বাদশাহর কাছে চলে এলেন। নিজের কাছে চলে আসায় বাদশাহ তাকে অনেক উপহার-উপঢৌকন দিলেন। কাতলু খান কথাবার্তায় অনেক পাকাপোক্ত ছিলেন। লোকেরা তার কথায় ভরসা রাখতে পারত। বাদশাহও তাকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। তবে না ডাকলে তিনি কখনো বাদশাহর দরবারে যেতেন না। যাতে বাদশাহর দাঁড়ানোর কষ্টটুকু না হয়। এই ব্যক্তি দানখয়রাতও প্রচুর পরিমাণে করতেন। তিনি ফকির-মিসকিনদের অকাতরে দান করতেন।

ইবনে বতুতার শ্যালক সাইয়েদ ইবরাহিমের বিদ্রোহ ও তাকে হত্যা

সাইয়েদ ইবরাহিম যিনি খরিতাদার নামে পরিচিত ছিলেন। অর্থাৎ বাদশাহর কলম-কাগজ তার কাছে থাকতো। হানসি ও সারসার গভর্নর ছিলেন। বাদশাহ যখন মাবারের দিকে গেলেন, সাইয়েদ ইবরাহিমের বাবা বিদ্রোহী হয়ে বসেন। এদিকে বাদশাহর মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছে। তখন সাইয়েদ ইবরাহিমও ক্ষমতার লালসায় পড়েন।

এই লোক অত্যন্ত সুদর্শন, বাহাদুর ও দানশীল ছিলেন। তার বোন হুরনাসাবকে আমি বিয়ে করেছিলাম। তিনি অত্যন্ত নেককার স্ত্রী ছিলেন। গভীর রাতে তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং ওযিফায় মশগুল থাকতেন। তার গর্ভে আমার এক মেয়েও হয়। এখন আমি জানি না, তাদের দুজনের কী অবস্থা![১] আমার এই স্ত্রী পড়তে পারত, কিন্তু লিখতে পারত না।

যখন ইবরাহিম বিদ্রোহের ইচ্ছা করেন তখন একজন আমির সিন্ধু থেকে ধনভান্ডার নিয়ে তার এলাকা হয়ে দিল্লির দিকে যাচ্ছিলেন। ইবরাহিম তাকে বললেন, রাস্তায় চোরের ভয় আছে। রাস্তা নির্বিঘ্ন হওয়া পর্যন্ত আমার কাছে থেকে যান। তার উদ্দেশ্য ছিল, এর মধ্যেই বাদশাহর মৃত্যুর বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে যাবে। তখন সেই ধনভান্ডার তিনি দখল করে নিতে পারবেন। কিন্তু যখন জানতে পারলেন বাদশাহর মৃত্যুর খবর ছিল নিছক গুজব, তখন আমিরকে সামনে অগ্রসর হতে দিলেন। ওই আমিরের নাম ছিল যিয়াউল মুলক বিন শামসুল মুলক। বাদশাহ যখন আড়াই বছর পর রাজধানীতে ফিরে এলেন তখন সাইয়েদ ইবরাহিম তাকে সালাম করতে গেলেন। এক ক্রীতদাস বাদশাহর কাছে গিয়ে ইবরাহিমের মনোবাসনার কথা জানিয়ে দেয়। বাদশাহ সিদ্ধান্ত নিলেন তাকে হত্যা করবেন। কিন্তু তার সঙ্গে বাদশাহর একটা ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। এজন্য সিদ্ধান্ত মুলতবি করে দিলেন।

একবার ঘটনাক্রমে বাদশাহর কাছে একটি হরিণের বাচ্চা জবাই করা অবস্থায় আনা হলো। বাদশাহ এটা দেখে বললেন, এটি সঠিকভাবে জবাই করা হয়নি, সুতরাং ফেলে দাও। ইবরাহিম এটা দেখে বলেন, এটি সঠিকভাবেই জবাই করা হয়েছে, আমি এটি খাব। এই খবর যখন বাদশাহর কাছে গেল তখন তিনি রাগ করলেন এবং ইবরাহিমকে বন্দি করার নির্দেশ দিলেন। এরপর যিয়াউল মুলক যে ধনভান্ডার সিন্ধু থেকে দিল্লিতে নিয়ে আসছিলেন সেটা আত্মসাতের অভিযোগ তার ওপর আরোপ করা হয়। ইবরাহিম জানতে পারলেন, তার বাবার বিদ্রোহের কারণে বাদশাহ তাকে হত্যা করতে চাচ্ছেন। এজন্য কোনো ওযর-আপত্তিই আর গ্রহণযোগ্য হবে

---

[১] ইবনে বতুতা এভাবে যেখানে যেতেন সেখানেই বিয়ে করতেন। এরপর স্ত্রী-সন্তানদের রেখে অন্য কোথাও ভ্রমণে বেরিয়ে যেতেন। স্বাধীন প্রকৃতির একজন মুক্ত মানুষ ছিলেন তিনি। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিন।

না, তাকে শাস্তি ভোগ করতেই হবে। এজন্য তিনি মৃত্যুর শাস্তিকে সহজ মনে করে অভিযোগ স্বীকার করে নেন। বাদশাহ তাকে দুই টুকরো করার নির্দেশ দিলেন। সেখানকার নিয়ম হলো, বাদশাহর নির্দেশে যাকে হত্যা করা হবে তার লাশ তিন দিন পর্যন্ত সেখানেই পড়ে থাকবে। তিন দিন পর নির্ধারিত ব্যক্তি সেই লাশ উঠিয়ে নিয়ে গর্তে ফেলে দিত। সেই গর্ত থেকে যেন স্বজনরা লাশ নিতে না পারে সেখানে পাহারাদার নিযুক্ত থাকত। তবে পাহারাদারদের ঘুষ দিয়ে কেউ কেউ তাদের স্বজনদের লাশ নিয়ে অন্যত্র দাফন-কাফন করত। একইভাবে সাইয়েদ ইবরাহিমকেও দাফন করা হয়।

আইনুল মালিকের বিদ্রোহ

স্ত্রীর বিশ্বস্ততা বিদ্রোহীর প্রাণ রক্ষা করে

যখন দেশে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ল তখন বাদশাহ তার বাহিনী নিয়ে গঙ্গা নদের তীরে চলে গেলেন। এই নদকে হিন্দুরা খুবই পবিত্র মনে করত। বাদশাহ যেখানে অবস্থান করেন সেটা ছিল দিল্লি থেকে দশ মনযিল দূরত্বে। বাদশাহ লোকদের নির্দেশ দিলেন সেখানে যেন সবাই বাড়িঘর নির্মাণ করে। প্রথমে খড়ের ছাদ দিয়ে ঘর বানানো হয়। কিন্তু সেখানে প্রায়ই আগুন লেগে যেত। এত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়ত তারা। এজন্য লোকেরা মাটির নিচে তাহখানা বানিয়ে নেয়। যখন আগুন লাগত সব আসবাবপত্র সেখানে ঢুকিয়ে মাটি দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিত।

আমিও ওই সময় বাদশাহর ক্যাম্পে যাই। গঙ্গা নদের পশ্চিম দিকে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ চলছিল। কিন্তু পূর্ব দিকে সচ্ছলতা ছিল। আমির আইনুল মুলক বাদশাহর পক্ষ থেকে উদ, জাফরাবাদ ও লক্ষ্মৌর গভর্নর ছিলেন। এই আমির প্রতিদিন বাদশাহর ক্যাম্পে ৫০ হাজার মণ গম, চাল ও চনা পাঠাতেন গৃহপালিত প্রাণীর জন্য। পরে বাদশাহ ক্যাম্পের হাতি, ঘোড়া ও খচ্চর নদের পূর্ব দিকে চরানোর জন্য পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আইনুল মালিককে এসবের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

আইনুল মালিকের আরো চার ভাই ছিলেন। তাদের নাম হলো শাহরুল্লাহ, নাসরুল্লাহ ও ফযলুল্লাহ। চতুর্থজনের নাম আমার মনে পড়ছে না। তারা তাদের ভাই আইনুল মালিকের সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র করে বাদশাহর হাতি ও গৃহপালিত প্রাণী হাতিয়ে নেওয়ার কৌশল আঁটেন। আইনুল মালিকের হাতে বাইআত হয়ে তাকে বাদশাহ বানানোর ফন্দিও করেন। আইনুল মালিকও

রাতের বেলা পালিয়ে যান। তারা অনেকটা সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন। বাদশাহ জানবেন না এমন ব্যবস্থাও হয়েছিল।

তবে হিন্দুস্তানের নিয়ম হলো প্রত্যেক ছোট-বড় আমিরের কাছে বাদশাহর একজন ক্রীতদাস থাকে, যারা বাদশাহর কাছে আমিরের যাবতীয় খবরবার্তা পৌঁছে দেয়। এমনিভাবে আমিরের ঘরে ক্রীতদাসী থাকে। এই ক্রীতদাসীরা বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ করতে পারত এবং ঘরে যা কিছু হয় সেই খবর এসে রাজদরবারে পৌঁছিয়ে দিত। বাদশাহও সেই খবর জানতে পারেন।

কথিত আছে, এক আমির তার স্ত্রীর সঙ্গে শুয়ে ছিলেন। তিনি স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসের ইচ্ছা করলেন। কিন্তু স্ত্রী তাকে বাদশাহর মাথার কসম দিয়ে এটা না করতে বললেন। আমির তার কথা মানলেন না। সকালে বাদশাহর দরবারে খবর পৌঁছে গেল এবং বাদশাহ তাকে ডাকালেন। বললেন, তুমি স্ত্রীর সঙ্গে এমনটা করেছ আর এই কারণে তোমাকে হত্যা করা হচ্ছে।

বাদশার একজন ক্রীতদাস ছিল মালিক শাহ। সে থাকতো আইনুল মালিকের কাছে। সে এসে বাদশাহকে আইনুল মালিকের পালিয়ে যাওয়ার খবর দিল। এই খবর শুনে বাদশাহ ভেঙে পড়লেন। ভাবলেন, এবার বুঝি আর কোনো উপায় নেই। কারণ হাতি-ঘোড়া সবই আইনুল মালিকের কাছে। এছাড়া বাদশাহর বাহিনীও বিভিন্ন স্থানে ব্যস্ত ছিল। বাদশাহ রাজধানীতে ফিরে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। সেখানে গিয়ে বাহিনী গঠন করে আইনুল মালিকের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। তিনি এ ব্যাপারে আমিরদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। খুরাসানি ও বিদেশি আমিররা আইনুল মালিককে অনেক ভয় করতেন। কেননা তিনি ছিলেন হিন্দিভাষী আমির। আর হিন্দবাসী বিদেশিদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। কেননা বাদশাহ তাদের ওপর বেশি দয়া-অনুগ্রহ দেখাতেন। এজন্য আমিররা বাদশাহর এই সিদ্ধান্তে সায় দিলেন না। তারা আরজ করলেন, হে আখুন্দে আলম! আপনি রাজধানীতে ফিরে গেলে আইনুল মালিক এটা জেনে যাবেন। এতে তিনি বাহিনী প্রস্তুত করে ফেলবেন এবং চার দিক থেকে লোকেরা এসে তার পাশে জড়ো হবে। উত্তম হলো, এখনই তার ওপর হামলা চালানো হোক। এই পরামর্শ দেন নাসিরুদ্দিন মাতহারুল আওহারী আর অন্যরা সেটা সমর্থন করেন। বাদশাহ তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। আশপাশে যেসব আমির ও সেনা ছিল তাদের কাছে চিঠি পাঠালেন যাতে রাতের মধ্যে তারা এসে জড়ো হয়।

বাদশাহ কৌশল করেন, একশ মানুষ এলে তাদের অভ্যর্থনার জন্য হাজার মানুষ পাঠান। সব মিলিয়ে এগারশ হয়ে বাদশাহর দরবারে হাজির হতো। উদ্দেশ্য হলো, এর দ্বারা শত্রুরা সংখ্যায় অনেক বলে মনে করবে।

বাদশাহ নদের তীর ধরে এগিয়ে চললেন। তার ইচ্ছা ছিল, কনৌজ শহর পেছনে ফেলে তাঁবু ফেলবেন। কেননা কনৌজ ছিল অনেক মজবুত জায়গা। কিন্তু কনৌজ সেখান থেকে তিন মনযিল দূরত্বে। যখন প্রথম মনযিল অতিক্রম করেন তখন তিনি তার বাহিনীকে লড়াইয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। সবাইকে কাতারবদ্ধ করেন। সেনাদের অস্ত্রশস্ত্র তাদের হাতে ছিল। সামনেই দাঁড়ানো ছিল ঘোড়া। বাদশাহর সঙ্গে একটি ছোট তাঁবু ছিল যেখানে তিনি খাবার খেতেন, গোসল সারতেন। বড় ক্যাম্প ছিল এখান থেকে কিছুটা দূরে। বাদশাহ লাগাতার তিন দিন পর্যন্ত নিজের তাঁবুতে বিশ্রাম নেননি এমনকি কোনো ছায়ায় বসেনওনি।

একদিন আমি তাঁবুতে ছিলাম। সাম্বাল নামে আমার এক চাকর জোরে আমাকে ডাকল এবং বাইরে বের হতে বলল। বাইরে বের হওয়ার পর সে বলল, বাদশাহ মাত্র নির্দেশ দিয়েছেন, যার সঙ্গে স্ত্রী বা বাঁদি থাকবে তাকে হত্যা করা হবে। আমার সঙ্গে তখন ক্রীতদাসী ছিল। এটা শুনে আমিররা বাদশাহর কাছে এ ব্যাপারে আরজ করলেন। বাদশাহ বললেন, ক্যাম্পে কোনো নারী থাকতে পারবে না। পরে তিন ক্রোশ দূরত্বে কাম্বিল নামক একটি দুর্গে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এরপর ক্যাম্পে আর কোনো নারী থাকল না। এমনকি বাদশাহর সঙ্গেও কোনো নারী ছিল না। ওই রাত আমরা প্রস্তুতির মধ্যে কাটাই।

পরদিন বাদশাহ তার বাহিনী প্রস্তুত করেন। প্রত্যেক সেনার সঙ্গে সোনা ও অলংকারে সজ্জিত হাতি ছিল। সবাইকে পুরোদমে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। পরদিন রাতও প্রস্তুত হওয়ায় ব্যয় হলো। তৃতীয় দিন জানা গেল, আইনুল মালিক নদ পার হয়ে আসছেন। এটা শুনে বাদশাহর আশঙ্কা হলো, তিনি নদের পাড়ের অন্যান্য আমিরদের সঙ্গে চিঠি চালাচালি করে এসেছেন। বাদশাহ নির্দেশ দিলেন, প্রত্যেক সাথীকে একটি করে ঘোড়া দেওয়া হোক। আমার কাছেও কিছু ঘোড়া এল। আমার সঙ্গে এক ব্যক্তি ছিলেন, তার নাম ছিল মির মিরান কিরমানি। তাকে অনেক বীরপুরুষ হিসেবে মনে করা হতো। তাকে একটি সবুজ রঙের ঘোড়া দিলাম। তিনি ঘোড়ায় চড়ার সঙ্গে

ঘোড়া দৌড়ে পালাতে লাগল। এক পর্যায়ে তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলেন এবং সেখানেই তার মৃত্যু হলো।

বাদশাহ ওই দিন দ্রুত অগ্রসর হন এবং আসরের সময় কানৌজ শহরে পৌঁছে যান। বাদশাহর আশঙ্কা ছিল, আইনুল মালিক আবার তার বাহিনী নিয়ে কানৌজে হামলা করে না বসে। ওই দিন বাদশাহ নিজেই তার বাহিনী পুনর্বিন্যাস করেন। আমি ওই দিন বাহিনীর সামনের অংশে ছিলাম বাদশাহর চাচাতো ভাই ফিরোজের সঙ্গে। আমির গাদা ইবনে মিহনা, সাইয়েদ নাসিরুদ্দিন মাতহার ও খুরাসানের আমিররাও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। বাদশাহ আমাদেরকে তার বিশেষ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আমাদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা আমার কাছাকাছি থেকো, এর মধ্যে মঙ্গল রয়েছে। কেননা আইনুল মালিক গত রাতে তার বাহিনী নিয়ে সামনের অঙ্গে চোরাগোপ্তা হামলা করেন। উযির খাজা জাহাঁও এই অংশে ছিলেন। লোকদের মধ্যে শোরগোল ছড়িয়ে পড়ল। বাদশাহ নির্দেশ দিলেন, কেউ যেন তার জায়গা থেকে না সরে এবং তলোয়ার দ্বারা যেন লড়াই চালিয়ে যায়। বাহিনীর সবাই তলোয়ার হাতে নেয় এবং শত্রুদের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়ে যায়।

বাদশাহ ওই রাতে নিজেদের পরিচয় শনাক্তের জন্য 'দিল্লি' ও 'গযনি' দুটি শব্দ নির্ধারণ করেন। আমাদের বাহিনীর কাউকে পেলে 'দিল্লি' শব্দটি বলা হতো। অপরজন 'গযনি' বলে জবাব দিলে বোঝা যেত সে আমাদের বাহিনীর। অন্যথায় তাকে হত্যার নির্দেশ ছিল। আইনুল মালিক বাদশাহর আস্তানার আশপাশে চোরাগোপ্তা হামলা চালাতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তার পথপ্রদর্শক তাকে ধোঁকা দেয় এবং সে উযিরের আস্তানার কাছে চলে আসে। আইনুল মালিক পথপ্রদর্শককে হত্যা করেন। উযিরের বাহিনীতে অনারবি, তুর্কি ও খুরাসানি অনেক ছিল। যেহেতু তারা ছিল হিন্দুদের শত্রু, এজন্য প্রাণপণে লড়াই করে। আইনুল মালিকের বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি। সকাল হতে না হতেই তাদের সবাই পালিয়ে যায়। মালিক ইবরাহিম তাতারি, যাকে বাদশাহ সিন্ধিলায় হত্যা করেন। সিন্ধিলা হলো আইনুল মালিকের শহরস্থ একটি এলাকা। আইনুল মালিক তাকে সহকারী হিসেবে নিযুক্ত করেন। কুতবুল মালিকের ছেলে দাউদ ও মালিকুত তুজ্জারের ছেলে, যিনি বাদশাহর ঘোড়া ও হাতির তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন, তারাও তার সঙ্গে মিশে গেলেন। দাউদকে আইনুল মালিক নিজের নিরাপত্তারক্ষী নিযুক্ত করেন।

যখন আইনুল মালিক উযিরের বাহিনীর কাছে এসে পৌঁছলেন তখন দাউদ বাদশাহকে উদ্দেশ্য করে খুব বাজে ভাষায় গালিগালাজ করছিলেন। বাদশাহ এগুলো শোনেন এবং দাউদের আওয়াজ শনাক্ত করতে পারেন। যখন আইনুল মালিকের বাহিনী পরাজিত হলো তখন তিনি তার সহকারী ইবরাহিমকে ডেকে বললেন, হে ইবরাহিম! তুমি মত দিলে আমি পালিয়ে বাঁচতে চাই। ইবরাহিম তার সাথীসঙ্গীদের বলেন, যখন খোদ আইনুল মালিক পালাতে চাইবেন আমি নিজে তার কলার চেপে ধরব। আর যখন আমি কলার চেপে ধরব তখন তোমরা চাবুক মেরে তার ঘোড়াকে তাড়িয়ে দেবে। এরপর আমি তাকে ধরে বাদশাহর কাছে নিয়ে যাব। হয়ত এই সেবার কারণে বাদশাহ আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারেন। যখন আইনুল মালিক পালানোর ইচ্ছা করলেন তখন ইবরাহিম তাকে বললেন, সুলতান আলাউদ্দিন! আপনি কই যাচ্ছেন? আইনুল মালিক নিজের উপাধি ধারণ করেছিলেন 'সুলতান আলাউদ্দিন'। এরপর ইবরাহিম তার কলার চেপে ধরলেন। আর তার সাথীসঙ্গীরা চাবুক মেরে আইনুল মালিকের ঘোড়াকে তাড়িয়ে দিলেন। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। ইবরাহিম তাকে ধরে উযিরের কাছে নিয়ে গেলেন।

আমি সকাল বেলা সুলতানের সামনে পেশ করা হাতি ও পতাকা দেখছিলাম। এর মধ্যে কোনো ইরাকি এসে বললেন, আইনুল মালিককে ধরে আনা হয়েছে। প্রথমে আমার বিশ্বাস হলো না। কিছু দূর যাওয়ার পর মালিক তৈমুর শরবদার এলেন। তিনি আমাকে হাত ধরে বললেন, মোবারকবাদ, আইনুল মালিক ধরা পড়েছে। সে এখন উযিরের কাছে আছে। এটা শুনে বাদশাহর বাহিনী আইনুল মালিকের ক্যাম্পের দিকে গেল এবং সেখানে লুটপাট চালালো। আইনুল মালিকের অনেক সেনা নদীতে ঝাঁপ দিলো এবং ডুবে গেল। কুতবুল আলম ও মালিক তুজ্জারের ছেলে উভয়েই ধরা পড়ল।

বাদশাহ ওই দিন নদীর ঘাটে ক্যাম্প স্থাপন করেন। উযির যখন আইনুল মালিককে নিয়ে এলেন তখন তিনি একটি গরুর ওপর সওয়ার ছিলেন এবং তার শরীর ছিল নগ্ন। একটি পুরনো কাপড়ের নেংটি দ্বারা কোনো রকম লজ্জাস্থান ঢাকা ছিল। আর এই নেংটিই গর্দানের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। উযির আইনুল মালিককে এনে বাদশাহর ক্যাম্পের দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে রাখেন এবং নিজে বাদশাহর কাছে যান। বাদশাহ তাকে শরবত পান করতে দেন। আমিরদের ছেলেরা আইনুল মালিকের কাছে আসছে আর

তাকে গালিগালাজ করছে। তার চেহারায় থুতুও নিক্ষেপ করছে। বাদশাহ তার কাছে মালিক কাবিরকে পাঠালেন এবং তাকে বলা হলো, তুমি এটা করেছ। কিন্তু তিনি কোনো জবাব দিলেন না। বাদশাহ নির্দেশ দিলেন তাকে দরিদ্র মানুষদের মতো কাপড় পরাও এবং পায়ে চারটি বেড়ি লাগাও। এরপর হাত দুটি গর্দানের সঙ্গে বেঁধে উযিরকে সোপর্দ করা হলো।

আইনুল মালিকের ভাই নদীর তীর ধরে পালিয়ে গেলেন এবং উদ শহরে পৌঁছে নিজের সন্তানাদি ও ধনসম্পদ থেকে যতটুকু সম্ভব নিয়ে নেন। তিনি তার ভাই আইনুল মালিকের স্ত্রীকে বললেন, তুমিও সন্তানাদি ও ধনসম্পদ নিয়ে আমার সঙ্গে চলো। তিনি জবাবে বললেন, আমি কি একজন হিন্দু নারীর চেয়েও নিকৃষ্ট! একজন হিন্দু নারীও তো তার স্বামীর সঙ্গে সহমরণ বেছে নেয়। আমার স্বামী মারা গেলে আমিও মরব, আর জীবিত থাকলে আমিও থাকব। এই কথা যখন বাদশাহ জানতে পারলেন তখন তিনি খুব খুশি হলেন এবং ওই নারীর ওপর দয়া পরবশ হলেন।

সুহাইল নামে এক ব্যক্তি আইনুল মালিকের ভাই নাসরুল্লাহকে ধরে হত্যা করেন। পরে তার কাটা মাথা বাদশাহর সামনে হাজির করেন। আইনুল মালিকের স্ত্রী ও বোনকেও বাদশাহর সামনে নিয়ে আসেন। বাদশাহ তাদেরকেও উযিরের কাছে সোপর্দ করেন এবং তাদের জন্য আইনুল মালিকের তাঁবুর পাশে একটি তাঁবুর ব্যবস্থা করে দেন। আইনুল মালিক তাদের কাছে আসতেন, কিছু সময় কাটাতেন এরপর আবার বন্দিশালায় চলে যেতেন। বিজয়ের দিন আসরের সময় বাদশাহ নির্দেশ দিলেন তাদের সঙ্গে যেসব ক্রীতদাস ও নিম্নশ্রেণির লোকদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের ছেড়ে দাও। মালিক ইবরাহিম বহঙ্গিকেও বাদশাহর সামনে হাজির করা হয়। সেনাপতি মালিক বাগরা বললেন, হে আখুন্দে আলম! তাকে হত্যা করা উচিত। তিনিও বিদ্রোহ করেছিলেন। উযির বললেন, আইনুল মালিককে গ্রেফতার করার দ্বারা তার অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। বাদশাহও তার অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন। তাকে নিজের জায়গিরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

মাগরিবের পর বাদশাহ কাঠের তৈরি দুর্গে বসলেন এবং আইনুল মালিকের সাথীসঙ্গী বিশিষ্ট ৬২ জনকে বাদশাহর সামনে হাজির করা হলো। তাদেরকে হাতির সামনে পেশ করা হলো। কাউকে হাতি ধারালো দাঁত দ্বারা কামড়ে

টুকরো টুকরো করল। কাউকে ওপরে তুলে মাটিতে ছুড়ে মারল। সেই সময় বাদ্যযন্ত্র বাজছিল। আইনুল মালিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখছিলেন। সাথীসঙ্গীদের টুকরোগুলো তার সামনে ফেলা হচ্ছিল। পরে তাকে নিজের বন্দিশালায় নিয়ে যাওয়া হয়। মানুষের সংখ্যা বেশি এবং নৌকার সংখ্যা কম হওয়ায় বাদশাহ নদীর তীরে অবস্থান করেন। বাদশাহর আসবাবপত্র ও ধনভান্ডার হাতি দ্বারা পারাপার করা হলো। কিছু হাতি বাদশাহর বিশেষ আমিরদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হলো। তাদের আসবাবপত্র হাতির পিঠে তুলে নদী পার করা হলো। আমার কাছেও একটি হাতি পাঠানো হলো। আমি আমার আসবাবপত্র হাতি দ্বারা নদী পার করলাম।

পরে বাদশাহ বাহরাইজের[১] দিকে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। এটি একটি মনোরম শহর, যা সারযূ নদীর তীরে অবস্থিত। সারযূ একটি বড় নদী, যার পার ভাঙতে থাকতো। বাদশাহ শায়খ সালার মাসউদের[২] কবর যিয়ারতের জন্য নদী পার হলেন। শায়খ সালার এই অঞ্চলের বেশির ভাগ এলাকা জয় করেন। তার ব্যাপারে বিস্ময়কর বিভিন্ন ঘটনা লোকমুখে প্রচলিত। একসঙ্গে নদী পার হতে গিয়ে অনেক ভিড় হলো। একটি নৌকা দুই তিনশ মানুষসহ ডুবে গেল। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন আরবি, যিনি আমির গাদার সঙ্গী ছিলেন, তিনি বেঁচে যান।

আমরা একটি ছোট নৌকায় ছিলাম। এ কারণে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করেন। ওই আরবি যিনি ডুবতে ডুবতে বেঁচে গিয়েছিলেন তার নাম ছিল সালাম। তার ইচ্ছা ছিল আমাদের নৌকায় আরোহণ করা। কিন্তু আমাদের নৌকাটি একটু আগে ছেড়ে যায়। এ কারণে তিনি বড় নৌকায় আরোহণ করেন, যা ডুবে যায়। তিনি যখন নদী থেকে তীরে উঠতে সক্ষম হন তখন অনেকেই মনে করল আমাদের নৌকাটি ডুবে গেছে, এজন্য আমাদের সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে শোরগোল পড়ে গেল। তারা ভাবল আমরাও ডুবে গেছি। কিন্তু তারা যখন আমাদেরকে সহিহ-সালামতে আসতে দেখলেন তখন সবাই খুশি হলেন এবং মোবারকবাদ জানালেন। পরে আমরা শায়খ সালারের কবর যিয়ারত করি। তার মাজার একটি দুর্গের ভেতর। ভিড়ের কারণে আমরা এর

---

[১] উদ প্রদেশের একটি মনোরম ও সবুজাভ শহর।

[২] সেনাপতি মাসউদ গাজি ছিলেন সুলতান মাহমুদ গযনবির ভাতিজা। তিনি অনেক বড় বুযুর্গ ছিলেন। তার মাজার আজও শুধু মুসলমানই নয়, হিন্দুদেরও ভক্তি ও শ্রদ্ধার কেন্দ্র।

ভেতরে ঢুকতে পারলাম না। এর পাশে একটি বাঁশের জঙ্গলে ঢুকলাম। সেখানে আমরা গন্ডার দেখতে পেলাম। লোকেরা এই প্রাণীটি শিকার করল। এটি দেখতে অনেকটা হাতির মতো। তবে এর মাথা হাতির চেয়ে কয়েক গুণ বড়। আইনুল মালিককে পরাজিত করার আড়াই বছর পর বাদশাহ দিল্লিতে ফিরলেন। আইনুল মালিকের অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন। নুসরত খান যিনি তেলেঙ্গানা অঞ্চলে বিদ্রোহ করেছিলেন তাকেও ক্ষমা করে দিলেন। বাদশাহ তাদের দুজনকে নিজের বাগানগুলোর তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত করলেন। তাদেরকে খিলআত (বিশেষ রাজকীয় পোশাক) ও বাহন উপহার দেন। আর তাদের জন্য সরকারি গুদাম থেকে রেশন নির্ধারণ করে দেন।[১]

আলী শাহের দুর্ভাগ্য

এরপর খবর এল, কাতলু খানের সঙ্গী আলী শাহ কর (অর্থাৎ বাহরা) বাদশাহর বিদ্রোহী হয়েছেন। এই ব্যক্তি খুবই সুদর্শন, বাহাদুর ও সচ্চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি বদরকুট দখল করে সেটাকে রাজধানী ঘোষণা করেন। বাদশাহ তার উস্তাদকে (কাতলু খান) আলী শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন।

কাতলু খান নিজের সঙ্গে একটি বড় বাহিনী নিলেন এবং বদরকুট অবরোধ করলেন। দুর্গের নিচ দিয়ে সুরঙ্গ করলেন। যখন আলী শাহ অনেক প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে গেলেন তখন নিরাপত্তা প্রার্থনা করলেন। তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হলো এবং বাদশাহর কাছে বন্দিশালায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। বাদশাহ তার ভুল ক্ষমা করে দেন এবং গযনি শহরের দিকে তাকে দেশান্তর করেন। সেখানে তিনি কিছুদিন অবস্থান করেন। এরপর দেশে ফেরার বাসনা দেখা দেয়। মূলত মৃত্যু দরজায় কড়া নাড়ে বলেই তিনি ফিরে আসার চেষ্টা করেন। তাকে সিন্ধে আটক করা হয়। পরে বাদশাহর সামনে হাজির করা হয়। বাদশাহ বললেন, তুমি আমার রাষ্ট্রে আবার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য এসেছ। তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং তাই করা হলো।

---

[১] তুঘলকের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়, যা ঐতিহাসিক ফেরেশতাও বর্ণনা করেছেন যে, আইনুল মালিক অন্যদের দ্বারা প্ররোচিত হয়েছিলেন। অন্যথায় তিনি প্রকৃতিগতভাবে খারাপ ছিলেন না। তিনি বাদশাহর খেদমত অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে আঞ্জাম দেন। এজন্য এত বড় অপরাধ সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করে দেন এবং পুনরায় আগের অবস্থান ফিরিয়ে দেন।

বিদ্রোহীর পদোন্নতি, আমির বখত শারফুল মুলকের কাহিনি

বাদশাহ একবার আমির বখত শারফুল মুলকের ওপর রুষ্ট হলেন। তিনি ওই ব্যক্তিদের একজন যারা আমাদের সঙ্গে বাদশাহর দরবারে এসেছিলেন। বাদশাহ তার ভাতা চল্লিশ হাজার এক হাজারে নামিয়ে আনেন। আর তাকে উযিরের কাছে দিল্লিতে পাঠিয়ে দিলেন। ঘটনাক্রমে আমির আবদুল্লাহ হেরাতি অসুস্থ হয়ে তেলেঙ্গানায় মারা যান। তার ধনসম্পদ সাথীসঙ্গীদের কাছে দিল্লিতে ছিল। তারা আমির বখতের সঙ্গে পালানোর ষড়যন্ত্র করল। যখন উযির বাদশাহকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দিল্লি থেকে বের হলেন তখন এই লোকেরা আমির বখতের সঙ্গে পালিয়ে গেলেন। চল্লিশ দিনের পথ সাত দিনে অতিক্রম করে সিন্ধে পৌঁছে যান। তাদের সঙ্গে অনেক উন্নতমানের ঘোড়া ছিল। তারা ইচ্ছা করলেন সিন্ধু নদ সাঁতরে পার হয়ে যাবেন।

আমির বখত, তার ছেলে এবং তাদের সঙ্গী-সাথীরা ভালো সাঁতার জানতেন না। তারা বাঁশের তৈরি ভেলায় চড়ে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সাঁতার কাটতে গিয়ে তারা ভয় পেয়ে গেলেন। তারা দুই ব্যক্তিকে উচের গভর্নর জালালুদ্দিনের কাছে পাঠালেন। তারা গিয়ে জালালুদ্দিনকে বললেন, কয়েকজন সওদাগর নদী পার হতে চাচ্ছেন। তারা এই অলংকারগুলো আপনাকে বিনিময় হিসেবে দিয়েছেন যাতে আপনি তাদেরকে নদী পার হওয়ার অনুমতি দেন। আমির সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলেন এমন অলংকার তো সওদাগরদের কাছে থাকতে পারে না। তিনি এই দুই ব্যক্তিকে আটকে রাখার নির্দেশ দিলেন। তাদের মধ্য থেকে একজন পালিয়ে শারফুল মুলকের কাছে এলেন। তিনি ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হওয়ার কারণে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তিনি এই খবর পেয়ে দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। এদিকে জালালুদ্দিন নির্দেশ দিলেন, যে ব্যক্তিকে ধরা হয়েছে তাকে কঠিনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক। সুতরাং তিনি শারফুল মুলকের কথা সব বলে দিলেন। জালালুদ্দিন তার সহযোগীকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন বাহিনী নিয়ে শারফুল মুলক ও তার সঙ্গীদের ধরতে যান। যখন তারা সেই জায়গায় পৌঁছলেন তখন জানতে পারলেন তারা এখান থেকে পালিয়ে গেছেন। কিন্তু এক পর্যায়ে তাদের পেয়ে গেলেন। জালালুদ্দিনের বাহিনী তির নিক্ষেপ করতে থাকল। শারফুল মুলকের ছেলে তাহেরের এক পাশে সেই তির গিয়ে লাগল। জালালুদ্দিনের

সহযোগী তাকে চিনতে পেরে ধরে ফেললেন। তাদেরকে ধরে জালালুদ্দিনের কাছে আনা হলো। তাদের সবার পায়ে বেড়ি পরানো হলো এবং হাত বাঁধা হলো। এরপর জালালুদ্দিন তাদের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেবেন তা জানতে উযিরের কাছে চিঠি লিখলেন।

উযির জবাব পাঠালেন তাদের যেন রাজধানীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জালালুদ্দিন তাদের রাজধানীতে পাঠিয়ে দিলেন এবং তাদের কারাগারে বন্দি করা হয়। তাহের বন্দি থাকা অবস্থায় মারা যান। এক পর্যায়ে বাদশাহ নির্দেশ দিলেন শারফুল মুলককে যেন প্রতিদিন একশটি দোররা মারা হয়। এত মারপিটের পরও তিনি জীবিত থাকলেন। অবশেষে বাদশাহ তার অপরাধ ক্ষমা করে দেন। তাকে আমির নেযামুদ্দিনের সঙ্গে চান্দিরির দিকে পাঠান। তাকে মর্যাদা এতটা কমিয়ে দেওয়া হয় যে, বাহনের জন্য কোনো ঘোড়াও ছিল না। তিনি গরুর ওপর আরোহণ করতেন। অনেক দিন পর্যন্ত এই অবস্থায় চলে। এক পর্যায়ে আমির নেযামুদ্দিন বাদশাহর কাছে কিছু লোক পাঠান, তাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। বাদশাহ তাকে নিজের কর্মচারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। তার দায়িত্ব ছিল বাদশাহ যখন খাবার খেতে বসবেন তখন গোশত টুকরো টুকরো করে বাদশাহর দস্তরখানে পেশ করা। খাবার নিয়ে তিনি বাদশাহর সামনে হাজির হতেন। শেষ পর্যন্ত বাদশাহ তার মর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দেন। এমনকি তিনি যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন তার খোঁজখবর নিতে বাদশাহ নিজে হাজির হন। তার ওজন সমপরিমাণ স্বর্ণ তাকে হাদিয়া হিসেবে দেন। আমি এই ঘটনা প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করেছি। এরপর নিজের বোনকে তার সঙ্গে বিয়ে দেন এবং তাকে চান্দিরির গভর্নর নিযুক্ত করেন। আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তর পরিবর্তনশীল, তিনি কখন যে কীভাবে তা পাল্টে দেন তা বলা মুশকিল!

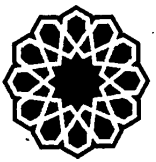

ইবনে বতুতা ও তুঘলক

পর্যটকের ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও প্রতিক্রিয়া

বাদশাহর পক্ষ থেকে মুসাফিরের সম্মান ও মূল্যায়ন

হাজার স্তম্ভের মহলে আমার প্রবেশ

এতক্ষণ আমি যা কিছু আলোচনা করেছি সেটা হয়ত অতীতের সুলতানদের কিচ্ছা-কাহিনি কিংবা মুহাম্মাদ তুঘলকের যুগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি। যা আলোচনা করেছি যথেষ্ট হয়েছে।

এবার আমি প্রকৃত বিষয় অর্থাৎ ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও অনুভূতি প্রকাশ করব। সামনের আলোচনায় আমার রাজধানীতে পৌঁছা, বাদশাহর চাকরিতে ঢোকা এবং চাকরি ছেড়ে দেওয়া, বাদশাহর পক্ষ থেকে চীনের দূত হিসেবে গমন এবং চীন থেকে নিজ দেশে ফিরে আসার ঘটনাগুলো স্থান পাবে।

যখন আমি রাজধানী দিল্লিতে প্রবেশ করি তখন শাহি মহলের দিকে যাই এবং প্রথম দরজা দিয়ে ঢুকি। এর দ্বিতীয় দরজা, পরে তৃতীয়টি অতিক্রম করি। তৃতীয় দরজায় নকিব দাঁড়িয়ে ছিলেন, যার কথা পেছনে আলোচনা করেছি। এক নকিব আমাকে প্রশস্ত একটি বারান্দায় নিয়ে গেলেন। সেখানে উযির খাজা জাহাঁ আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সর্বপ্রথম খোদাওয়ান্দজাদা জিয়াউদ্দিন, এর পেছনে তার ভাই কাওয়ামুদ্দিন, এরপর আরেক ভাই ইমাদুদ্দিন। তার পেছনে আমি, আমার পেছনে তার ভাই বোরহানুদ্দিন। এরপর আমির মুবারক সমরকন্দি, তার পেছনে আরনি বাগা তুর্কি। এরপর মালিকজাদা খোদাওয়ান্দের ভাতিজা। পরে বদরুদ্দিন কাফফাল। এই ধারাবাহিকতায় আমরা প্রবেশ করি। যখন আমরা তৃতীয় দরজার ভেতরে প্রবেশ করি সেখানে দেখতে পেলাম বড় একটি বিচারালয়, যার নাম হাজার স্তম্ভের মহল। সেখানে বসে বাদশাহ সর্বসাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন।

সেখানে পৌঁছার পর উযির আমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন। তিনি সম্মান জানাতে গিয়ে এত বেশি ঝুঁকে পড়েন যে, প্রায় মাটিতে লেগে যায় তার কপাল। আমরাও সম্মান প্রদর্শন করি। তবে আমরা রুকু পরিমাণ ঝুঁকি। যদিও আমাদের আঙুলগুলো মাটিতে পৌঁছে যায়। এই সম্মান ছিল বাদশাহর সিংহাসনের প্রতি। আমাদের সঙ্গে যেসব লোক ছিলেন তারাও সম্মান প্রদর্শন করেন। যখন আমরা সম্মান প্রদর্শন শেষ করি তখন সুবেদাররা উঁচু আওয়াজে বিসমিল্লাহ পাঠ করে। এরপর আমরা বাইরে বেরিয়ে আসি।

বাদশাহর মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং সম্মান প্রদর্শন

বাদশাহর মাকে মাখদুমা জাহাঁ বলা হতো। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধা ছিলেন। দান-খয়রাত অনেক করতেন। অনেক খানকা ছিল তার নির্মিত। সেখানে মুসাফিরদের খাওয়াদাওয়ার সুযোগ ছিল। তিনি চোখে দেখতেন না। এর কারণ হিসেবে বলা হলো, যখন তার ছেলে বাদশাহ হলেন তখন তার কাছে বাদশাহর সব বেগম এবং আমিরদের স্ত্রীরা রং-বেরঙের কাপড় পরে এলেন। তিনি একটি সোনার সিংহাসনে বসা ছিলেন, যা নানা ধরনের মণি-মুক্তা দ্বারা সজ্জিত ছিল। চকমকে উজ্জ্বলতায় ওই সময় তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। এরপর নানা চিকিৎসা করা হয়, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি আর ফিরে আসেনি। বাদশাহ তাকে অসম্ভব রকম মর্যাদা দিতেন। বলা হয়ে থাকে, একবার তিনি বাদশাহর সঙ্গে সফরে গেলেন। বাদশাহ কিছুদিন আগে চলে আসেন। তিনি যখন রাজধানীতে ফিরেন তখন বাদশাহ তাকে স্বাগত জানানোর জন্য অনেকদূর এগিয়ে আসেন। বাদশাহ ঘোড়া থেকে নেমে যান এবং মায়ের পায়ে চুমু খান, যিনি পালকিতে বসা ছিলেন। চমৎকার সেই দৃশ্যটি সবাই উপভোগ করছিল।

এবার আমাদের মূল কথায় আসি। আমরা যখন বাদশাহর প্রাসাদ থেকে বের হই তখন উযিরসহ রাজমহলের সবাই গেইট পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিয়ে যান। মাখদুমা জাহাঁ এখানেই থাকতেন। আমরা যখন দরজায় পৌঁছি তখন বাহন থেকে নেমে যাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী মাখদুমা জাহাঁর জন্য উপহার নিয়ে এসেছিলেন। আমাদের সঙ্গে প্রধান বিচারপতি কামালুদ্দিন ইবনে বোরহানুদ্দিন ছিলেন। উযির ও কাজি মাখদুমা জাহাঁর দরজার কাছে গিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন। আমরাও সেভাবে সম্মান প্রদর্শন করি। দরজায় অবস্থানরত একজন মুনশি আমাদের আনা উপহারগুলো তালিকাভুক্ত করেন। এরপর কিছু যুবক এল। তাদের মধ্যে যে বড় সে উযিরের দিকে এগিয়ে গেল এবং তার সঙ্গে চুপিচুপি কিছু কথা বলল এবং রাজমহলের দিকে চলে গেল। এরপর একটি দালানে আমাদের বসতে বলা হলো। সেখানে খাবার এল। এরপর স্বর্ণের একটি পাত্র আনা হলো, যার নাম 'সিন'। এটি অনেকটা ডেগের মতো। এরপর পেয়ালা, প্লেট ও লুটা আনা হলো। সবই সোনার তৈরি। দস্তরখান বিছানো হলো। প্রত্যেক দস্তরখানে দুটি করে সারি ছিল। প্রত্যেক সারির প্রথম দিকে এমন একজন বসতেন যিনি মেহমানদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে প্রথমে। আমরা যখন

খাবারের জন্য সামনে অগ্রসর হলাম তখন নিরাপত্তা প্রহরী ও নকিবরা আমাদের সম্মান জানালেন। আমরাও সম্মান প্রদর্শন করলাম। প্রথমে শরবত আনা হলো। শরবত পান শেষ হওয়ার পর প্রহরীরা বিসমিল্লাহ বলল। তখন আমরা খাবার শুরু করি।

খাবার শেষ হওয়ার পর নবিজ (পানীয়) আনা হলো, এরপর পান। যখন প্রহরীরা বিসমিল্লাহ বলল আমরা সবাই সম্মান প্রদর্শন করলাম। এরপর আমাদের ডেকে আরেকটি জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে আমাদের সম্মানজনক শাহি পোশাক দেওয়া হলো। এরপর আমরা রাজপ্রাসাদের দরজা পর্যন্ত আসি। সেখানে সবাই আমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। প্রহরীরা বিসমিল্লাহ বলল। উযির দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম। পরে মহলের ভেতর থেকে রেশম ও তুলার সেলাইহীন কাপড় আনা হলো। সেগুলো আমাদের প্রত্যেককে দেওয়া হলো। এরপর একটি স্বর্ণের পাত্র আনা হলো, যার মধ্যে শুকনো ফলফ্রুট ছিল। আরেকটি পাত্রে গোলাব, আরেকটিতে ছিল পান। এখানকার নিয়ম হলো, যার জন্য এসব জিনিস আনা হয়েছে, তার হাতে এই পাত্রটি দেওয়া হয়। তিনি এই পাত্রটি এক হাত দিয়ে ধরে আরেক হাত দিয়ে মাটি স্পর্শ করেন। উযির সেই পাত্রটি নিজ হাতে নিলেন। আমরা কীভাবে পাত্রটি নেব সেটা তিনি বলে দিলেন। সুতরাং আমরা তাই করলাম। এরপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো ওই ঘরে যেখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই জায়গাটি ছিল শহরে যাওয়ার রাস্তায় পালম দরজার কাছে। যখন আমরা সেই ঘরে পৌঁছলাম তখন প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র যেমন বিছানা, বালিশ, প্লেট, চৌকি সব প্রস্তুত দেখলাম। হিন্দুস্তানের চৌকিগুলো একটু হালকা হয়ে থাকে। তাতে একজন মানুষ চড়তে পারে এবং সফরের সময় সেই চৌকি নিজের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারে। একটি বিশেষ ধরনের চৌকি আছে যাতে দৈর্ঘ্যে-প্রস্তে চারটি কাঠ বাঁধা হয়। এটি রেশম বা সুতলি দ্বারা বানানো। যখন এতে কেউ ঘুমায় তখন ভেজানোর প্রয়োজন পড়ে না, কেননা এটি নিজে নিজেই ঠান্ডা থাকে।

চৌকির সঙ্গে দুটি গদি, দুটি বালিশ এবং একটি বিছানা আনা হয়। সবগুলোই রেশমের তৈরি। এখানকার নিয়ম হলো, গদি কিংবা বালিশের ওপরে সাদা কাপড়ের গিলাফ থাকে। এর দ্বারা ভেতরের অংশ ময়লা হয় না। এরপর আমাদের কাছে দুই ব্যক্তিকে আনা হলো। একজন আটাওয়ালা, যাকে খাররাস বলা হয়; অপরজন গোশতওয়ালা, যাকে কাসসাব বলা হয়।

এরপর আমাদের নির্দেশ দেওয়া হলো, এই দুজনের কাছ থেকে এই পরিমাণ আটা এবং এই পরিমাণ গোশত নিয়ে নাও। সেই পরিমাণটা আমার মনে পড়ছে না। সেখানকার নিয়ম হলো, আটা ও গোশত আমরা ওজন দিতাম। এই মেহমানদারি ছিল বাদশাহর মায়ের পক্ষ থেকে। পরবর্তী সময়ে বাদশাহর পক্ষ থেকে মেহমানদারি শুরু হয়। সেই আলোচনা সামনে আসবে।

শাহি মেহমান হিসেবে

আমার মেয়ের ইন্তেকাল, ঈদ উৎসব

দ্বিতীয় দিন আমরা রাজমহলে ঢুকি এবং উযিরকে সালাম করি। উযির আমাকে হাজার দিনারের দুটি থলি দেন আর বলেন, এগুলো আপনাদের খরচ নির্বাহের জন্য। এরপর তিনি আমাকে রেশমের তৈরি একটি খিলআত (শাহি পোশাক) দেন। পরে তিনি আমাদের সাথীসঙ্গী, ক্রীতদাস ও খাদেমদের নাম লিখেন। তাদের চারটি স্তরে বিন্যাস করেন। প্রথম স্তরের প্রত্যেককে দুশ দিনার করে দেন। দ্বিতীয় স্তরের লোকদের দেড়শ দিনার করে দেন। তৃতীয় স্তরের লোকদের একশ দিনার এবং চতুর্থ স্তরের লোকদের পঁচাত্তর দিনার করে দেন। আমার সঙ্গে সর্বমোট চল্লিশজন ছিলেন। তাদের সবাইকে প্রায় চার হাজার দিনার দিরহাম দেওয়া হয়।

এরপর বাদশাহর পক্ষ থেকে (যিনি তখন দিল্লিতে ছিলেন না) মেহমানদারির নির্দেশ এল। এক হাজার রতল (একটি পরিমাপ) আটা এবং এক হাজার রতল গোশত এল। এর মধ্যে এক তৃতীয়াংশ ছিল ময়দা এবং বাকি দুই তৃতীয়াংশ ছিল আটা। চিনি, ঘি ও সুপারি এল কয়েক রতল। সেগুলোর পরিমাণ মনে পড়ছে না। কয়েক হাজার পাতা পান এল। হিন্দুস্তানি রতল পশ্চিমা রতলের ২০ গুণ বড়। মিশরের ২৫ রতলের সমান। খোদাওয়ান্দজাদার মেহমানদারিতে চার হাজার রতল আটা, সমপরিমাণ গোশত এবং আনুসঙ্গিক দ্রব্যাদি আনা হলো।

আমার এখানে আসার দেড় মাস কেটে যাওয়ার পর আমার এক মেয়ে, যার বয়স ছিল এক বছরেরও কম, সে মারা যায়। এই খবর প্রথমে উযিরের কাছে পৌঁছে। তিনি নির্দেশ দিলেন পালম দরজার বাইরে শায়খ ইবরাহিম কাওনবির খানকার পাশে যেন তাকে দাফন করা হয়।

উযির বাদশাহকে এই খবর চিঠি দিয়ে জানালেন। বাদশাহর ফিরতি পত্র পরদিন সন্ধ্যায় এসে পৌছায়। যদিও বাদশাহ সেখান থেকে দশ মনযিল দূরত্বে ছিলেন। এখানকার নিয়ম হলো, মৃত্যুর তৃতীয় দিন সকাল সকাল মৃতকে দাফন করা হয়। আর কবরের আশপাশে রেশমি কাপড় ও গদি বিছানো হয় এবং কবরের ওপর ফুল দেওয়া হয়। এই ফুল প্রত্যেক ঋতুতেই পাওয়া যায়। যেমন চম্পা, ইয়াসমিন, গিলি, চামেলি ফুল ইত্যাদি। লেবুর পাতাসহ ডালও কবরের ওপর রাখা হতো। সবাই কালামুল্লাহ এনে তা পাঠ করত। যখন কালামুল্লাহ পাঠ সম্পন্ন হতো তখন সবাইকে গোলাবের পানি পান করানো হতো এবং তা ছিটিয়ে দেওয়া হতো। সেখানে সবাইকে পানও দেওয়া হতো। এরপর লোকেরা চলে যেত।

তৃতীয় দিন যথারীতি আমরা বের হলাম এবং আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সবকিছু যোগাড় করলাম। পরে জানা গেল, উযির সবকিছু যোগাড় করে রেখেছেন। কবরের ওপর ছায়ার ব্যবস্থাও করেছেন। হাজিব শামসুদ্দিন নোশেনজি যিনি আমাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সিন্ধে গিয়েছিলেন, কাজি নেজামুদ্দিন কারওয়ানি এবং শহরের বিশিষ্টজনেরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমার আসার আগে এই লোকেরা সবাই বসা ছিলেন। আর হাজিব ছিলেন সামনে দাঁড়ানো। তিনি কুরআন পড়ছিলেন। আমিও সাথীসঙ্গীদের সঙ্গে কবরের পাশে বসে গেলাম। কারীরা সুকণ্ঠে তেলাওয়াত করছিলেন। পরে কাজি দাঁড়ালেন এবং শোকগাথা পাঠ করলেন এবং বাদশাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন। যখন বাদশাহর নাম নেওয়া হলো তখন সবাই দাঁড়িয়ে গেলেন। সবাই সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং তার সামনে বসে গেলেন। এরপর কাজি দোয়া চাইলেন। হাজিব ও তার সাথীসঙ্গীরা গোলাবের বোতল নিয়ে সবার ওপর তা ছিটিয়ে দিতে লাগলেন। এরপর সবাইকে মিশরীয় শরবত পান করানো হলো। সবার মধ্যে পান বিতরণ করা হলো। পরে আমাকে এবং আমার সাথীসঙ্গীদের এগারোটি খিলআত দেওয়া হলো। হাজিব বাহনে চড়ে রাজপ্রাসাদে গেলেন এবং আমরাও তার সঙ্গে গেলাম। রাজ সিংহাসনের পাশে পৌঁছে যথারীতি সবাই সম্মান প্রদর্শন করি।

পরে আমি আমার ঘরে চলে আসি। এখানে এসে জানতে পারি এ দিনের খাবার বাদশাহর মায়ের মহল থেকে এসেছে। তিনি সবাইকে খাইয়েছেন এবং গরিবদের মধ্যে খাবার বিতরণ করেছেন। এরপরও অনেক রুটি, হালুয়া ও মিষ্টান্ন থেকে যায়। যা কয়েক দিন পর্যন্ত পড়ে থাকে। এর সবই

বাদশাহর নির্দেশে করা হয়। কিছুদিন পর মাখদুমা জাহাঁ অর্থাৎ বাদশাহর মায়ের ঘর থেকে একটি পালকি এল। এখানকার সম্ভ্রান্ত নারীরা পালকিতে চলাফেরা করত। অনেক সময় পুরুষেরাও এতে চড়ত। এটি অনেকটা চৌকির মতো। রেশম বা তুলার রশি দ্বারা বাঁধা হতো। এর ওপরে একটি বাঁশ বাঁধা থাকত, যার দুই পাশে লোকেরা কাঁধে নিয়ে এটি বহন করত। এর জন্য আটজন নিযুক্ত থাকত। চারজন এটি বহন করত এবং চারজন বিশ্রাম নিত। এই পালকি হিন্দুস্তানে সেই কাজে আসে মিশরে যা গাধা দ্বারা করা হয়। বেশিরভাগ লোকের রুটি-রুজির ব্যবস্থা হয় এর দ্বারা। যাদের ক্রীতদাস থাকে তারা এই পালকি বহন করে। আর ক্রীতদাস না থাকলে ভাড়ায় লোক আনা হতো, শহরে যাদের পাওয়া যেত। রাজপ্রাসাদের সামনে কিংবা লোকদের দরজায় এসে তারা দাঁড়িয়ে থাকত, যাতে কেউ চাইলে তাদের নিতে পারে। নারীদের পালকিতে রেশমের কাপড় টানানো থাকত। বাদশাহর মায়ের ঘর থেকে তার ক্রীতদাসরা যে পালকি নিয়ে আসে সেটাতেও রেশমের কাপড় ঝুলানো ছিল। সেই পালকিতে আমার স্ত্রী, যার সন্তান মারা গেছে, যাকে বসানো হলো। আমি তার সঙ্গে একজন তুর্কি বাঁদি উপহার হিসেবে পাঠালাম। রাতে আমার বেগম বাদশাহর মায়ের কাছে রইলেন। পরদিন ফিরে এলেন। তাকে বাদশাহর মা এক হাজার রুপি, নানা পদের স্বর্ণের অলংকার, দামি কাপড়চোপড় দিয়ে দিলেন। যখন আমার স্ত্রী এসব জিনিস নিয়ে এল আমি আমার বন্ধুবান্ধব ও সওদারগারদের দিয়ে দিলাম, যাদের কাছে আমি ঋণগ্রস্ত ছিলাম। কেননা আমি আমার সম্মান বজায় রাখতে চাচ্ছিলাম। কেননা বার্তাবাহক আমার সব খবর বাদশাহকে লিখে লিখে পাঠাত।

বাদশাহ নির্দেশ দিলেন আমার নামে যেন কিছু গ্রামের জায়গির দিয়ে দেওয়া হয়, যার বার্ষিক আয় পাঁচ হাজার দিনার। উযির এবং রাজদরবারের দায়িত্বশীলেরা আমার নামে বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত জমি জায়গির হিসেবে লিখে দিলেন। এই গ্রামগুলো রাজধানী থেকে ১৬ ক্রোশ দূরত্বে ছিল। সবগুলোই ছিল হিন্দু অধ্যুষিত। একশ গ্রামের সমষ্টিকে 'ছদি' বলা হতো। প্রত্যেক ছদিতে একজন চুতরি (চৌধুরী) থাকতেন। তারা হিন্দুদের মধ্যে বিশিষ্টজন হিসেবে পরিচিত ছিলেন। একজন থাকতেন খাজনা উঠানোর দায়িত্বে। ওই সময় অনেক বিধর্মী নারী লুটের পণ্য হিসেবে আসে। এদের মধ্যে ১০ জন ক্রীতদাসীকে উযির আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। এর মধ্যে একজনকে যে

নিয়ে এসেছে তাকে দিয়ে দিই। কিন্তু তিনি এতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। আমার সাথীসঙ্গীরা এর মধ্যে তিনজন ছোট ছোট বাঁদি নিয়ে নেয়। আর বাকিদের ব্যাপারে কিছু জানি না।

লুটের পণ্য হিসেবে যেসব বাঁদি আসে তারা খুবই অলস প্রকৃতির হয়ে থাকে। কেননা তারা অবহেলিত, সভ্যতার কোনো ছাপ তাদের ওপর পড়ে না। এজন্য এখানে কেউ লুটের পণ্য হিসেবে আসা বাঁদি কেউ কিনে না। হিন্দুস্তানে গোটা দেশে হিন্দুরা মুসলিমদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে। যদিও মুসলিমরা তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। অনেক হিন্দু দুর্গম পাহাড় ও জঙ্গলে বসবাস করে। এই অঞ্চলে বাঁশ অনেক লম্বা হয়ে থাকে। বাঁশের কঞ্চি এত বেশি শক্ত হয় যে, অনেক সময় আগুনও এতে প্রভাব ফেলতে পারে না। এই হিন্দুরা বাঁশের জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে আত্মগোপনে থাকে। বাঁশ তাদের প্রাচীর হিসেবে কাজ করে। বাঁশের জঙ্গলের ভেতরে ক্ষেত-খামারও হয়। বৃষ্টির পানি সেখানে জমা হয়ে থাকে। কেউ বাঁশের জঙ্গল ভেদ না করে তাদের ওপর হামলা করতে পারে না।

এদিকে ঈদুল ফিতর চলে এলো। কিন্তু বাদশাহ এখনো রাজধানীতে ফিরেননি। ঈদের দিন খতিব হাতিতে চড়লেন। হাতির ওপর কাঠের মতো একটি জিনিস বিছানো হলো। সেখানে চারটি স্তম্ভ দাঁড় করানো হলো। খতিব ছিলেন কালো কাপড় পরিহিত। হাতির ওপর আরোহিত খতিবের আগে আগে মুয়াযযিন তাকবির ধ্বনি দিতে দিতে সামনে অগ্রসর হন। শহরের মৌলভি ও কাজিও বাহনে চড়ে ঈদগাহে যান। এদের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য সদকা করার মতো অর্থ এলো, যা তারা ঈদগাহে যেতে যেতে সদকা করে দিলেন। ঈদগাহে কাপড়ের সামিয়ানা টানানো হলো। আর নিচে বিছানো হলো বিছানা। যখন সব মুসল্লি জড়ো হলেন তখন খতিব নামায পড়ালেন এবং খুতবা দিলেন। নামায শেষে সবাই নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেলেন। আমরা রাজপ্রাসাদের দিকে গেলাম। সেখানে আমির ও বিদেশিদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হলো। খাওয়াদাওয়া শেষে আমরা নিজ নিজ ঘরে চলে এলাম।

বাদশাহর আগমন

বাদশাহর শহরে প্রবেশ, দরবারের দৃশ্য, উপহারের বন্যা মুসাফিরের (ইবনে বতুতা) ওপর বাদশাহর যত অনুগ্রহ

সেদিন ছিল শাওয়ালের ৪ তারিখ। বাদশাহ একটি মহলে অবস্থান করেন, যার নাম ছিল তেলপুত, যা রাজধানী থেকে সাত মাইল দূরত্বে অবস্থিত। বাদশাহকে অভ্যর্থনা জানাতে যেতে উযির আমাদের নির্দেশ দিলেন। আমরা সবাই প্রস্তুত হয়ে বাদশাহকে স্বাগত জানাতে গেলাম। প্রত্যেকের কাছে উপহার হিসেবে প্রদানের জন্য ঘোড়া, উট, খুরাসানি ফলফ্রুট, মিশরীয় তলোয়ার, ক্রীতদাস ও তুর্কিস্তানি দুম্বা ছিল।

আমরা যখন মহলের দরজার কাছে পৌঁছলাম তখন দেখলাম সবাই সেখানে জড়ো হচ্ছে। সবাই নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী মহলে ঢুকলেন। সবাইকে সোনা ও হিরাখচিত পোশাক দেওয়া হলো। যখন আমার পালা এলো বাদশাহকে চেয়ারে বসা দেখলাম। আমি ধারণা করলাম, তিনি হয়ত কোনো প্রহরী। কিন্তু যখন সেখানে আমার পরিচিত নাসিরুদ্দিন কাফি হারবিকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম, তখন বুঝতে পারলাম তিনিই হলেন বাদশাহ। প্রহরীরা তাকে সম্মান প্রদর্শন করছেন। আমিও তাকে সম্মান প্রদর্শন করলাম। প্রহরীদের প্রধান যিনি বাদশাহর চাচাতো ভাই ছিলেন[১], আমাকে স্বাগত জানালেন। পরে আমি দ্বিতীয় দফা বাদশাহকে সম্মান জানাই। নাসিরুদ্দিন কাফি হারবি বললেন বিসমিল্লাহ। মাওলানা বদরুদ্দিন, যাকে হিন্দুস্তানে বদরুদ্দিন এবং প্রত্যেক আরব আলেমকে মাওলানা বলে, তাকেসহ আমি বাদশাহর খেদমতে হাজির হলাম। বাদশাহ হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার সঙ্গে মুসাফাহা করলেন। নিজ হাত দ্বারা আমার হাত ধরে অত্যন্ত কোমল ভাষায় ফারসিতে বললেন, আপনার আগমন মুবারক হোক। ধীরেসুস্থে চলুন, অত্যন্ত দয়াসুলভ আচরণ করব এবং এই পরিমাণ উপঢৌকন দেব যা শুনে আপনার দেশের লোকজন ছুটে আসবে। পরে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার দেশ কোনটা? আমি বললাম, পশ্চিম। বাদশাহ বললেন, আমিরুল মুমিনিনের[২] দেশ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি যখন

---

[১] ফিরোজ শাহ তুঘলক।

[২] আমিরুল মুমিনিনের দেশ দ্বারা উদ্দেশ্য মরক্কো, যেখানে রাজত্ব করত আবদুল মুমিনের বংশধরেরা।

কোনো কথা বলতেন আমি তার হাতে চুমু খেতাম। এমনকি সাতবার আমি তার হাতে চুমু খেলাম। আমাকে খিলআত (শাহি পোশাক) দেওয়া হলো এবং আমি ফিরে এলাম।

যারা একত্রিত হয়েছেন তাদের জন্য দস্তরখানা বিছানো হলো। বাদশাহর মাথার কাছে দাঁড়ানো ছিলেন প্রধান বিচারপতি সদরে জাহাঁ নাসিরুদ্দিন খাওয়ারেজমি, সদরে জাহাঁ কামালুদ্দিন গজনবি, ইমাদুল মুলক বখশি, জালালুদ্দিন কিজিসহ অনেক প্রহরী ও আমির। সেই দস্তরখানে খোদাওয়ান্দজাদা গিয়াসুদ্দিনও উপস্থিত ছিলেন। বাদশাহ তাকে অনেক সম্মান করতেন এবং তাকে ভাই বলে সম্বোধন করতেন। তিনি নিজ দেশ থেকে কয়েকবার বাদশাহর কাছে আসা-যাওয়া করেন।

দ্বিতীয় দিন বাদশাহ আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেককে একটি করে বিশেষ ঘোড়া দান করলেন। এর সঙ্গে লাগাম ও আনুসঙ্গিক জিনিসপত্রও দেন। সেগুলো সোনায় খচিত ছিল। রাজধানীতে প্রবেশের জন্য বাদশাহ ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। বাদশাহর বাহনের সামনে ষোলটি হাতি ছিল সজ্জিত। সেই হাতিগুলোর ওপর পতাকা টানানো ছিল। প্রত্যেক হাতির ওপর একটি ছাতা ঝুলানো ছিল। সেই ছাতা ছিল সোনা খচিত। বাদশাহ যে হাতির ওপর সওয়ার ছিলেন সেটার ওপরও একটি সোনা ও মণি-মুক্তা খচিত ছাতা ছিল। কোনো কোনো হাতির ওপর ছোট ছোট ক্ষেপণাস্ত্র ছিল। যখন বাদশাহ শহরের কাছাকাছি পৌঁছেন তখন সেই ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা দিনার ও দিরহাম মিশ্রিত করে তা নিক্ষেপ করা হয়। বাদশাহর সামনে হাজার হাজার মানুষ ও সেনা পায়ে হেঁটে অগ্রসর হতে থাকে। তারা হুড়োহুড়ি করে সেই দিনার ও দিরহাম আহরণ করতে থাকেন। রাজমহলে পৌঁছা পর্যন্ত এটা অব্যাহত থাকলো। রাস্তায় একটু পরপর কাঠের তৈরি দুর্গ এবং রেশমের কাপড়ের তৈরি মঞ্চ ছিল, যেখানে গায়ক নারীরা বসা ছিল।

দ্বিতীয় দিন ছিল শুক্রবার। আমরা বিচারালয়ের দরজায় ঢুকে তৃতীয় দরজার বারান্দায় বসে গেলাম। তখনো আমাদের ভেতরে যাওয়ার অনুমতি মিলেনি। শামসুদ্দিন ফুসেঞ্জি এলেন এবং তিনি নিবন্ধনকারীদের নির্দেশ দিলেন

যাকে মুহাম্মাদ বিন তুমরত মাহদি খলিফা নিযুক্ত করেছিলেন এবং 'আমিরুল মুমিনিন' উপাধি দিয়েছিলেন। এই বংশ ৫২৪ হিজরি থেকে নিয়ে ৬৬৮ হিজরি পর্যন্ত আল আকসার পশ্চিম দিক এবং স্পেন শাসন করে।

আমাদের সবার নাম যেন লিখে নেয়। আর তিনি এটাও বললেন, আপনাদের সবার ভেতরে আসার অনুমতি রয়েছে। আমাদের প্রত্যেকের সাথীসঙ্গীদের সংখ্যা নিরূপণ করা হয় এবং ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। আমি নিজের সঙ্গে আটজনকে নিয়ে গেলাম। আমরা ভেতরে ঢুকে দেখলাম দিনার-দিরহামের থলি নিয়ে প্রধান বিচারপতি ও নিবন্ধনকারীরা বসে গেছেন। তারা বিদেশিদের ডাকতেন এবং প্রত্যেকের জন্য দিনার-দিরহামের একটি থলি দিতেন। আমার ভাগে পাঁচ হাজার দিনার আসে। সর্বমোট এক লাখ মুদ্রা ছিল। এই অর্থ বাদশাহর মা তার ছেলে সহি-সালামতে ফিরে আসার খুশিতে সদকা করেছিলেন। এরপর আমরা চলে এলাম।

এরপর বাদশাহ আমাদেরকে কয়েকবার তার সঙ্গে খাবার খেতে দস্তরখানে ডাকেন। অত্যন্ত আন্তরিকতা ও কোমলভাবে আমাদের খোঁজখবর নেন। একদিনের কথা। বাদশাহ আমাদের বলতে লাগলেন, আপনারা যারা আমার দেশে তাশরিফ এনেছেন আমার ওপর অত্যন্ত মেহেরবানি করেছেন। আমি আপনাদের এই কষ্টের কোনো প্রতিদান দিতে পারব না। আপনাদের মধ্যে যারা বয়োবৃদ্ধ তারা আমার বাবার সমপর্যায়ের। যাদের বয়স আমার কাছাকাছি তারা আমার ভাইয়ের মতো। আর যারা আমার চেয়ে বয়সে ছোট তারা আমার ছেলের মতো। আমার দেশের কোনো শহর আপনাদের চেয়ে বড় নয়। এই শহর আপনাদেরই শহর।

আমরা এ কথা শুনে বাদশাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করি। তার জন্য দোয়া করি। এরপর আমাদের ভাতা ও চাকরি নির্ধারণ করে দেন। আমার ভাতা নির্ধারণ করা হয় বছরে বারো হাজার দিনার। আগে থেকে তিনটি গ্রাম আমার জায়গিরভুক্ত ছিল। এবার আরো দুটির জায়গির দেওয়া হয়। সেই গ্রাম দুটির নাম ছিল জোরা ও মালিকপুর। একদিন আমার কাছে খোদাওয়ান্দজাদা গিয়াসুদ্দিন ও সিন্ধের গভর্নর কুতবুল মুলককে পাঠান। তারা এসে বলেন, আখুন্দে আলম (বাদশাহ) বলেছেন, আপনাদের মধ্যে যার যে কাজের যোগ্যতা রয়েছে এবং যার যে কাজের প্রতি আগ্রহ, সেই কাজই আপনাদের জন্য বরাদ্দ করা হবে। যে উযির (মন্ত্রী) হতে চায় তার জন্য উযিরগিরি, যার শিক্ষকতা পছন্দ তার জন্য শিক্ষকতা, যার মুনশি হওয়া পছন্দ তার জন্য মুনশিগিরি, যার আমির হওয়া পছন্দ তার জন্য আমিরগিরি, যে শায়খ হতে চায় তাকে শায়খ পদে নিযুক্ত করা হবে।

এটা শুনে আমরা সবাই চুপ থাকলাম। কেননা আমাদের তো ইচ্ছা ছিল যে উপহার-উপঢৌকন পাওয়া যাবে তা নিয়ে নিজ দেশে ফিরে যাব। অবশেষে আমির বখত বিন সাইয়েদ তাজউদ্দিন, যার কথা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি, তিনি বললেন, আমার পূর্বপুরুষেরা উযির ছিলেন, কিন্তু আমি নিজে কাতিব। এই দুটি কাজ ছাড়া তৃতীয় কোনো কাজ জানি না। হেবাতুল্লাহ ফালাকিও প্রায় একই ধরনের কথা বললেন। খোদাওয়ান্দজাদা আমাকে উদ্দেশ্য করে আরবিতে বলেন, সাইয়েদুনা আপনি কী বলেন? এখানকার লোকেরা আরবিদের সাইয়েদ বলে সম্বোধন করে। কেননা বাদশাহ তাদের এভাবেই সম্মানসূচক সম্বোধন করেন। আমি বললাম, উযির হওয়া কিংবা লেখালেখি তো আমার কাজ নয়। আমার পেশা হলো কাজি (বিচারক) ও শায়খ হওয়া। এটাই আমার বাপ-দাদার পেশা। আর হলো এমারতি অর্থাৎ সেনাপতিত্ব। আপনি ভালো করেই জানেন, আরবের তলোয়ারের ভয়ে অনারবরা মুসলমান হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সেনাবাহিনীতে কাজ করা এবং তলোয়ার চালানো হলো আমাদের পূর্বপুরুষদের পেশা।

বাদশাহ যখন এই জবাব শুনলেন তখন খুবই খুশি হলেন। ওই সময় বাদশাহ হাজার স্তম্ভের মহলে অবস্থান করছিলেন এবং খাবার খাচ্ছিলেন। সেখানে আমাদের সবাইকে ডেকে পাঠালেন। আমরাও বাদশাহর সঙ্গে খাবার খেলাম। পরে আমরা রাজমহল থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার সাথীসঙ্গীরা সেখানে বসে গেলেন। আমার একটি ফোঁড়া হয়েছিল, যার কারণে বসতে পারিনি। এজন্য ঘরে ফিরে এলাম। বাদশাহ দ্বিতীয়বার আমাদের ডেকে পাঠালেন। বাকি সবাই আগে গেলেন। আমি গেলাম আসরের নামায পড়ে। বিচারালয়ে মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করি। এরপর প্রহরী এসে বললেন, বাদশাহ আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। প্রথমে খোদাওয়ান্দজাদা জিয়াউদ্দিন যিনি ভাইদের মধ্যে সবার বড় ছিলেন, তিনি সবার আগে গেলেন। বাদশাহ তাকে 'মিরদাদ' পদে নিযুক্ত করলেন। এই পদে বড় বড় মানুষেরা নিযুক্ত হয়ে থাকেন। তাদের কাজ হলো, কাজির পাশে বসে থাকা। কেউ এসে কোনো আমির বা রাজদরবারের বড় কারো বিরুদ্ধে নালিশ করলে অভিযুক্তকে কাজির সামনে হাজির করা ছিল তার দায়িত্ব। এই পদের জন্য বছরে পঞ্চাশ হাজার দিনার ভাতা নির্ধারিত ছিল। তাছাড়া তার জন্য জায়গির নির্ধারিত ছিল, যা সমপরিমাণ। তার জন্য বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার দিনার তাৎক্ষণিক পরিশোধের নির্দেশ দিলেন। রেশম ও

জরির খিলআত দেওয়া হলো, যাকে 'শের সুরত' (সিংহ আকৃতির) বলা হতো। এই পোশাকের সিনা ও পিঠে সিংহের ছবি ছিল। সেই পোশাকের ভেতর সেলাই করে একটি পত্র সংযুক্ত করে দেওয়া হয়, যাতে পোশাকে সংযুক্ত থাকা স্বর্ণের পরিমাণের কথা উল্লেখ ছিল। উন্নতমানের একটি ঘোড়াও তাকে বরাদ্দ দেওয়া হয়। ঘোড়ার জিন মিশরীয় জিনের মতো। এর বেশিরভাগ অংশ রুপা মোড়ানো ছিল। আর রুপার ওপর ছিল স্বর্ণের প্রলেপ।

এরপর আমির বখত ভেতরে গেলেন। তার ক্ষেত্রে নির্দেশ হলো উযিরের সঙ্গে মসনদে বসা থাকবেন। দেওয়ানিসংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ ছিল তার দায়িত্বে। তার বার্ষিক ভাতা ছিল চল্লিশ হাজার দিনার। সমপরিমাণ অর্থ জায়গির থেকে আসার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। চল্লিশ হাজার দিনার নগদ দিয়ে দেওয়া হলো। আর ঘোড়া ও খিলআতও দেওয়া হলো, যার বর্ণনা ওপরে করা হয়েছে। তার উপাধি দেওয়া হলো 'শারফুল মুলক'।

এরপর হেবাতুল্লাহ ফালাকি ভেতরে গেলেন। তাকে বাদশাহ রাসুলদার নিযুক্ত করলেন। অর্থাৎ, বার্তাবাহক। তার ভাতা নির্ধারণ করা হলো চব্বিশ হাজার দিনার। চব্বিশ হাজার দিনার তাকে নগদ পরিশোধ করে দেওয়া হলো এবং তাকে 'বাহাউল মুলক' উপাধি দেওয়া হলো।

এরপর আমি ভেতরে গেলাম। বাদশাহ তার মসনদে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। উযির খাজা জাহাঁ তার সামনে বসা ছিলেন। মালিক কাবির ছিলেন দাঁড়িয়ে। আমি যখন সালাম করলাম তখন মালিক কাবির বললেন, সম্মান প্রদর্শন করুন। কেননা আখুন্দে আলম আপনাকে রাজধানী দিল্লির কাজি হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। আর আপনার বার্ষিক ভাতা বারো হাজার নির্ধারণ করেছেন। সমপরিমাণ জায়গির আপনাকে দান করা হয়েছে। আর এটাও সিদ্ধান্ত হয়েছে, আপনার পুরো বারো হাজার দিনার আজই রাজকোষ থেকে পরিশোধ করে দেওয়া হবে। একটি ঘোড়াও আপনাকে দেওয়া হবে। আর আপনাকে একটি মেহরাবি খিলআত দেওয়া হবে। এই খিলআতের বুকে-পিঠে মেহরাবের ছবি যুক্ত রয়েছে। আমি সম্মান প্রদর্শন করলাম। মালিক কাবির আমাকে হাতে ধরে বাদশাহর সামনে হাজির করলেন। বাদশাহ বললেন, দিল্লির কাজি পদটি সামান্য কোনো পদ নয়, আমরা এটাকে অনেক বড় সম্মানজনক পদ মনে করি। আমি ফারসি বুঝতাম, তবে ফারসিতে

জবাব দিতে পারতাম না। আর বাদশাহ আরবি বুঝতেন, কিন্তু আরবিতে জবাব দিতে পারতেন না। আমি বললাম, হে মাওলানা! আমি তো ইমাম মালেক রহ.-এর মাযহাবের অনুসারী। আর এই শহরবাসী পুরোটাই হানাফী মাযহাবের অনুসারী। এছাড়াও এখানকার ভাষা সম্পর্কে আমি অজ্ঞ। বাদশাহ বললেন, আমি বাহাউদ্দিন মুলতানি ও কামালুদ্দিন বিজনুরিকে আপনার সহযোগিতার জন্য নিযুক্ত করেছি। আপনি তাদের থেকে পরামর্শ নেবেন। সব দলিল-দস্তাবেজে আপনার স্বাক্ষর থাকবে। আর এটাও বললেন, আপনি তো আমার সমপর্যায়ে বসতে যাচ্ছেন। বললাম, আমি তো হুজুরের গোলাম ও খাদেম পর্যায়ের। তখন বিনয়সুলভ বাদশাহ আরবি ভাষায় বললেন, 'আনতা সাইয়েদুনা ও মাখদুমুনা'। এরপর শারফুল মুলককে বললেন, তার ভাতা যথেষ্ট হবে না। কেননা তিনি খরচ করা মানুষ। এজন্য আমার পরামর্শ হলো, একটি খানকাও তাকে সোপর্দ করে দাও, যাতে তিনি গরিবদের তত্ত্বাবধান করতে পারেন। শারফুল মুলককে বললেন, এই কথাটি তুমি তাকে আরবিতে বলো। বাদশাহ মনে করতেন শারফুল মুলক আরবি ভালো বলতে পারেন, অথচ তিনি আরবি বলতে পারতেন না। বাদশাহ এটা বুঝে গেলেন। তাকে ফারসিতে বললেন, যাও দুজন রাতে একসঙ্গে ঘুমাও এবং তাকে কথাটি বোঝাও। আগামীকাল এসে আমাকে বলো তিনি কী বলেছেন।

আমি ফিরে এলাম। রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ডঙ্কা বেজে গেছে। এই ডঙ্কা বাজার পর কেউ আর বাইরে বের হতে পারে না। এজন্য আমরা একজন উযিরকে সঙ্গে নিলাম এবং তার সঙ্গে বাইরে বের হলাম। শহরের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এজন্য আমরা ওই রাতে সাইয়েদ আবুল হাসান আব্বাদি ইরাকির ঘরে শুয়ে গেলাম। এই ব্যক্তি বাদশাহর সম্পদ দ্বারা ব্যবসা করতেন। ইরাক ও খুরাসান থেকে বাদশাহর জন্য অস্ত্র ও আসবাবপত্র কিনে আনতেন। দ্বিতীয় দিন আমাদের সবাইকে ডাকা হলো। সবাইকে নগদ অর্থ, ঘোড়া ও খিলআত দেওয়া হলো। আমরা সবাই এই দেশের নিয়ম অনুযায়ী খিলআত কাঁধে রাখলাম। এভাবেই বাদশাহর সামনে হাজির হয়ে তাকে সম্মান প্রদর্শন করলাম। ঘোড়ার ওপর কাপড় বিছানো ছিল। আমরা এটা রেখে লাগাম টেনে নিজেরাই সওয়ার হয়ে রাজমহলের দরজা পর্যন্ত আসি। পরে সেখান থেকে নিজ নিজ ঘরে ফিরি।

বাদশাহ আমার সাথীসঙ্গীদেরও দুই হাজার দিনার ও দশটি খিলআত (শাহি পোশাক) দেন। অন্য কারো সাথীসঙ্গীরা তা পায়নি। কেননা আমার সাথীসঙ্গীরা দেখতে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও অভিজাত মনে হতো। তাদের দেখে বাদশাহ খুশি হন এবং তারাও বাদশাহকে সম্মান প্রদর্শন করেন। বাদশাহ তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করেন।

কাজি হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার যথেষ্ট সময় পর একদিন আমি বিচারালয়ের বারান্দায় একটি গাছের নিচে বসা ছিলাম। আমার সামনে বক্তা নাসিরুদ্দিন তিরমিযি বসা ছিলেন। মাওলানা নাসিরুদ্দিনকে তলব করা হলো। তিনি ভেতরে গেলেন। বাদশাহ তাকে খিলআত দিলেন এবং এক কপি কালামুল্লাহও (কুরআন), যাতে মোতি সংযুক্ত ছিল। এই অবস্থায় একজন প্রহরী দৌড়ে আমার কাছে এল এবং বলল, বাদশাহ আপনার জন্য বারো হাজার দিনার উপহার দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমাকে কিছু দিলে সেই চিঠি আমি নিজে বহন করে নিয়ে আসব। আমি মনে করলাম, এই লোক রসিকতা করছে। আমার কাছ থেকে এই বাহানায় কিছু নিতে চাচ্ছে। অথচ সে যথার্থই বলছিল। আমার এক বন্ধু বললেন, ঠিক আছে তোমাকে দুই দিনার দেওয়া হবে, তুমি চিঠি নিয়ে আসো। সুতরাং প্রহরী গিয়ে সেই চিঠি নিয়ে এল।

এই চিঠিতে এটা লেখা থাকে যে, আখুন্দে আলমের নির্দেশ হলো, রাজকোষ থেকে অমুককে অমুক প্রহরীর পরিচয় শনাক্তের মাধ্যমে এই পরিমাণ অর্থ প্রদান করুন। প্রথমে এই চিঠিতে পরিচয় শনাক্তকারী দস্তখত করেন। এরপর তিন আমির দস্তখত করেন। অর্থাৎ বাদশাহর শিক্ষক খান আজম কাতলু খান, খারিতাদার, যার কাছে বাদশাহর কলমদানি থাকে এবং যার কাছে বাদশাহর দোয়াত থাকে তার দস্তখত। যখন তাদের সবার দস্তখত শেষ হয় তখন সেই চিঠি রাজকোষের দায়িত্বে থাকা উযিরের কাছে যায়। সেখানকার নিবন্ধনকারী এর একটি অনুলিপি রাখেন। এরপর এর একটি অনুলিপি দেওয়ানে আশরাফে থাকে, আরেকটি থাকে দেওয়ানে নজরে। এরপর একটি পরোয়ানা লেখা হয়, যাতে রাজকোষের দায়িত্বশীলকে তা পরিশোধের জন্য বলা হয়। রাজকোষের দায়িত্বশীল তা নিজের হিসাবে সংযুক্ত করেন এবং প্রতিদিনের পরোয়ানার একটি চিঠি বাদশাহর সামনে পেশ করেন। কারো কারো ক্ষেত্রে লেখা পরোয়ানা একটু দেরিতে পৌঁছে,

তবে দেরিতে হলেও তিনি অর্থ যথাযথভাবে পান। সুতরাং আমার এই উপহারের অর্থ পেতে প্রায় ছয় মাস লেগে যায়, যা আরেকটি উপহারের সঙ্গে পাই, যার আলোচনা সামনে আসবে। হিন্দুস্তানের নিয়ম হলো, যে পরিমাণ অনুদানের নির্দেশ দেওয়া হয় এর এক দশমাংশ বাদ দিয়ে তা পরিশোধ করা হয়। অর্থাৎ, এক লাখ অনুদানের নির্দেশ হলে পাওয়া যাবে ৯০ হাজার। আর দশ হাজার অনুমোদন হলে পাওয়া যাবে নয় হাজার।

আমি আগে উল্লেখ করে এসেছি, যে পরিমাণ অর্থ আমার রাস্তায় খরচ হয়েছে এবং বাদশাহকে যে পরিমাণ হাদিয়া দিয়েছি এবং পরবর্তী সময়ে যে পরিমাণ খরচ হয়েছে সবই আমি সওদাগরদের কাছ থেকে ঋণ হিসেবে নিয়েছি। যখন এই সওদাগররা নিজের বাড়িতে চলে যেতে চাইলেন তখন সেই অর্থ চাইলেন। আমি বাদশাহর প্রশংসায় একটি কবিতা লিখলাম।

একদিন বাদশাহ তার আসনে বসা ছিলেন। তখন তার কাছে এই কবিতা পেশ করা হলো। বাদশাহ এটি ধরে তার রানের ওপর রাখলেন এবং তিনি এক কোণে ধরে রাখলেন, আরেক কোণে আমার হাত। আমি এক একটি চরণ পড়ছিলাম আর প্রধান বিচারপতি কামালুদ্দিন এর অর্থ বলে দিচ্ছিলেন। বাদশাহ এতে অনেক খুশি হন। তিনি হিন্দি ও আরবি শের (কবিতা) খুবই ভালোবাসতেন। আমি যখন সপ্তম চরণ পাঠ করছিলাম বাদশাহ বললেন, মারহামতু। এর অর্থ হচ্ছে আমি তোমার ওপর অনুগ্রহ করলাম। এ সময় প্রহরী আমাকে ধরে তার দাঁড়ানোর জায়গায় নিয়ে গেলেন, যাতে আমি বাদশাহকে সম্মান প্রদর্শন করতে পারি। বাদশাহ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। পুরো কবিতাটি পড়তে দাও। আমি পুরো কবিতা পড়ে শোনালাম এবং পুনরায় সম্মান প্রদর্শন করলাম। উপস্থিত সবাই আমাকে মুবারকবাদ জানালেন। কিন্তু বেশ কিছুদিন পর্যন্ত কোনো খবরবার্তা এল না।

আমি একটি আবেদনপত্র লিখলাম এবং এটি সিন্ধের গভর্নর কুতবুল মুলকের হাতে দিলাম। তিনি এটি বাদশাহর সামনে পেশ করলেন। বাদশাহ তাকে বললেন, তুমি খাজা জাহাঁর কাছে যাও এবং তাকে বলো (ইবনে বতুতার) ঋণ যেন পরিশোধ করে দেয়। কুতবুল মুলক তাই করলেন। খাজা জাহাঁ বললেন, আচ্ছা। কিন্তু এর কোনো ফলাফল এল না। এরই মধ্যে বাদশাহ দৌলতাবাদ সফরের নির্দেশ দিলেন। কিছু দিনের জন্য বাদশাহ শিকারের জন্য বেরিয়ে গেলেন। উযিরও তার সঙ্গে গেলেন। এজন্য এই উপহার

পেতে আমার অনেক দিন লেগে যায়। দেরি হওয়ার কারণ আমি বিস্তারিত বলছি। সেটা হলো, যখন আমার কাছে ঋণ পাওয়া ব্যক্তিরা সফরের সিদ্ধান্ত নিলেন তখন আমি তাদের বললাম, যখন শাহি মহলের দরজায় যাবেন তখন বাদশাহর দোহাই দেবেন। হয়ত বাদশাহ এটা শুনতে পারবেন এবং আপনাদের ঋণ পরিশোধ করে দেবেন। এই দেশের নিয়ম হলো, কেউ কোনো বড় মানুষের কাছে ধারকর্জ পেলে এবং তা আদায় করতে সক্ষম না হলে, ঋণ যারা পাবে তারা বাদশাহর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যায়। যখন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি রাজমহলে ঢুকতে যায় তখন চিৎকার করে করে বাদশাহর দোহাই দেয় এবং বলে, বাদশাহর মাথার কসম, যতক্ষণ তুমি আমার কর্জ পরিশোধ না করবে ততক্ষণ ভেতরে যাবে না। তখন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি বাধ্য হয়ে ঋণ পরিশোধ করতে হয় কিংবা তোষামোদি করে সুযোগ নিতে হয়।

একদিন ঘটনাক্রমে বাদশাহ তার বাবার কবর যিয়ারতের জন্য বের হলেন এবং সেখানে একটি মহলে থামলেন। আমার কাছে ঋণ পাওয়া ব্যক্তিদের বললাম, এটাই সুযোগ। আমি যখন সেই মহলে ঢুকতে গেলাম তখন তারা বাদশাহর দোহাই দিলেন। বললেন, আপনি যতক্ষণ আমাদের কর্জ পরিশোধ না করবেন ততক্ষণ ভেতরে ঢুকতে পারবেন না। দরবারের লোকেরা এই খবর তাৎক্ষণিকভাবে বাদশাহর কানে পৌঁছে দিলেন। হাজিব শামসুদ্দিন, যিনি অনেক বড় ফকিহ ছিলেন, তিনি বেরিয়ে এলেন। ওই লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা বাদশাহর দোহাই কেন দিচ্ছো? তারা বললেন, এই ব্যক্তির কাছে আমরা কর্জ পাই। তিনি ভেতরে গিয়ে বাদশাহর কাছে সেই কথা বললেন। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, কী পরিমাণ কর্জ তারা পায়? তিনি বললেন, পঁচিশ হাজার দিনার। পরে তিনি বাইরে এসে ঋণপ্রাপ্তদের বললেন, বাদশাহ বলেছেন, তিনি এটার জিম্মাদার। তিনিই সেটা পরিশোধ করবেন, ইবনে বতুতার কাছে আর তা চাইবেন না।

বাদশাহ ইমাদুদ্দিন সামনানি ও খোদাওয়ান্দজাদা গিয়াসুদ্দিনকে দায়িত্ব দিলেন, তারা আসলে এই পরিমাণ কর্জ পায় কি না তা তদন্ত করে দেখতে। তারা বসে গেলেন এবং যারা ঋণ পাবেন তাদের ডেকে দলিল-দস্তাবেজ পেশ করতে বললেন। তারা গিয়ে বাদশাহকে জানালেন, দলিল-দস্তাবেজ রয়েছে। বাদশাহ হেসে বললেন, আমি জানতাম এটা কাজি এবং নিজের কাজটি ভালোমতো জানে। এরপর খোদাওয়ান্দজাদাকে এই ঋণ পরিশোধের

নির্দেশ দিলেন। তিনি ঘুষের লোভ করলেন এবং চিঠি লিখতে দেরি করলেন। আমি তার কাছে দুশ মুদ্রা পাঠাই। তিনি তা গ্রহণ না করে ফেরত পাঠান। কিন্তু তার এক কর্মচারী এসে আমাকে বলে তিনি পাঁচশ মুদ্রা চাচ্ছেন। বললাম, আমি দেব না। আব্দুল মালিক বিন ইমাদুদ্দিন সামনানিকে এই অবস্থার কথা বলে দিই। তিনি তার বাবার সঙ্গে এই বিষয়টি আলোচনা করেন। আর তিনি করেন উযিরের কাছে। উযির আর খোদাওয়ান্দজাদার মধ্যে বিরোধ ছিল। এজন্য উযির গিয়ে এই বিষয়টি বাদশাহর কাছে বলে দেন। এই অভিযোগ শুনে বাদশাহ অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং খোদাওয়ান্দজাদাকে নজরবন্দি করেন। বাদশাহ বললেন, অমুক ব্যক্তি তাকে এই ঘুষ কেন দিয়েছিল? তিনি বিষয়টি তদন্তের নির্দেশ দিলেন। এসব কারণে আমার ধার পরিশোধে বিলম্ব হয়।

শিকারের জন্য বাদশাহর বিদায়

বাদশাহ যখন শিকারের জন্য রাজধানীর বাইরে যান তখন আমিও বাদশাহর সঙ্গী হই। আমি এই সফরের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু কিনেছিলাম। একটি তাঁবুও কিনেছিলাম। এই দেশে তাঁবু সবাই রাখতে পারে। আমিরদের জন্য তো এটা খুবই জরুরি। পার্থক্য শুধু এতটুকু, শাহি তাঁবু লাল রঙের এবং অন্যান্য আমিরদের তাঁবু সাদা রঙের, যার মধ্যে নীল ডোরাকাটা থাকে।

আমি একটি সামিয়ানা কিনলাম, যাতে তাঁবুর ওপরে ছায়া দেওয়া যায়। এটি বড় দুটি বাঁশে দাঁড় করানো হতো। এই বাঁশ যারা গর্দানে করে নিয়ে যেত তাদের বলা হতো কিওয়ানি। হিন্দুস্তানে নিয়ম হলো, মুসাফির কিওয়ানিকে ভাড়ায় নেয়। এমনিভাবে প্রাণীর জন্য ঘাস সংগ্রহের জন্যও সঙ্গে লোক নিতে হয়। কেননা এখানে মহিষ-ঘোড়াকে নিজেরা খাওয়ায় না। এর জন্য চাকর রাখতে হয়। চাকরেরা তাঁবু টানায়, এর মধ্যে বিছানা বিছায় এবং আসবাবপত্র তৈরি করে। এছাড়া রাতের বেলা এসব লোক চেরাগ নিয়ে সামনে সামনে চলে।

আমিও এসব কাজের জন্য কিছু লোক মজুরির ভিত্তিতে সঙ্গে নিই। কিছুটা আভিজাত্য বজায় রাখার চেষ্টা করি। ওইদিনই আমি শহরের বাইরে বেরিয়ে যাই যেদিন বাদশাহর বাহন বাইরে বের হয়। অন্যরা দুই তিন দিন পর আসে। বহর নিয়ে বের হওয়ার দিন বাদশাহ আসরের পর ইচ্ছা করলেন হাতিতে চড়ে বের হয়ে দেখবেন কে কে প্রস্তুত হয়েছে এবং কে কতটা

দ্রুততার সঙ্গে প্রস্তুত হতে পেরেছে। আর কারা কারা প্রস্তুত হতে বিলম্ব করছে। বাদশাহ তার ক্যাম্পের বাইরে একটি চেয়ারে বসা ছিলেন। আমি এসে তাকে সালাম করলাম। ডান পাশে নির্ধারিত স্থানে দাঁড়িয়ে গেলাম। বাদশাহ আমার কাছে মালিক কাবুলাকে পাঠালেন। তিনি এসে বললেন, বাদশাহ বলেছেন তুমি বসে যাও। এটা ছিল বাদশাহর মেহেরবানি। অন্যথায় সেদিন আর কারো বসার অনুমতি ছিল না।

ইতিমধ্যে হাতি চলে এলো এবং সিঁড়ি স্থাপন করা হলো। বাদশাহ এতে আরোহণ করলেন এবং ঘুরতে বেরিয়ে গেলেন। বাদশাহর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গও বাহনে আরোহণ করলেন। একটু পর বাদশাহ আবার নিজ তাঁবুর কাছে ফিরে এলেন। নিয়ম ছিল, যখন বাদশাহ বাহনে চড়বেন তখন সব আমির নিজ নিজ বাহিনী, পতাকা, ঢোল-তবলা, বাদ্যযন্ত্র সবকিছু নিয়ে সওয়ার হয়ে যাবেন। বাদশাহর আগে আগে শুধু প্রহরী ও তবলাবাদকেরা তবলা বাজাতে বাজাতে যাবে। বাদশাহর ডানে পনেরোজন এবং বাঁয়েও সমপরিমাণ লোক থাকবে। এই জামাতে আমির, উযির ও বিদেশি বিশিষ্টজনেরা থাকে। বাদশাহর সামনে পায়ে হেঁটে চলা সেনা এবং পথপ্রদর্শক থাকে। আর পেছনে রেশন ও স্বর্ণখচিত পতাকা শোভা পায়। উটের ওপর তবলা রাখা হয় এবং এর পেছনে শাহি গোলাম ও ক্রীতদাসরা থাকে। আর তাদের পেছনে আমির ও সাধারণ মানুষেরা থাকে। কাফেলা কোথায় গিয়ে থামবে সেটা কারো জানা থাকে না।

যখন কোথাও নদীর তীরে কিংবা গাছের নিচে জায়গাটি বাদশাহর পছন্দ হবে তিনি নির্দেশ দিতেন থেমে যাওয়ার, এতে সবাই থেমে যেত। যতক্ষণ বাদশাহর জন্য তাঁবু স্থাপন না হবে ততক্ষণ আর কারো তাঁবু টানানোর অনুমতি ছিল না। পরে কর্মকর্তারা এসে প্রত্যেককে তাঁবু টানানোর স্থান বলে দিতেন। মধ্যখানে শাহি তাঁবু স্থাপন করা হতো। ছাগলের গোশত, বড় বড় মুরগি শিকার করে আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হতো। আমিরের ছেলেরা এসে আগুন ধরিয়ে নিজেরাই গোশত ভুনা করত। একটি ছোট তাঁবু স্থাপন করা হতো, এর বাইরে বাদশাহ ঘনিষ্ঠ আমিরদের নিয়ে বসতেন। দস্তরখান পাতা হতো, বাদশাহ যাকে চাইতেন সেই দস্তরখানে শরিক করতেন।

একদিন বাদশাহ নিজ তাঁবুর ভেতরে ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বাইরে কে? সাইয়েদ নাসিরুদ্দিন যিনি বাদশাহর বন্ধু ছিলেন, তিনি বললেন, অমুক

ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি খুবই বিপর্যস্ত। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, কেন? সাইয়েদ বললেন, যারা তার কাছে ধারকর্জ পাবে তারা খুব তাগাদা দিচ্ছে। আখুন্দে আলম উযিরকে বললেন, তার ধারকর্জ পরিশোধ করে দাও। উযির এর আগেই সফরে চলে আসেন। সুতরাং যারা ধারকর্জ পাবে তাদের বলে দেওয়া হলো উযির ফিরে আসা পর্যন্ত যেন জোরজবরদস্তি না করে। সেখানে মালিক দৌলত শাহও উপস্থিত ছিলেন। বাদশাহ তাকে চাচা বলে সম্বোধন করতেন। তিনি বললেন, হে আখুন্দে আলম! এই লোক প্রতিদিনই আমাকে আরবিতে কিছু বলে, কিন্তু আমি বুঝি না। সাইয়েদ নাসির হয়ত বুঝতেন তিনি কী বলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, সাইয়েদ নাসিরুদ্দিনের কাছে ঋণের কথা আলোচনা করা। সাইয়েদ নাসির বললেন, তিনি এই ধারকর্জ সম্পর্কেই বলতে চাচ্ছে। বাদশাহ বললেন, আমি রাজধানীতে ফিরে এই লোকের ধারকর্জ পরিশোধ করে দেব।

খোদাওয়ান্দজাদাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, হে আখুন্দে আলম! এই লোক খুবই খরুচে। একই অবস্থা ছিল তার মাওয়ারাউন নাহারের বাদশাহ তারামশিরিনের দরবারে। সেখানে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। এই আলোচনা চলছিল, এর মধ্যেই বাদশাহ আমাকে দস্তরখানে ডাকলেন। আমার জানা ছিল না, আমার সম্পর্কে কী আলোচনা হয়েছে। যখন বাইরে এলাম তখন সাইয়েদ নাসিরুদ্দিন বললেন, মালিক দৌলত শাহের কৃতজ্ঞতা আদায় করো। আর মালিক দৌলত শাহ বললেন খোদাওয়ান্দজাদার কৃতজ্ঞতা আদায় করো।

বাদশাহর সঙ্গে যখন শিকারের জন্য ক্যাম্পে ছিলাম বাদশাহ যখন ক্যাম্প থেকে বাহনে চড়ে বের হতেন তখন আমার তাঁবুর পাশ দিয়েই যেতেন। বাদশাহ আমার বাম পাশে ছিলেন, তার পাশের তাঁবুতেই আমি থাকতাম। বাদশাহ যখন যাচ্ছিলেন তখন আমার সাথীসঙ্গীরা দাঁড়িয়ে তাকে সালাম করছিল। বাদশাহ ইমাদুল মুলক ও মালিক দৌলত শাহকে পাঠালেন, এই লোকদের জিজ্ঞেস করো তারা কার তাঁবুতে থাকে। তারা এসে জবাব দিলেন, অমুকের তাঁবুতে থাকে। বাদশাহ শুনে মুচকি হাসলেন। পরদিন আমাকে, সাইয়েদ নাসিরুদ্দিন, মিশরের কাজির ছেলে এবং মালিক সাবিহকে খিলআত (শাহি পোশাক) দেওয়া হলো এবং আমাদেরকে রাজধানীতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। সুতরাং আমরা ফিরে গেলাম।

ওই দিনগুলোতে একবার বাদশাহ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মালিক নাসির উটে চড়ে কি না। আমি আরজ করলাম, হজের সময় দ্রুতগামী উটে চড়ে মিশর থেকে দশ দিনে মক্কা শরিফে পৌঁছে যায়। আমি এটাও বলেছিলাম, সেখানকার উট এমন নয় এই দেশে যেমন। আরজ করলাম, আমার সঙ্গে ওই দেশের একটি উট রয়েছে।

আমার পক্ষ থেকে বাদশাহকে একটি আকর্ষণীয় উপহার

যখন আমি রাজধানীতে ফিরে এলাম তখন তখন একজন মিশরীয় আরবিকে ডেকে পাঠালাম। তাকে দিয়ে একটি উন্নতমানের উটনী সংগ্রহ করলাম। উটের ওপরে দেওয়ার জন্য একটি উন্নতমানের রেশমের কাপড় প্রস্তুত করলাম। আমার কাছে ইয়েমেনের একজন অধিবাসী ছিলেন। তিনি মিষ্টান্ন তৈরিতে ছিলেন বেশ দক্ষ। তিনি মিষ্টি বানালেন। এই উটনী এবং মিষ্টান্ন বাদশাহর দরবারে পাঠালাম। যাকে দিয়ে পাঠালাম তাকে বলে দিলাম এগুলো মালিক দৌলত শাহের কাছে সোপর্দ করবে। আমি তার জন্যও একটি ঘোড়া এবং দুটি উট পাঠালাম।

যখন ওই ব্যক্তি পৌঁছল তখন মালিক দৌলত শাহ এই জিনিসগুলো বাদশাহর দরবারে নিয়ে গেলেন। আর বললেন, হে আখুন্দে আলম! আমি একটি বিস্ময়কর জিনিস দেখেছি। বাদশাহ বললেন, সেটা কী? তিনি বললেন, উটের ওপর গদি। বাদশাহ বললেন, এটা আমার সামনে আনো। সুতরাং উট তার তাঁবুর সামনে নেওয়া হলো। বাদশাহ অনেক খুশি হলেন এবং আমার লোককে বললেন, তুমি এতে চড়ে দেখাও। সে উটের ওপর সওয়ার হলো এবং চালিয়ে দেখাল। বাদশাহ তাকে দুশ দিরহাম এবং খিলআত দিলেন উপহার হিসেবে। ওই লোক ফিরে এলো। সে পুরো ঘটনা আমার কাছে এসে বলল। আমি এটা শুনে খুশি হলাম এবং তাকেও দুটি উট দিলাম।

আমার নতুন দায়িত্ব

কুতুবুদ্দিন খিলজির সমাধিস্থল তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা

নিজের মনিবের প্রতি তুঘলকের বিস্ময়কর ভালোবাসা

৯ জুমাদাল উলা বাদশাহ মা'বার দেশের দিকে রওনা করলেন। কেননা সেখানে সাইয়েদ হাসান শাহ বিদ্রোহ করেছিলেন। ইতিমধ্যে আমি আমার

সব ধারকর্জ পরিশোধ করেছি। সফরের পাক্কা ইচ্ছা করেছিলাম। সফরসঙ্গী চাকর-বাকরদের নয় মাসের ভাতাও দিয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে রাজধানীতে থাকার নির্দেশ এলো। আমি এ ব্যাপারে অবহিত হয়েছি সে সম্পর্কে প্রহরী আমার কাছ থেকে লিখিত নিয়ে নেন। রাষ্ট্রের নিয়ম এটাই, যাতে কেউ তার ব্যাপারে নির্দেশের কথা অস্বীকার করতে না পারে। বাদশাহ আমাকে ছয় হাজার দিনার দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আর মিশরের কাজিকে দশ হাজার দিনার দেওয়ার নির্দেশ দেন। এভাবে বিদেশি যাদের রাজধানীতে অবস্থান করতে বলেন তাদের সবাইকে উপহার দেন। তবে হিন্দিভাষীরা কিছু পেল না।

আমাকে বাদশাহ বললেন, আপনাকে সুলতান কুতুবুদ্দিনের সমাধিস্থলের মুতাওয়াল্লি নিযুক্ত করা হলো। সেটার তত্ত্বাবধান করবেন। বাদশাহ এই সমাধিস্থলকে খুবই সম্মান করতেন। কেননা, তিনি এক কালে সুলতান কুতুবুদ্দিনের চাকরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আমি কয়েকবার দেখেছি, বাদশাহ যখন এই কবরস্থানে আসতেন তখন সুলতান কুতুবুদ্দিনের পাপোশ উঠিয়ে এতে চুমু খেতেন, এটি নিজের মাথার ওপর রাখতেন। এই দেশের নিয়ম হলো, মৃতের পাপোশ তার কবরের কাছে একটি চৌকিতে রেখে দেওয়া হতো। বাদশাহ যখন কবরস্থানে প্রবেশ করতেন তখন এটাকে সম্মান করতেন। কুতুবুদ্দিনের স্ত্রীকেও বাদশাহ অসম্ভব সম্মান করতেন। তাকে বোন বলে সম্বোধন করতেন এবং তাকে নিজের হেরেমে জায়গা করে দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাকে মিশরের কাজির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেন। এ কারণেই কাজিকেও অনেক সম্মান করতেন। বাদশাহ প্রতি জুমাবার তার কাছে যেতেন।

বাদশাহ যখন রওনা হচ্ছেন তখন আমাকে বিদায় জানানোর জন্য ডাকা হলো। মিশরের কাজির ছেলে দাঁড়িয়ে আরজ করল, আমি হুজুর (বাদশাহ) থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাই না। বাদশাহ তখন তাকে সফরের প্রস্তুতি নিতে বলেন। এটা তার জন্য ভালো হয়েছিল। এরপর আমি সামনে অগ্রসর হলাম। আমি শহরে থাকতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু এর পরিণতি ভালো হয়নি। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি কোনো কিছু বলার আছে? আমি পকেট থেকে একটি কাগজ বের করলাম। বাদশাহ বললেন, যা বলার মুখে বলুন। আমি বললাম! আখুন্দে আলম! আপনি আমাকে কাজি নিযুক্ত করেছেন। ইতিপূর্বে আমি এই দায়িত্ব পালন করিনি। আমার উদ্দেশ্য ছিল

শুধু এই পেশার মর্যাদা রক্ষা করা। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে দুজন সহযোগী দিয়েছেন। কিন্তু আমি সুলতান কুতুবুদ্দিনের সমাধিস্থলের কী করব? সেখানে চারশ ষাটজন মানুষের দৈনিক ভাতা আমি নির্ধারণ করেছি। কিন্তু সেখানকার ওয়াকফ থেকে যে আয় তাতে সেই খরচ নির্বাহ করা সম্ভব নয়।

বাদশাহ উযিরকে লক্ষ করে বললেন, পঞ্চাশ হাজার। আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, নিঃসন্দেহে। আর উযিরকে বললেন, খাদ্যের ব্যবস্থা করতে। আমাকে বললেন, যতক্ষণ সমাধিস্থলে খাদ্যশস্য আসবে তা খরচ করতে থাকুন। খাদ্যশস্য দ্বারা উদ্দেশ্য গম ও চাল। সেই দেশে এক মণ মরক্কোর ২০ রতল সমপরিমাণ। পরে বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, আরো কোনো কথা? আমি বললাম, আমার সাথীরা কয়েকজন কারাগারে বন্দি। এর কারণ হলো, বাদশাহ আমাকে যে গ্রামগুলো জায়গির দিয়েছেন সেগুলো থেকে তারা কিছু উসুল করেছিল। এবার রাজদরবারের লোকেরা বলছে, যা কিছু আয় হয়েছে তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা কর। না হলে বাদশাহর অনুমতি আনো যে, তিনি রাষ্ট্রীয় দাবি ক্ষমা করে দিয়েছেন। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কী পরিমাণ লাভ হচ্ছে? আমি বললাম, পাঁচ হাজার দিনার। তিনি বললেন, সেটা আমি আপনাকে উপহার হিসেবে দিয়ে দিলাম। এরপর আমি আরজ করলাম, যে ঘরটি বাদশাহ মহাশয় দিয়েছিলেন সেটি জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। বাদশাহ নির্দেশ দিলেন, সেখানে ইমারত তৈরি করে দিতে। তখন বাদশাহ বললেন, আমার একটি অসিয়ত আছে। আমি বললাম, জি জাহাঁপনা। বাদশাহ বললেন, আপনি আর ধারকর্জ করবেন না। হয়ত আমি খবর পাব না, ধারকর্জ যারা পাবে তারা আপনাকে কষ্ট দেবে। আমি যে পরিমাণ দিই এর চেয়ে বেশি খরচ করবেন না। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ.

'তুমি একেবারে ব্যয়কৃষ্ট হয়ো না এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়ো না।'[১]

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا.

'খাও ও পান করো এবং অপব্যয় করো না।'[১]

---

[১] সূরা ইসরা : ২৯

وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا.

'এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী।'[২]

আমি ইচ্ছা করলাম বাদশাহকে কদমবুচি করব। কিন্তু বাদশাহ আমার মাথা ধরে ফেললেন এবং আমাকে বারণ করলেন। আমি বাদশাহর হাতে চুমু খেলাম এবং বাইরে বেরিয়ে গেলাম। শহরে এসে আমি ভালো ঘর নির্মাণ শুরু করলাম। এতে চার হাজার দিনার খরচ হলো। ছয়শ দিনার সরকারি কোষাগার থেকে পেলাম আর বাকি অর্থ আমি নিজের কাছ থেকে খরচ করি। ঘরের সামনে একটি মসজিদও বানাই।

এরপর আমি সুলতান কুতুবুদ্দিনের সমাধিস্থলের ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। বাদশাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন সেখানে একটি গম্বুজ বানাতে। যার উচ্চতা হবে একশ হাত। অর্থাৎ, ইরাকের বাদশাহ গাযানের সমাধিস্থলের গম্বুজের চেয়েও ২০ হাত বেশি। এছাড়া ২০টি গ্রাম কিনে সমাধিস্থলের জন্য ওয়াকফ করে দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছিলেন। যাতে সেখানকার উশর থেকে আমি উপকৃত হতে পারি। হিন্দুস্তানের নিয়ম হলো, পুরুষের কবরে তার যৌবনকালে যেসব জিনিসের প্রয়োজন হয় সেগুলো কবরের পাশে রাখা হয়। সুতরাং হাতি ও ঘোড়া কবরের পাশে বাঁধা থাকে। তারা কবরকে অনেক সাজসজ্জা করে। আমিও সেটা করলাম। কুরআন তেলাওয়াতের মতো দেড়শ লোক, যাদেরকে এখানকার ভাষায় 'খতমি' বলে, তাদেরকে মজুরি দিয়ে রাখলাম। এছাড়া ৮০ জন তালিবুল ইলমের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করলাম। তাদের জন্য শিক্ষকেরও ব্যবস্থা করলাম। ৮০ জন সুফির খাবারের ব্যবস্থাও করলাম। এছাড়া একজন ইমাম, মুয়াযযিন, সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী এবং পরিদর্শকদের তালিকা করা এবং তাদের সহযোগিতার জন্য লোক নিয়োগ দিলাম। তাদের সবাইকে এখানকার ভাষায় 'আরবাব' বলে। এ ছাড়া বিছানা পাতা, রান্নাবান্না, পানকারী, অস্ত্রধারী, প্রহরী, নকিব, চৌকিদার এসব পদেও নিয়োগ দিলাম। সব মিলিয়ে ৪৬০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হলো।

---

[১] সূরা আরাফ : ৩১

[২] সূরা ফুরকান : ৬৭

বাদশাহর নির্দেশ ছিল, প্রতিদিন বারো মণ আটা ও বারো মণ গোশত যেন রান্না করা হয়। কিন্তু আমি দেখলাম এই পরিমাণ যথেষ্ট হবে না। আমি নির্দেশ দিলাম ৩৫ মণ আটা ও ৩৫ মণ গোশত রান্না করতে। আর সে অনুযায়ী চিনি, মিশরি, ঘি ও পান খরচ হতো। আমি সমাধিস্থলে উপস্থিত সবাইকে খাবার খাওয়াতাম। তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। এর দ্বারা মানুষের বেশ উপকার হয়। আমিও প্রসিদ্ধি লাভ করি। সুতরাং যখন মালিক সাবিহ দৌলতাবাদে গেলেন এবং তার কাছে বাদশাহ দিল্লির চাকর-বাকরদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন তখন তিনি বললেন, দিল্লিতে যদি অমুকের মতো আরো দুই তিনজন হতো তাহলে গরিবদের কোনো কষ্ট হতো না। বাদশাহ এই কথা শুনে অনেক খুশি হলেন এবং আমার জন্য বিশেষ খিলআত (পোশাক) পাঠালেন। আমি দুই ঈদের দিন, নবীজির জন্মদিনে, আশুরা, শবে বরাত এবং সুলতান কুতুবুদ্দিনের ইন্তেকালের দিন একশ মণ আটা ও গোশত রান্না করতাম। মিসকিন ও ফকিরদের খাবার খাওয়াতাম। যেসব মানুষের ঘরে খাবার পাঠাতে হতো সেই হিসাব ভিন্ন।

একটি নিয়মের কথা আমি এখন বলব, সেটা হলো হিন্দুস্তানের নিয়ম হচ্ছে, যখন ওলিমার খাবার খাবে তখন প্রত্যেক ভদ্রলোক (সাইয়েদ), ফকিহ, মাশায়েখ ও কাজির সামনে খাবারের একটি খাঞ্চা দোলনার আকারে রেখে দেওয়া হয়। এর নিচে চৌকি থাকে। যা খেজুরের পাতা দিয়ে বুনা হয়। প্রথমে সেখানে চাপাতি রাখা হয়। এর ওপরে বকরি ভুনা। চারটি করে টিকিয়া। এর ওপর চার ধরনের মিষ্টান্ন রাখা হয়। চামড়ার একটি ছোট পাত্রে সমুচা ও হালুয়া রাখা থাকে। সবগুলো খাবার রেখে ওপরে একটি নরম কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। যারা মর্যাদার দিকে এতটা বড় নয় তাদের খাবারে পরিমাণ কম থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির সামনে খাঞ্চা রাখা থাকে, তারা সেখান থেকে খাবার নিয়ে নেন। এই পদ্ধতি আমি প্রথমে দেখি সরাই শহরে সুলতান উজবুকের রাজধানীতে। আমি আমার লোকদের বলেছিলাম এভাবে খাবার না উঠাতে, কারণ এটা আমাদের নিয়ম নয়। বড় বড় মানুষের ঘরে এভাবেই খাবার পাঠানো হতো।

আমরুহা ও হাযারা সফর

বাদশাহর নির্দেশ অনুযায়ী উযির আমাকে দশ হাজার মণ খাদ্যশস্য দিয়ে দেন। আর বাকি খাদ্যশস্যের ব্যাপারে লিখে পাঠানো হয় সেগুলো হাযারা[১] আমরুহা এলাকা থেকে দেওয়া হবে। তখন সেখানকার গভর্নর ছিলেন আজিজ খাম্মার। আর আমির ছিলেন শামসুদ্দিন বদখশানি। আমি লোক পাঠালাম। সেই লোক কিছু খাদ্যশস্য তো পেল, কিন্তু আমির খাম্মারের অসদাচরণের অভিযোগও করল। সুতরাং বাকি খাদ্যশস্য আনতে আমি নিজে আমরুহায় গেলাম।

এই এলাকাটি দিল্লি থেকে তিন দিনের দূরত্বে। তখন ছিল বৃষ্টির মওসুম। আমার সঙ্গে ৩৩ জনকে নিলাম। দুজন গায়কও আমার সঙ্গে করে নিই। তারা দুজন সহোদর ছিল। তারা খুব ভালো গান গাইতে পারতো। আমরা বিজনুরে[২] পৌঁছে সেখান থেকে আরো তিনজন গায়ক নিই। তারা তিনজনও ছিল সহোদর ভাই। কখনো দুই ভাইয়ের আবার কখনো তিন ভাইয়ের গান আমরা শুনতাম। এভাবে আমরা আমরুহায় পৌঁছি। এটি একটি ছোট ও সুন্দর শহর। সেখানকার অধিবাসীরা আমাদের স্বাগত জানাতে শহরের বাইরে এগিয়ে আসে। শহরের কাজি শরিফ আলী এবং খানকার শায়খ উভয়ে এলেন। তারা দুজন মিলে আমাদের বেশ আপ্যায়ন করেন।

আজিজ খাম্মার তখন আফগানপুরে ছিলেন। যা সারযূ নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদীটি আমাদের ও আফগানপুরের মধ্যে প্রতিবন্ধক ছিল। সেখানে পার হওয়ার মতো কোনো নৌকা ছিল না। অবশেষে আমরা কাঠ ও গাছের নৌকা বানিয়ে আসবাবপত্রসহ পার হই। আমি নিজে দ্বিতীয় দিন নদীর পাড়ে যাই। আজিজ খাম্মারের ভাই নাজিব তার সাথীসঙ্গীদের নিয়ে আমাদের স্বাগত জানাতে আসেন। তিনি আমাদের জন্য একটি ক্যাম্প স্থাপন করেন। এরপর এলেন তার ভাই ওয়ালি। এই ব্যক্তি জালেম হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। দেড় হাজার গ্রাম ছিল তার অধীনে। যা থেকে উপার্জন হতো ষাট লাখ মুদ্রা। যা থেকে তিনি বিশ লাখ মুদ্রা পেতেন। এই নদীর বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বৃষ্টির সময় কেউ এর পানি পান করতে পারে না। কোনো

---

[১] মুরাদাবাদ জেলার একটি প্রসিদ্ধ এবং অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির স্মৃতিবিজরিত অঞ্চল।

[২] অত্যন্ত প্রাচীন একটি শহর। এখন অনেক উন্নত।

প্রাণীকেও পান করায় না। আমরা তিন দিন এই নদীর তীরে অবস্থান করলাম। কিন্তু এই নদীর পানি পান করলাম না। এমনকি এর ধারেকাছেও যাইনি। এই নদীটি হামালিয়া পাহাড় থেকে নির্গত হয়েছে। সেই পাহাড়ে স্বর্ণের খনি রয়েছে। সেখান থেকে পানি বিষাক্ত হয়ে বের হয়। সেই পানি যারাই পান করে মারা যায়। এই নদী তিন মাসের দূরত্ব পর্যন্ত অতিবাহিত হয়েছে। এই নদীর অপরদিকে 'তাবাত' রাজ্য। সেখানকার পাহাড়ে মুসলিমদের দুর্গতির কথা ইতিমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি।

এই শহরে আমার কাছে হায়দারি ফকিরদের একটি দল এলো। তারা প্রথমে গান শোনায়। পরে আগুন জ্বালায় এবং সেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আগুন তাদের সামান্যই ক্ষতি করতে পারে। সেই এলাকার আমির শামসুদ্দিন বদখশানি এবং গভর্নর আজিজ খাম্মারের মধ্যে কিছুটা বিরোধ ছিল। শামসুদ্দিন লড়াই করতে এলে আজিজ খাম্মার ঘরে ঢুকে বসে রইলেন। সবাই গিয়ে উযিরের কাছে অভিযোগ করল। উযির আমাকে, আমিরুল মামালিক মালিক শাহ, যার অধীনে চার হাজার শাহি গোলাম ছিল তাকে এবং শিহাবুদ্দিন রুমিকে পাঠালেন তাদের দুজনের বিরোধ মিটিয়ে দিতে। তাদের মধ্যে যে মিথ্যুক তাকে বেঁধে রাজধানীতে পাঠানোর নির্দেশও দিলেন। সবাই আমার ঘরে জড়ো হলেন।

আজিজ খাম্মার শামসুদ্দিনের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ আরোপ করেন। এর মধ্যে একটি ছিল, কর্মচারী রাজি মুলতানি আজিজ খাম্মারের রাজকোষের কোষাধ্যক্ষের ঘরে এসে মদপান করে এবং কোষাধ্যক্ষের পাঁচ হাজার দিনার নিয়ে যায়। আমি রাজিকে জিজ্ঞেস করলাম এ ব্যাপারে। সে জবাব দিল, আমি মুলতান থেকে এসেছি আট বছর হলো। এই সময়ে আমি কখনো মদপান করিনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তার মানে তুমি মুলতানে থাকতে মদপান করেছ? সে জবাবে বলল, হ্যাঁ। আমি তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করলাম। আজিজ খাম্মারের মুকাদ্দমায় তাকে গ্রেফতার করলাম। আমরুহায় দুই মাস অবস্থান করে আমি সেখান থেকে ফিরে আসি। সেখানে প্রতিদিন আমাদের জন্য একটি গরু জবাই করা হতো। আমাদের কয়েকজন সঙ্গীকে রেখে আসি, আজিজ খাদ্যশস্য নিয়ে আসবেন। তিনি গ্রামবাসীকে লিখে পাঠান, বিশ হাজার মণ খাদ্যশস্য যেন তিন হাজার গরুর ওপর বহন করে পৌঁছে দেওয়া হয়। হিন্দুস্তানবাসী গরু দ্বারা মালামাল বহন করে।

সফরের আসবাবপত্রও এভাবেই বহন করে। গাধার ওপর আরোহণ করাকে তারা বিস্ময়কর মনে করে। এখানে গাধা ছোট আকারের হয়ে থাকে। এগুলোকে তারা 'লাশা' বলে থাকে। কাউকে অসম্মান করার উদ্দেশ্য থাকলে তাকে বেত্রাঘাত করে গাধার ওপর আরোহণ করানো হয়।

আমার ওপর রাজদরবারের অভিযোগ

আমি দুনিয়াবিরাগী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিই

একদিন শায়খ শিহাবুদ্দিন ইবনে শায়খ জামের যিয়ারতের জন্য ওই গর্তে যাই যা তিনি দিল্লির বাইরে বানিয়েছিলেন। আমার বেশি আগ্রহ ছিল সেই গর্তটি দেখা। যখন বাদশাহ তাকে গ্রেফতার করলেন এবং তার ছেলেদের জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের বাবার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এই গর্তে কে কে এসেছিল, তখন তারা আমার নামও বলে দেয়। বাদশাহ নির্দেশ দিলেন, চারজন ক্রীতদাস যেন আমার ঘর পাহারা দেয়। যার ওপর বাদশাহর এই পাহারাদারি থাকে তার পক্ষে বাঁচা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। আমার ওপর পাহারাদারি শুরু হয় শুক্রবার। আমি 'হাসবুনাল্লাহু ওয়ানিমাল ওকিল' পড়া শুরু করি। ওইদিন আমি ৩৩ হাজার বার এই দোয়াটি পড়ি। রাতের বেলা বিচারালয়ে থাকি। পাঁচ দিনের একটি রোযা রাখি। প্রতিদিন একবার কুরআনে কারিম খতম করতাম আর পানি দ্বারা ইফতার করতাম।

পাঁচ দিন পর আমি রোযা ভাঙলাম। পরে আবার চার দিনের রোযা রাখি। শায়খকে হত্যার পর আমাকে মুক্ত করা হয়। আলহামদুলিল্লাহ এরপর আল্লাহ আমার অন্তরে চাকরির প্রতি অনীহা সৃষ্টি করে দেন। এরপর আমি বিশিষ্ট আলেম, আল্লাহভীরু, শায়খ কামালুদ্দিন আবদুল্লাহ গাজির খেদমতে যেতে থাকলাম। তিনি একজন খাঁটি ওলি ছিলেন। তার অনেক কারামাতের কথা প্রসিদ্ধ। আমি দুনিয়াবিরাগী হয়ে, সব ধনসম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করে শায়খের খেদমতে পড়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। শায়খ দশ দিন, অনেক সময় বিশ দিন লাগাতার রোযা রাখতেন। আমার মন চাইতো আমিও এভাবে রোযা রাখি। কিন্তু শায়খ আমাকে বারণ করতেন। বলতেন, ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজের প্রবৃত্তির ওপর কঠোরতা আরোপ করো না। এটাও বলতেন, অন্তর দিয়ে যারা তাওবা করে তাদের জন্য সফর করা কিংবা পায়ে হেঁটে চলার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার কাছে কিছু সম্পদ অবশিষ্ট ছিল। এগুলোর ভালোবাসা আমার অন্তর ছেয়ে রাখত। ফলে আমার কাছে যা কিছু

ছিল সব দান করে দিই। এমনকি নিজের পরার মতো কাপড়ও এক ফকিরকে দিয়ে দিই। আর সেই ফকিরের কাপড় নিজে পরি এবং এভাবে পাঁচ মাস শায়খের কাছে পড়ে থাকি।

বাদশাহ সিন্ধে গিয়েছিলেন। যখন বাদশাহর কাছে খবর পৌঁছে আমি দুনিয়াবিরাগী হয়ে গিয়েছি তখন তিনি আমাকে ডাকালেন। ওই সময় বাদশাহ সিহওয়ায় ছিলেন। আমি ফকিরের পোশাক পরে বাদশাহর সামনে হাজির হলাম। তিনি আমার সঙ্গে অনেক কোমলভাবে কথাবার্তা বলেন এবং আবার চাকরিতে যোগ দিতে বলেন। কিন্তু আমি সম্মত হলাম না। তার কাছে হজের অনুমতি প্রার্থনা করলাম। বাদশাহ অনুমতি দিয়ে দিলেন। আমি বাদশাহর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। একটি খানকা, যা মালিক বশিরের খানকা নামে পরিচিত ছিল, সেখানে অবস্থান করতে লাগলাম। তখন ৭৪২ হিজরির জুমাদাস সানির শেষ। আমি রজব মাসে শাবান মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত সেখানে একটি চিল্লা দিই। আস্তে আস্তে পাঁচ দিনের রোযা রাখতে শুরু করি। পঞ্চম দিনে সামান্য ভাত খেতাম লবণ ছাড়া। দিনভর কুরআন পড়তাম। আর রাতে যতটুকু সম্ভব তাহাজ্জুদ পড়তাম। খাবার খেলে অস্বস্তি লাগত। যতক্ষণ বমি না করতাম ততক্ষণ স্বস্তি পেতাম না। এভাবে আমি চল্লিশ দিন পূর্ণ করি।

চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর বাদশাহ আমার কাছে একটি ঘোড়া জিনসহ, বাঁদি-গোলাম ও প্রয়োজনীয় খরচপাতি পাঠালেন। আমি বাদশাহর দেওয়া কাপড় পরিধান করলাম। আমার কাছে একটি নীল রঙের জুব্বা ছিল, চিল্লার চল্লিশ দিন আমি সেটা পরা ছিলাম। আমি যখন নিজের জুব্বাটি রেখে বাদশাহর দেওয়া পোশাক পরলাম তখন নিজের প্রবৃত্তি তাতে সায় দিল না। যখন জুব্বার দিকে তাকাচ্ছিলাম তখন তাতে নূর পরিলক্ষিত হচ্ছিল। সেই জুব্বাটি আমার কাছে সবসময় ছিল। কাফেররা যখন আমার সবকিছু সমুদ্রে ফেলে দেয় তখন সেই জুব্বাটিও হারিয়ে যায়।

চীনের দূত হিসেবে আমার নিযুক্তি

সফরের প্রস্তুতি, দিল্লি থেকে রওনা, হিন্দুস্তানের গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ

যখন আমি বাদশাহর কাছে যাই আমাকে আগের চেয়ে বেশি সম্মান করেন। আর বলেন, আমি আপনাকে আমার পক্ষ থেকে দূত বানিয়ে চীনের বাদশাহর কাছে পাঠাতে চাই। কেননা আমার জানা আছে, সফর এবং দেশ

ভ্রমণে আপনার অনেক আগ্রহ। বাদশাহ সফরের সব আয়োজন করে দেন। আমার সঙ্গে যাওয়ার মতো লোকও নির্ধারণ করে দেন।

চীনের বাদশাহ তুঘলকের কাছে দামি দামি অনেকগুলো উপহার পাঠান। এর মধ্যে ছিল একশ গোলাম-বাঁদি, পাঁচশ থান উন্নতমানের কাপড়, পাঁচ মণ কস্তুরি, পাঁচটি রাজকীয় পোশাক, যাতে হিরা-মণি-মুক্তা খচিত ছিল এবং পাঁচটি উন্নতমানের তলোয়ার। আর এটাও অনুরোধ করেন, হিমালয় পর্বতে যে মন্দির রয়েছে তা পুনঃনির্মাণের যেন অনুমতি দেওয়া হয়। এই পর্বতে একটি জায়গা আছে যাকে 'সামহাল' বলা হয়, সেখানে চীনারা তীর্থ করতে আসে। বাদশাহ যখন সেখানে হামলা করেন তখন সেই মন্দিরটি গুঁড়িয়ে দেন।

তুঘলক জবাবে লিখলেন, মুসলিম দেশে যেসব অমুসলিম জিযিয়া কর দেয় তাদের ছাড়া আর কারো উপাসনালয় বানানোর অনুমতি নেই। চীনের বাদশাহ জিযিয়া কর দিলে অনুমতি মিলতে পারে।[১] সুতরাং চীনের বাদশাহ যে উপহার পাঠিয়েছিলেন এর চেয়েও বেশি উপহার পাঠালেন। এর মধ্যে ছিল অমুসলিম গোলাম-বাঁদি, যারা নাচ-গান জানত। একশ থান উন্নতমানের কাপড়, যা দেখতে অনেক আকর্ষণীয় ছিল। এক একটি থানের দাম ছিল শত শত দিনার। একশ থান রেশমি কাপড়, যাকে 'জুয' বলা হতো। যার মধ্যে পাঁচ রঙের রেশম ব্যবহার করা হতো। এছাড়া ছিল একশ চার থানা সালাহিয়া, একশ থান শিরিন বান ও পাঁচশ থান মারগার কাপড় (সাধারণ এক ধরনের কাপড়, যা মার্দিনে তৈরি হতো)। এর মধ্যে একশ থান কালো, একশ থান সাদা, একশ থান লাল, একশ থান সবুজ, একশ থান নীল রঙের ছিল। একশ থান ছিল কাতান রুমি। আরো ছিল একশ রুমাল। একটি ক্যাম্প, ছয়টি তাঁবু। সোনার তৈরি চারটি এবং রুপার তৈরি চারটি দীপাদার, যার ওপর ছিল মিনার। সোনার চারটি এবং রুপার ছয়টি পাত্র। দশটি শাহি খিলআত (বিশেষ শাহি কাপড়), দশটি রাজমুকুট, যাতে হিরা-মণি-মুক্তা খচিত ছিল। দশটি স্বর্ণের তূণী, যাতে মোতি খচিত ছিল। এ ছাড়া দশটি তলোয়ার যার খাপে মণি-মুক্তা খচিত ছিল। আর পনেরোজন যুবক ক্রীতদাস।

---

[১] একটু ভেবে দেখুন, সেটা কী যুগ ছিল! হিন্দুস্তানের বাদশাহ জিযিয়া কর চাচ্ছেন চীনের বাদশারর কাছে! চীন তখনো এত বড় দেশ ছিল, তখনো তারা পৃথিবীর পরাশক্তি ছিল। সেই বাস্তবতা আজ কতটা অবিশ্বাস্য!–রইস আহমাদ জাফরি।

এসব জিনিস বাদশাহ পাঠিয়ে দেন এবং আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য আমির জহির উদ্দিন যানজানিকে নির্দেশ দেন। তিনি বড় আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তি। যাবতীয় সাজসরঞ্জাম বাদশাহ তার ক্রীতদাস কাফুর শরবদারের তত্ত্বাবধানে পাঠান। আর আমাদেরকে সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে আমির মুহাম্মাদ হারবিকে এক হাজার বাহনসহ পাঠান। চীনের বাদশাহর দূতিয়ালি করতে এসেছিলেন পনেরোজন। দূতের নাম ছিল তারসি। তাদের সঙ্গে একশ খাদেম ছিল। তাদের সবাই আমাদের সঙ্গে রওনা দেন। এভাবে আমাদের সঙ্গী-সাথীদের একটি বড় জামাত হয়ে যায়। পুরো রাস্তায় যেন আমাদের আপ্যায়ন সরকারিভাবে হয় সেই নির্দেশ বাদশাহ দিয়ে দেন।

৭৪৩ হিজরির সফর মাসের ১৭ তারিখ আমরা রওনা করি। এই দেশে বেশির ভাগ দুই, সাত, বারো, সতেরো, বাইশ অথবা সাতাইশ তারিখে সফর করে। প্রথম দিন আমরা 'তিলপত' নামক স্থানে অবস্থান করি, যা দিল্লি থেকে সাত আট মাইল দূরত্বে। এরপর 'আও', পরে 'বায়ানা' নামক স্থানে পৌঁছি।

'বায়ানা' শহরে আমাদের অবস্থান

'বায়ানা'[১] অনেক বড় একটি সুন্দর শহর। এর বাজার অনেক সুন্দর। জামে মসজিদও বিরল স্থাপত্যশৈলীতে বানানো। এর দেয়াল ও ছাদ পাথরের তৈরি। বাদশাহ মুজাফফরের ধাত্রীর ছেলে সেখানকার প্রশাসক। এর আগে মালিক মুজির ইবনে আবি রেজা সেখানকার প্রশাসক ছিলেন। তার আলোচনা আমি পেছনে করে এসেছি। তিনি নিজেকে কুরাইশ বংশের বলে দাবি করতেন। কিন্তু অত্যন্ত অত্যাচারী ও নির্মম ছিলেন। তিনি এই শহরের অনেক বাসিন্দাকে হত্যা করেন। অনেক লোকের হাত-পা কেটে দেন।

'কুল' এ আগমন, হিন্দুদের সঙ্গে জিহাদ, বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা

পরে আমরা 'কুল'[২] শহরে পৌঁছি। এখানে বাগান অনেক বেশি। বেশির ভাগ বাগান আমের। আমরা শহরের বাইরে ময়দানে অবস্থান করছিলাম। সেখানে

---

[১] এই শহর ভরতপুর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ৫১২ হিজরিতে সেনাপতি মাসউদ গাজি এই শহর জয় করেন। মুসলিম শাসনামলের অনেক কীর্তি এখানে রয়েছে। এখানে প্রচুর মুসলিম বাস করে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর, সেখানে কিছু থাকলেও তা না থাকার মতোই।

[২] কুলি, বর্তমান আলিগড়।

আমরা শায়খ সালেহ আবেদ শামসুদ্দিন, যিনি তাজুল আরেফিন উপাধিতে প্রসিদ্ধ, তার সাক্ষাৎ লাভ করি। তিনি দৃষ্টিহীন ছিলেন। অশীতিপর বৃদ্ধ। আমরা যখন 'কুল'-এ পৌঁছলাম তখন খবর এলো হিন্দুরা জালালি[১] শহর অবরোধ করেছে। এই শহরটি 'কুল' থেকে সাত মাইল দূরত্বে। আমরা সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। ওই শহরের বাসিন্দারা হিন্দুদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। তারা পরাজিত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে ছিল। আমরা আসছি সেটা হিন্দুরা জানত না। আমরা তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালালাম। তারা এক হাজার অশ্বারোহী এবং তিন হাজার পদাতিক সৈন্যের বাহিনী ছিল। আমরা তাদের সবাইকে হত্যা করলাম। তাদের ঘরবাড়ি এবং অস্ত্রশস্ত্রের ওপর দখল নিলাম। আমাদেরও ৩৩ জন অশ্বারোহী এবং ৫০ জন পদাতিক সেনা শহীদ হন। শরবদার যার তত্ত্বাবধানে চীনের বাদশাহর উপঢৌকন ছিল, তিনি লড়াইয়ে শহীদ হন। আমরা বাদশাহকে তার শাহাদতের খবর জানাই। বাদশাহর জবাবের প্রতীক্ষায় সেখানে অবস্থান করতে থাকি।

হিন্দুরা পাহাড়ের গুহা থেকে বেরিয়ে বেরিয়ে জালালি শহরে হামলা করত। আমাদের আমির প্রতিদিন আমাদেরকে নিয়ে তাদের মোকাবেলার জন্য যেতেন। একদিন আমি একটি জামাতের সঙ্গে বাহনে চড়ে বের হলাম। আমরা সবাই একটি বাগানে প্রবেশ করলাম। তখন ছিল গরমকাল। আমরা গোলযোগের আওয়াজ পেলাম। বাহনে চড়ে একটি গ্রামে গেলাম, যেখানে হিন্দুরা হামলা চালিয়েছিল। আমরা তাদের পিছু নিলাম। তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। আমার সাথীসঙ্গীরাও তাদের পেছনে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে গেল। আমার সঙ্গে মাত্র কয়েকজন রয়ে গেল।

হঠাৎ ঝোঁপের ভেতর থেকে কয়েকজন অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা বেরিয়ে এলো। তারা আমাদের ওপর হামলা করে বসল। আমরা যেহেতু সংখ্যায় কম ছিলাম এজন্য পালাতে লাগলাম। তাদের মধ্য থেকে দশজন আমাদের পিছু নিল। এবার আমরা শুধু তিনজন রয়ে গেলাম। পাথুরে ভূমি, কোনো রাস্তা চোখে ভাসছিল না। আমার ঘোড়ার সামনে পা পাথরের ভেতর আটকা পড়ে গেল। আমি নিচে নামলাম এবং ঘোড়ার পা বের করলাম। এরপর

---

[১] জালালি একটি ছোট শহর, যা আজও আবাদ আছে। আলিগড় থেকে কয়েক মাইল দূরত্বে।–রইস আহমাদ জাফরি।

পুনরায় ঘোড়ায় আরোহণ করলাম। এখানকার নিয়ম হলো, সঙ্গে দুটি তলোয়ার থাকে। একটি ঘোড়ার জিনে ঝুলানো থাকে, যাকে রিকাবি বলা হয়। আরেকটি তিরকাশে। আমার রিকাবি তলোয়ারটি খাপ থেকে নিচে পড়ে যায়। এর হাতল ছিল সোনার। এজন্য এটি নেওয়ার জন্য ঘোড়া থেকে নিচে নামলাম এবং এটি নিয়ে জিনে ঝুলিয়ে নিলাম। আমার পেছনে পেছনে শত্রুরা ঘোড়ায় চড়ে আসছিল। আমি একটি পরিখার পাশে পৌঁছলাম এবং তাতে নেমে গেলাম। এর দ্বারা তাদের দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেলাম। পরিখার মধ্য দিয়ে পানির একটি পথ ছিল। যার দুই পাশে গাছগাছালি ঝুলে ছিল। মাঝখান দিয়ে রাস্তা। আমি সেই পথ ধরলাম। কিন্তু এই রাস্তা কোথায় নিয়ে যাবে সেটা আমার জানা ছিল না। হঠাৎ প্রায় চল্লিশজনকে দেখা গেল, যাদের হাতে ছিল তির। তারা আমাকে ঘিরে ফেলল। আমার আশঙ্কা হলো, পালানোর চেষ্টা করলে কেউ তির মেরে বসতে পারে। কেননা ওই সময় আমার গায়ে লৌহবর্ম ছিল না। এজন্য আমি মাটিতে শুয়ে গেলাম। আর ইশারায় বললাম, আমি তোমাদের বন্দি। কেউ যখন এমনটা করে তখন তাকে সাধারণত হত্যা করা হয় না। তারা আমাকে গ্রেফতার করে নিল। আমার শরীর থেকে কাপড় খুলে ফেলল। শুধু একটি জুব্বা, একটি পাজামা ও কামিস গায়ে ছিল। আমাকে ঝোঁপের ভেতরে নিয়ে গেল।

এক লোক একটি হাউজের কিনারে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকেও সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। এই হাউজটি ছিল গাছগাছালির মধ্যখানে। সেখানে পৌঁছার পর তারা আমাকে মাস কালাইয়ের রুটি খেতে দিলো। আমি তা খেলাম এবং পানি পান করলাম। তাদের সঙ্গে দুজন মুসলিমও ছিল। আমি কে সে সম্পর্কে তারা আমাকে ফারসিতে জিজ্ঞেস করল। আমি আমার পরিচয় তুলে ধরলাম। তবে আমি যে বাদশাহর চাকুরে সেটা বললাম না। তারা এক লোকের দিকে ইশারা করে আমাকে বললো, এই লোক তোমাকে অবশ্যই হত্যা করে ফেলবে। লোকটি ছিল তাদের সর্দার। আমি দুই মুসলমানের কাছে তাদের পরিচয় জানতে চাই এবং এক পর্যায়ে তাদের সঙ্গে খোশালাপে মগ্ন হয়ে যাই।

তারা আমাকে তিন ব্যক্তির কাছে সোপর্দ করে দিল। তাদের একজন ছিল বৃদ্ধ লোক। আরেকজন তার ছেলে। আর তৃতীয়জন ছিল খবিস প্রকৃতির কৃষ্ণাঙ্গ। তারা ওই লোকদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলল। তারা যে আমাকে হত্যার নির্দেশ দিচ্ছে সেটা আমি টের পাইনি। তারা আমাকে তুলে একটি

গর্তের দিকে নিয়ে গেল। বৃদ্ধ ও কৃষ্ণাঙ্গ লোকটির গায়ে জ্বর এলো এবং কাঁপুনি শুরু হলো। তারা আমার ওপর পা রেখে দিল। বৃদ্ধ ও তার ছেলে শুয়ে গেল। যখন সকাল হয়ে গেল তারা কথাবার্তা শুরু করল। আমার দিকে ইশারা করে বলল, আমাদের সঙ্গে হাউজের কাছে চলো। আমি বুঝে গেলাম, তারা আমাকে হত্যা করতে চাচ্ছে। আমি বৃদ্ধকে অনেক খোশামোদ করলাম। তার অন্তরে দয়ার উদ্রেক হলো। আমি আমার জামার আস্তিন দুই টুকরো করে তাকে দিলাম যাতে তিনি তার সঙ্গীদের দেখাতে পারেন যে, কয়েদি জোরজবরদস্তি করে পালিয়ে গেছে।

যখন যোহরের সময় হলো আমি হাউজের পাশে কয়েকজনের আওয়াজ শুনতে পেলাম। বৃদ্ধ জানতে পারলেন তার সাথীসঙ্গীরা এসে পৌঁছেছে। তিনি আমাকে তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য ইশারা করলেন। আমি যখন হাউজের পাড়ে পৌঁছলাম সেখানে দেখতে পেলাম সুদর্শন এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। সে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, তুমি কি চাও আমি তোমাকে ছেড়ে দিই। আমি বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, যাও চলে যাও। আমি আমার জুব্বাটি খুলে তাকে দিয়ে দিলাম। সে তার পুরোনো জামা আমাকে দিল। আর রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে বলল, এই রাস্তা ধরে চলে যাও। আমি চলা শুরু করলাম। কিছু দূর এক ব্যক্তিতে দেখতে পেলাম। লক্ষ করলাম তিনি কৃষ্ণাঙ্গ। তার হাতে লুটা ও লাঠি। আর কাঁধে একটি ঝুলি। সেই ব্যক্তি আমাকে সালাম দিলেন। আমি সালামের জবাব দিলাম। আমি কে সেটা তিনি আমাকে ফারসিতে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, রাস্তা ভুলে গেছি। তিনি বললেন, আমিও রাস্তা ভুলে গেছি। এরপর তিনি সঙ্গে থাকা লুটা রশিতে বেঁধে পানি তুললেন। আমি পানি খেতে চাইলাম। তিনি বললেন, ধৈর্য ধরো। তিনি ঝুলি থেকে খাবার বের করলেন। আমি তা খেলাম এবং পানি পান করলাম। তিনি অযু করে দুই রাকাত নামায পড়লেন। আমিও অযু করলাম এবং নামায পড়লাম।

ওই ব্যক্তি আমাকে নাম জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, আমার নাম মুহাম্মাদ। পরে আমি তার নাম জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, কলব ফারেহ (খুশি মন)। আমি বললাম, ভাগ্য তো তাহলে ভালো। আমি চলা শুরু করলাম। তিনি বললেন, আমার সঙ্গে চলো। আমি বললাম, ঠিক আছে। কিছু দূর তার সঙ্গে যাওয়ার পর আমার অঙ্গগুলো যেন আর চলছিল

না। আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না, এক পর্যায়ে বসে গেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী অবস্থা? আমি বললাম, আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের আগে চলতে পারছিলাম। কিন্তু এখন আর চলতে পারছি না। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! এসো আমার গর্দানে চড়ো। আমি বললাম, আপনি তো বৃদ্ধ মানুষ, আমাকে বহন করতে পারবেন না। তিনি বললেন, তোমাকে আরোহণ করতে হবে, আল্লাহ আমাকে শক্তি দেবেন। আমি তার গর্দানে আরোহণ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি 'হাসবুনাল্লাহু নিমাল ওকিল' পড়তে থাকো। আমি ওই যিকির শুরু করলাম। এক পর্যায়ে আমার ঘুম চলে এলো। যখন তিনি আমাকে মাটিতে শুইয়ে দিলেন তখন আমার চোখ খুলল। আমি জাগ্রত হলাম, কিন্তু ওই ব্যক্তিকে আর দেখতে পেলাম না। আমি নিজেকে একটি জনপদে আবিষ্কার করলাম। সেখানে গিয়ে দেখতে পেলাম সেখানকার বাসিন্দারা হিন্দু। তবে তারা বাদশাহর প্রজা। আর তাদের প্রশাসক মুসলিম। তিনি লোকদের কাছে খবর পেয়ে আমার কাছে এলেন। আমি তার কাছে এই গ্রামের নাম জানতে চাইলাম। তিনি জানালেন তাজপুরা। এখান থেকে 'কুল' শহর দুই ক্রোশ দূরত্বে।

ওই প্রশাসক আমাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আমাকে গরম গরম খাবার খাওয়ালেন এবং গোসল করালেন। আর বললেন, আমার কাছে একটি ঘোড়া এবং একটি পাগড়ি আছে, যা এক ব্যক্তি আমার কাছে রেখে গেছে। আমি বললাম, সেটা আনুন, আমি পরব। যখন আনা হলো মনে হলো আমারই কাপড়। আমি অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। আর ভাবতে লাগলাম, ওই ব্যক্তি যে আমাকে কাঁধে করে নিয়ে এসেছেন তিনি আসলে কে? আমার মনে পড়ল, আমাকে আল্লাহর ওলি আবু আবদুল্লাহ মোরশেদি বলেছিলেন, তুমি হিন্দুস্তানে গেলে আমার ভাই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। আর সে তোমাকে একটি বিপদ থেকে রক্ষা করবে। আমার মনে পড়ল, আমি নাম জিজ্ঞেস করেছিলাম। তখন তিনি দিলশাদ নাম বলেছিলেন। আর কালব ফারেহ অর্থও সেটাই। এবার আমার বিশ্বাস হলো, তিনি ওই ব্যক্তি যার ব্যাপারে বলেছিলেন আমার মুর্শিদ শায়খ আবু আবদুল্লাহ মোরশেদি। আর তিনি নিশ্চিত ভাবে আল্লাহর ওলি। আফসোস হলো, আমি তার সান্নিধ্য বেশি সময় লাভ করতে পারিনি।

ওই রাতেই আমি ক্যাম্পে চলে আসি এবং সুস্থভাবে ফিরে আসার খবর জানাই। তারা আমার কাছে ঘোড়া ও কাপড় নিয়ে আসে। আমার ফিরে

আসায় সবাই খুব খুশি হন। ইতিমধ্যে বাদশাহর জবাবও চলে আসে। তিনি সানবাল নামে আরেক ক্রীতদাসকে পাঠান শহীদ হওয়া কাফুরের পরিবর্তে। আর আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন সামনে অগ্রসর হতে এবং সফর অব্যাহত রাখতে। আমি জানতে পারলাম, ক্যাম্পের লোকেরা আমার অবস্থাও বাদশাহকে লিখে পাঠান। কাফুর শহীদ হয়ে যাওয়া এবং আমার বন্দি হয়ে যাওয়াকে অশুভ মনে করে তারা বাদশাহর কাছে ফিরে যাওয়ার আবেদন করেছিলেন। বাদশাহ যখন সফর অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিলেন তখন আমরাও এ ব্যাপারে দৃঢ় মনোভাব পোষণ করি।

আমরা 'কুল' থেকে রওনা দিই। পরদিন বরজপুরায় অবস্থান করি। সেখানে একটি উন্নতমানের খানকা ছিল। সেখানে একজন শায়খ ছিলেন, যিনি দেখতে এবং আচরণে অত্যন্ত ভালো। তার নাম ছিল মুহাম্মাদ ইরয়ান। আমরা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। এই শায়খ শরীরে শুধু একটি লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। বাকি পুরো শরীর ছিল নগ্ন। আল্লাহর ওলি এই শায়খ মিশরের সাকিন কিরাফার শাগরেদ ছিলেন। তিনি অনেক বড় ওলি ছিলেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। নাভি থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত ঢাকে এমন একটি লুঙ্গি পরে থাকতেন। বলা হয়ে থাকে, ইশার নামাযের পর তার খানকায় খাবারদাবার ও পানীয় যা কিছু থাকে তা গরিবদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। বাতিও নিভিয়ে ফেলতেন। আগামীকাল কী হবে সেটা নিয়ে কোনো কিছু তিনি ভাবতেন না।

কালিনদী ও কানৌজ

বরজপুর থেকে রওনা দিয়ে আমরা একটি নদীর কাছে গেলাম। যার পানি ছিল কালো, যাকে কালিনদী বলা হতো। এরপর কানৌজে[১] পৌঁছি। এটি অনেক বড় শহর। এর দুর্গ অনেক মজবুত। কম দামে চিনি এবং বিভিন্ন ফসলের জন্য জায়গাটি বিখ্যাত। এখানকার চিনি দিল্লিতে যায়। এখানকার

---

[১] অনেক প্রাচীন শহর। ফারাখ আবাদ উত্তর প্রদেশে অবস্থিত। এটি সেই সময় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনেক বড় কেন্দ্র ছিল। রাজনৈতিক বিচারেও গোটা হিন্দুস্তানের ওপর তাদের প্রাধান্য ছিল। ৪০০ হিজরিতে চীনা পর্যটক ফাহইয়ান বুদ্ধ এখানকার নিদর্শন দেখতে আসেন এবং তিনি এই জায়গার আলোচনাও করেছেন।

মাহমুদ গজনবি ও শিহাবুদ্দিন ঘুরি তাদের আমলে এখানে আক্রমণ করেন এবং জয় লাভ করেন। বর্তমানে এটি একটি সাধারণ জনপদ। তবে এখনো মুসলমানদের নিদর্শন কালের সাক্ষী হয়ে আছে।

সীমানা প্রাচীরও অনেক উঁচু। এখানে শায়খ মুঈনুদ্দিন বাখারজি বসবাস করতেন। তিনি আমাদের দাওয়াত করেন। এই শহরের প্রশাসক ফিরোজ বদখশানি বাহরাম। এই শহরে শরফ জাহাঁর অনেক নেককার বংশধর অবস্থান করে। তাদের দাদা ছিলেন দৌলতাবাদের প্রধান বিচারপতি। সৎকর্ম ও দান-খয়রাতে তারা বিখ্যাত।

হানুল, উজিরপুর, বাজালাসা ও মুরিতে প্রবেশ

কানুজ থেকে রওনা দিয়ে আমরা হানুলে পৌঁছি। সেখান থেকে উজিরপুর। পরে বাজালাস, পরে মুরিতে। এটি একটি ছোট শহর। তবে বাজার বেশ উন্নত। সেখানে আমরা কুতুবুদ্দিন হায়দার গাজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি অসুস্থ ছিলেন। তিনি আমার জন্য দোয়া করেন এবং যবের একটি রুটি আমাকে দান করেন। তিনি বলেন, আমার বয়স দেড়শ বছর। তার বন্ধু জানান, তিনি সবসময় রোযা রাখেন। অনেক সময় কয়েক দিন পরপর ইফতার করেন। বেশিরভাগ সময়ই ইতেকাফ ও চিল্লারত অবস্থায় থাকেন। চল্লিশ দিনে মাত্র চল্লিশটি খেজুর খান। প্রতিদিন একটি করে খেজুর। এরপর আমরা মুরি শহরে পৌঁছি। এটি একটি বড় শহর। এখান বেশির ভাগ অধিবাসী হিন্দু জিম্মি। এখানে দুর্গও আছে। এখানে গম ভালো হয়। দিল্লিতে যায় এখানকার গম। এ ধরনের গম আমি চীন ছাড়া আর কোথাও দেখিনি। লম্বা দানা, হলুদ বর্ণের, মোটা মোটা। এই শহর মালুহ জাতির দ্বারা পরিচিত। এটি হিন্দুদের একটি গোত্র, যারা দেখতে-শুনতে বেশ সুদর্শন। তাদের নারীরা খুবই সুশ্রী। একান্তে মনোরঞ্জনে বেশ পটু[১] এবং স্বাদ আস্বাদন করাতে প্রসিদ্ধ। যেমন মারাঠা[২] ও মালদ্বীপের নারীরা।

আলাপুর শহর ও সেখানকার শাসকের পরিণতি

পরে আমরা আলাপুর পৌঁছি। এটি একটি ছোট শহর। এখানকার অধিবাসীরা বেশির ভাগ হিন্দু, যারা সুলতানের প্রজা। এখান থেকে এক দিনের দূরত্বে এক হিন্দু রাজার এলাকা রয়েছে, যার নাম কুসম। এর

---

[১] তাঁর অলংকারের কোনো তুলনা হয় না।

[২] ইবনে বতুতার মূল আরবি ভাষ্য হলো,

"وهن مشهورات بطيب الخلوة وقرة الحظ من اللذة"

তিনি যে উদাহরণ পেশ করেছেন তাতে মনে হয় তাঁর অভিজ্ঞতাও বেশ সমৃদ্ধ।

রাজধানীর নাম জানিল। এই রাজা গোয়ালিয়ার অবরোধ করেছিলেন। এরপর তিনি নিহত হন। এই রাজা রাবড়িও অবরোধ করেন। এটি যমুনা নদীর তীরে। অনেক গ্রাম ও কৃষি অঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত। সেখানকার গভর্নর ছিলেন খাত্তাব আফগান। এই ব্যক্তি অনেক বাহাদুর ছিলেন। তিনি বাদশাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং রাজা কুসম রাজা রুজুর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন, যার রাজধানী ছিল সুলতানপুর। উভয়ে মিলে রাবড়ি অবরোধ করেন। বাদশাহ সাহায্য পাঠাতে দেরি করেন। কেননা এই জায়গাটি রাজধানী থেকে চল্লিশ মঞ্জিল দূরত্বে। খাত্তাব আফগানি হিন্দুরা বিজয়ী হয়ে যায় কি না, এটা ভেবে ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি তিনশ পাঠান, তিনশ ক্রীতদাস, চারশর মতো অন্যান্য লোক জড়ো করলেন এবং সবাই তাদের পাগড়ি ঘোড়ার গলায় বেঁধে নিলেন। এই দেশের নিয়ম হলো, যখন 'হয় মরব নয় মারব'র মতো চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন এমনটা করা হয়। তিনি নিজের লোকদের নিয়ে শহর থেকে বের হলেন এবং হিন্দুদের ওপর হামলা করে পনেরো হাজার লোককে পরাজিত করে দিলেন। দুই রাজাও এতে নিহত হন। পরে তাদের মাথা সুলতানের কাছে দিল্লিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হিন্দুদের বাহিনীর শুধু তারাই প্রাণে বাঁচে যারা পালিয়ে যায়।

গোয়ালিয়ারে এক হিন্দুকে আমি প্রাণে রক্ষা করি

পরে আমরা গোয়ালিয়ার (গালিয়ুর) দিকে গেলাম। এটাকে গোয়ালিয়াও বলা হয়। এটি একটি বড় শহর। এর দুর্গ[১] খোলা প্রান্তরে অত্যন্ত মজবুত করে গড়ে তোলা হয়েছে। দুর্গের দরজায় হাতি ও ফিলবানের মূর্তি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। এই শহরের প্রশাসক আহমাদ বিন শের খাঁ ফাযেল। এই সফরের আগেও একবার আমি তার কাছে অবস্থান করেছিলাম। তখনো তিনি আমার অনেক খাতির-যত্ন করেন। একদিন আমি তার কাছে গেলাম। তখন তিনি এক কাফের অপরাধীকে দুই টুকরো করতে চাচ্ছিলেন। আমি তাকে আল্লাহর কসম দিয়ে এটা না করতে অনুরোধ করলাম। কেননা আজ পর্যন্ত আমি নিজের চোখের সামনে কাউকে হত্যা করতে দেখিনি। তিনি আমার খাতিরে ওই ব্যক্তিকে বন্দি করে রাখার নির্দেশ দিলেন। এভাবে ওই ব্যক্তি প্রাণে রক্ষা পায়।

---

[১] এই দুর্গে আলমগিরি মসজিদের কাছে একটি সুরম্য মসজিদ রয়েছে, যা বিভিন্ন খানেরা বানিয়েছেন। এটি সম্পর্কে কর্নেল সেমনের ভাষ্য হলো, 'যেন এইমাত্র নির্মাতারা কাজ সম্পন্ন করেছে।' ইংরেজরা ১৮৫৮ সালে এই দুর্গটি মহারাজা গোয়ালিয়ারকে ঝানসি শহরের বিনিময়ে দিয়ে দেয়।

গোয়ালিয়ার থেকে বেরিয়ে আমরা বারদান গেলাম। এটি মুসলিম অধ্যুষিত একটি ছোট শহর। এর গভর্নর মুহাম্মাদ বিন বৈরম তুর্কি। এই শহরে হিংস্র প্রাণী অনেক বেশি।

বারদান শহর থেকে আমরা আমওয়ারি গেলাম। সেখান থেকে গেলাম কেচরাদ। সেখানে একটি বড় হাউজ আছে। যা দৈর্ঘ্যে এক মাইলের মতো। এর পাড়ে মন্দির ও মূর্তিঘর রয়েছে। মূর্তির চোখ, নাক ও কান সবকিছু মুসলমানেরা ভেঙে ফেলেছে। পুকুরের মধ্যখানে লাল পাথরের তিনটি গম্বুজ রয়েছে। আর চার কোণায় রয়েছে চারটি গম্বুজ। এসবের মধ্যে সাধু-সন্ন্যাসীরা থাকে। তাদের চুলগুলো পা পর্যন্ত লম্বা। সাধনার কারণে তাদের গায়ের রং হলদেটে হয়ে গেছে। অনেক মুসলমানও তাদের পিছু পিছু ছুটে যাতে এই বিদ্যা শিখতে পারে।

পরে আমরা চান্দ্রি পৌঁছি। এটি একটি বড় শহর। বাজারে অনেক বড় বড় আম পাওয়া যায়। এই গোটা অঞ্চলের আমির ইয্যুদ্দিন মুলতানি, যিনি 'আজম মুলক' উপাধিতে ভূষিত, তিনি এই শহরে থাকেন। তিনি অত্যন্ত উপকারকারী ও সম্মানী ব্যক্তি। জ্ঞানীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন। ফকিহ ইয্যুদ্দিন জুবায়রি, ওজিহুদ্দিন বায়ানবি, কাজি খাচ্ছা ও ইমাম শামসুদ্দিন তার বন্ধু। তার রাজকোষের সহকারী কামরুদ্দিন। আর সেনাবাহিনীর দায়িত্বে সাআদত তালাঙ্গি। এই ব্যক্তি বড় বীরপুরুষ হিসেবে পরিচিত। তিনি নিজেই সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধান করেন। মালিক আজম শুধু জুমার দিন বাইরে বের হন।

দাহহার: সত্য ভালোবাসার কাহিনি, একই কবরে প্রেমিক-প্রেমিকা

চান্দ্রি থেকে আমরা জাহহার (দাহহার) পৌঁছি। এটি মালুহের সবচেয়ে বড় শহর। এখানে প্রচুর ফসল হয়। বিশেষ করে বিপুল পরিমাণ গম উৎপন্ন হয়। এখানকার পান দিল্লিতে যায়। এখান থেকে দিল্লির দূরত্ব ২৪ মনযিল।[১] পুরো রাস্তায় পাথরের খোদাই করে দূরত্ব লেখা আছে। এতে মুসাফিররা সহজেই বুঝতে পারে আজ কতটুকু অতিক্রম করল এবং গন্তব্য আর কতটুকু দূরে আছে। রাস্তার পাশের পাথর দেখেই মনে পড়ল এই শহর শায়খ ইবরাহিম মালদিবির জায়গির। এই শহরে ভাগিনা তার মামা খাজা জাহাঁকে

[১] মুসলিম যুগে এই শহর মালুহের রাজধানী ছিল। পরে এই মর্যাদা লাভ করে মান্ডো। যেখানে রূপমতি ও বাজ বাহাদুরের সত্যিকারের ভালোবাসা জন্ম নেয়।

গ্রেফতারের পরিকল্পনা করেছিলেন। পুরো রাজভান্ডার দখল করে বিদ্রোহী হাসান শাহের কাছে চলে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মামা সেই পরিকল্পনার কথা জেনে যান। তাকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়। সাথীসঙ্গীসহ তাকে বাদশাহর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাদশাহ সেই আমিরদের হত্যার নির্দেশ দেন। আর উযিরের ভাগিনাকে যখন তার কাছে আনা হয় তখন তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। উযিরের ভাগিনার একজন বাঁদি ছিল, তিনি যার প্রেমে পড়েছিলেন। অন্তিম ইচ্ছা হিসেবে তিনি আবেদন করলেন, ওই বাঁদিকে যেন তার সামনে আনা হয়। সুতরাং বাঁদিকে আনা হলো। তিনি বাঁদির হাতে পান খেলেন এবং নিজে পান বানিয়ে বাঁদিকে খাওয়ালেন। পরে দুজন পরস্পরের সঙ্গে গলা লাগিয়ে শেষ বিদায় নেন। এরপর তাকে হাতির পায়ে পিষ্ট করে হত্যা করা হয় এবং গায়ের চামড়া তুলে এর ভেতরে ভুসি ভরে দেওয়া হয়। রাতের বেলা ওই বাঁদি বাইরে বের হয়। তার প্রেমিককে হত্যার জায়গাটিতে একটি কূপ ছিল, তাতে পড়ে সে মারা যায়। পরদিন কূপে লাশ পাওয়া যায়। পরে তা উদ্ধার করা হয় এবং উভয়কে একই কবরে দাফন করা হয়। এই কবরকে 'গোরে আশেকা' (প্রেমিক-প্রেমিকার কবর) বলা হয়।

দাহহার থেকে রওনা দিয়ে আমরা উজ্জিন পৌঁছি। এটি একটি সুন্দর শহর। এর দালানগুলো অনেক উঁচু উঁচু।

দৌলতাবাদ : সেখানকার সৌন্দর্য, বাজার ও মারাঠা নারীরা

উজ্জিন থেকে আমরা দৌলতাবাদ[১] পৌঁছি। এটি অনেক বড় একটি শহর। যা দিল্লির সঙ্গে পাল্লা দেয়। এই শহর তিনটি ভাগে বিভক্ত। একটি অংশকে দৌলতাবাদ বলা হয়। এখানে বাদশাহ ও সরকারি বাহিনী থাকে। দ্বিতীয় অংশকে কাতকাতা বলা হয়। তৃতীয় অংশে দেওগির, এটি মজবুতের দিক থেকে অদ্বিতীয়। বাদশাহর উস্তাদ খানে আজম কুতলু এই দুর্গে থাকেন। সাগের ও তেলেঙ্গানাও তার অধীনে। তার এলাকা তিন মাইল দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। তার পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিনিধি নিযুক্ত রয়েছে।

---

[১] দৌলতাবাদ এর আগে দেওগড় নামে পরিচিত ছিল। এটি আলাউদ্দিন খিলজি ১২৯৪ খ্রিস্টাব্দে জয় করেন। মুহাম্মাদ তুঘলক দিল্লি বাদ দিয়ে এটাকে ভারতবর্ষের রাজধানী করেছিলেন। ইংরেজদের শাসনামলে এটি দৌলতে আসফিয়া অর্থাৎ হুকুমতে নেযামের একটি অংশ হয়ে যায়। নেযাম সাম্রাজ্য এখন আর নেই। বর্তমানে এটি অন্ধ্র প্রদেশে পড়েছে।

দেওগড় দুর্গটি একটি টিলার ওপর অবস্থিত। চার দিকে মাটি খুঁড়ে টিলাটি বানানো হয়েছে। চামড়ার সিঁড়ি দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করে। রাতের বেলা সিঁড়িটি তুলে নেওয়া হয়। দুর্গের নিরাপত্তা রক্ষী পরিবারসহ সেখানে থাকেন। সেখানে একটি বন্দিশালা আছে, যেখানে বড় বড় অপরাধীদের রাখা হয়। এই বন্দিশালায় এমন বড় বড় ইঁদুর রয়েছে যাদের বিড়ালও ভয় করে। কোনো বাহানা ছাড়া এগুলো শিকার করতে পারে না। মালিক খাত্তাব আফগান বর্ণনা করেন, তাকে একবার ওই দুর্গের বন্দিশালায় বন্দি করা হয়। তিনি বলেন, রাতে ইঁদুরগুলো জড়ো হয়ে আমার ওপর হামলা করে। আমি সারা রাত ইঁদুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকি। এক রাতে স্বপ্নে দেখি, কেউ একজন এসে বলছেন, তুমি সূরা ইখলাস এক লাখ বার পড়, তাহলে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে। সত্যিই আমি এক লাখ বার সূরা ইখলাস পড়ার পর এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাই।

আমার মুক্তির পেছনে একটি ঘটনা আছে। আমার পাশেই বন্দিশালায় বন্দি ছিলেন মালিক মুল। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ইঁদুর তার আঙুল ও চোখ খেয়ে ফেলল। এতে তিনি মারা গেলেন। বাদশাহর কাছে যখন এই খবর গেল তখন তিনি বললেন, খাত্তাবকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে এসো। তাকে আবার ইঁদুর যেন খেয়ে না ফেলে।

দৌলতাবাদের অধিবাসীদের মারাঠি বলা হয়। এখানকার নারীরা খুবই সুদর্শন হয়। বিশেষ করে তাদের নাক ও ভ্রু অসাধারণ। একান্ত মনোরঞ্জন ও সহবাসে তারা অদ্বিতীয়।[১] অন্য কোনো এলাকার নারীরা তাদের ধারেকাছেও না। এই শহরে হিন্দুরা ব্যবসা করে। বেশির ভাগই স্বর্ণের ব্যবসায়ী। তারা অনেক সম্পদশালী। তাদেরকে শাহ (মহাজন) বলা হয়। যেমন মিশরের ব্যবসায়ীদের মাকারিম বলা হয়। দৌলতাবাদে আম ও আনার অনেক বেশি হয়। বছরে দুই বার ফলন হয়। অধিক ফলন এবং আয়তনে বড় হওয়ার কারণে এখানকার আয়ও অন্যান্য এলাকার চেয়ে অনেক বেশি। এক হিন্দু লোক গোটা এলাকার ঠিকাদারি তেরো কোটিতে

---

[১] ইবনে বতুতা স্বীয় অনুভূতি অত্যন্ত বিশদ ও চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। নিচে অনুবাদ ছাড়াই হুবহু আরবিটুকু লিপিবদ্ধ করা হলো। আরবি ভাষা পারদর্শীরা সানন্দাচিত্তে উপলব্ধি করতে পারবে,

"خص الله نساءهم بالحسن وخصوصا في الألوف والحواجب ولهن من طيب الحلوة والمعرفة بحركات الجماع ما ليس لغيرهن."

নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা পূরণ করতে পারেননি। পরে তার পুরো সম্পদ জব্দ করা হয়।

দৌলতাবাদে গানবাদ্য যারা করে তাদের জন্য আলাদা একটি বাজার আছে। বাজারটি বেশ সুন্দর ও বড়। দোকানপাটও অনেক। প্রতিটি দোকানে বিশাল দরজা। দোকানে অতিরিক্ত বিছানা পাতা থাকে। এর মধ্যখানে একটি বড় দোলনা থাকে। গায়ক নারীরা তাতে বসে যান অথবা শুয়ে যান। বাঁদিরা দোলনা হেলাতে থাকে। দোলনা বেশ সজ্জিত থাকে। বাজারের মধ্যখানে একটি গম্বুজ আছে যা খুবই সজ্জিত। সেখানে বিছানা বিছানো। সেখানে গায়কদের সর্দার প্রতি বৃহস্পতিবার আসরের পর এসে বসেন। সেখানে তার ক্রীতদাস ও খাদেমরা উপস্থিত থাকে। পালাক্রমে তারা এসে গানবাদ্য করে। এভাবে মাগরিব পর্যন্ত চলে। মাগরিবের পর তিনি ঘরে চলে যান। এই বাজারে মসজিদও আছে। সেখানে তারাবির জামাতও হয়। বেশির ভাগ রাজা এই বাজারে ঘুরতে আসেন। এই গম্বুজে অবস্থান করেন। গায়করা তার সামনে এসে গান করেন। কোনো কোনো মুসলিম বাদশাহও এমনটা করেন।

নজরবারে আগমন, শরিয়তের দণ্ড কায়েম

দৌলতাবাদ থেকে আমরা নজরবারে পৌঁছি। এটি একটি ছোট শহর। এখানকার অধিবাসীরা বেশির ভাগই মারাঠি। হস্তশিল্পে তাদের প্রসিদ্ধি রয়েছে। ভালো চিকিৎসক ও জ্যোতিষীও রয়েছে। সম্ভ্রান্ত মারাঠিরা ব্রাহ্মণ হয়ে থাকে। ভাত, সবজি ও সরিষার তেল তাদের প্রধান খাদ্য। গোশত একদম খায় না। কোনো প্রাণীকে কষ্ট দেয় না। খাবারের আগে অবশ্যই গোসল করে নেয়। যেমন নাপাক হওয়ার পর জরুরি ভিত্তিতে গোসল করা হয়। তারা মদপান করে না। মদপানকে খুবই গর্হিত কাজ মনে করে। হিন্দুস্তানে মুসলমানরাও মদপানকে গর্হিত কাজ মনে করে। কোনো মুসলিম মদপান করলে তাকে আশিটি দোররা মারা হয় এবং তিন দিন বন্দিশালায় বন্দি রাখা হয়।

এই শহর থেকে রওনা দিয়ে আমরা সাগির পৌঁছি। এটি একটি বড় শহর। একই নামে একটি নদী রয়েছে, সেই নদীর তীরে শহরটি অবস্থিত। নদীর তীরে নানা ফলের বাগান রয়েছে। এই শহরের বাসিন্দারা অনেক নেককার

ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী। বাগানের ভেতরে খানকা ও চৌকি বানিয়ে রেখেছে, যেখানে মুসাফিররা বিশ্রাম নিতে পারে।

কাম্বাইতে অবস্থান, একটি বিস্ময়কর দাস্তান

সাগির থেকে আমরা কাম্বাইতে পৌঁছি। এটি একটি উপসাগরের তীরে অবস্থিত। এটি অনেকটা সমুদ্রের মতোই। এখানে জাহাজও আসে। ভাটার সময় এক ধরনের গাছ কাদায় লুটোপুটি খেতে দেখেছি। আবার জোয়ার আসার পর সেগুলো পানিতে ভাসতে দেখেছি। অন্যান্য শহরের তুলনায় এই শহরটি সুন্দর এবং বেশ মজবুত করে গড়ে তোলা হয়েছে। এখানকার দালান ও মসজিদগুলো বেশ সুন্দর। ভিনদেশি ব্যবসায়ীরা এখানে বড় বড় ইমারত এবং মসজিদ নির্মাণ করে থাকেন। একজন আরেকজনের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা করেন।

আমরা যখন কাম্বাইতে পৌঁছি তখন সেখানকার গভর্নর ছিলেন মাকবাল তেলেঙ্গি। বাদশাহ তাকে অনেক মূল্যায়ন করতেন। শায়খজাদা ইস্পাহানি তার সান্নিধ্যে থাকতেন। গভর্নর নিজের পক্ষ থেকে সব দায়িত্ব তার ওপর দিয়ে রেখেছিলেন। এই শায়খ সালতানাতের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বেশ ধারণা রাখতেন এবং অনেক সম্পদশালী ছিলেন। এবার নিজ দেশে সম্পদ পাঠানো এবং পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এই খবর বাদশাহর কানে গেল। বাদশাহ মাকবালকে চিঠি লিখলেন, তাকে ডাক বিভাগের মাধ্যমে রাজধানীতে পাঠিয়ে দাও। মালিক মাকবাল তাকে পাঠিয়ে দিলেন। যখন তিনি বাদশাহর সামনে হাজির হলেন তখন তাকে পাহারায় রাখার নির্দেশ দিলেন। এই দেশের নিয়ম হলো, কাউকে পাহারার মধ্যে ফেলে দিলে তার পক্ষে প্রাণে বাঁচার ঘটনা বিরল। শায়খ পাহারাদারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে অনেক সম্পদের বিনিময়ে দুজন পালিয়ে গেলেন।

গাবি ও কান্দাহারে আগমন

কাম্বাইত থেকে আমরা গাবিতে পৌঁছি। এটি একটি উপসাগরের তীরে অবস্থিত। এখানে সামুদ্রিক ঝড় হয়। এটি একটি হিন্দু রাজার এলাকা। সেখান থেকে আমরা কান্দাহারে পৌঁছি। এটি অনেক বড় শহর। সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। সেখানকার রাজার নাম জালিঙ্গি। তিনি মুসলিম বাদশাহর অধীনে। প্রতি বছর কর আদায় করেন। আমরা যখন কান্দাহারে পৌঁছি তিনি

আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে শহরের বাইরে আসেন। আমাদের অনেক সম্মান করেন। নিজের মহল আমাদের জন্য খালি করে দেন। আমরা সেখানে অবস্থান করি। বড় বড় মুসলিম আমিররা আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে আসেন। তাদের মধ্যে খাজা বাহরার ছেলে এবং নাখোযা ইবরাহিমও ছিলেন। এই ব্যক্তি (নাখোযা ইবরাহিম) ছয়টি জাহাজের মালিক।

পশ্চিম ঘাট

সামুদ্রিক সফরের সূচনা, বিভিন্ন স্থানে অবতরণ

আমরা নাখোযা ইবরাহিমের জাহাজ 'জাগিরে' আরোহণ করি। তার দেওয়া সত্তরটি ঘোড়াও জাহাজে তুলি। বাকি ঘোড়া এবং চাকর-বাকর ইবরাহিমের ভাইয়ের আরেকটি জাহাজ, যার নাম 'মানুরাত', তাতে উঠাই। রায় জালেন্সি আমাদেরকে একটি জাহাজ দেন। তাতে জহুরুদ্দিনের ঘোড়া, আসবাবপত্র ও চাকর-বাকর আরোহণ করে। রায় জালেন্সি আমাদের জন্য পানি, খাবার এবং প্রাণীর খাদ্য ব্যবস্থা করে দেন। 'আকির' নামে একটি জাহাজসহ তার ছেলেকেও আমাদের সঙ্গে দেন। সেটি অনেকটা নৌকার মতো ছিল, তবে নৌকার চেয়ে অনেক বড়। এই জাহাজে ষাটজন নাবিক ছিল। যুদ্ধের সময় ছাদ টেনে দেওয়া যায়, যাতে নাবিকদের ওপর পাথর এসে না পড়ে। 'জাগির' নামক যে জাহাজে আমি ছিলাম তাতে পঞ্চাশজন তিরন্দাজ ও পঞ্চাশজন হাবশি সেনা ছিল। তারা এই সমুদ্রের মালিক। কোনো জাহাজে তাদের একজনও থাকলে হিন্দু চোর এবং বিদ্রোহীরা তাদের কিছু করে না।

বায়রাম দ্বীপে প্রবেশ এবং সেখানে ভ্রমণ

দুই দিন সফর করার পর বায়রাম[১] দ্বীপে আমরা পৌঁছি। এই দ্বীপটি আবাদ হয়নি। এটি স্থলভাগ থেকে চার মাইল দূরত্বে অবস্থিত। আমরা সেই দ্বীপে অবস্থান করি এবং পানি সংগ্রহ করি। মালিকুত তুজ্জার যার আলোচনা ইতিপূর্বে করে এসেছি, তিনি এই দ্বীপটি আবাদ করার ইচ্ছা করলেন। সেখানে প্রাচীর নির্মাণ করে ক্ষেপণাস্ত্র বসান। মুসলমানদের সেখানে নিয়ে বসবাসের সুযোগ করে দেন।

সেখান থেকে রওনা দিয়ে আমরা দ্বিতীয় দিন কাওকা[২] পৌঁছি। এটিও অনেক বড় শহর। এর বাজারও অনেক বিস্তৃত। আমরা শহর থেকে চার মাইল

---

[১] এই দ্বীপটি এখনো রয়েছে, যা কাম্বাইত উপসাগরে অবস্থিত।

[২] এটি আহমদাবাদ জেলায় পড়েছে। এখানকার বাসিন্দাদের কাছে জাহাজের নাবিক হওয়া বেশ পছন্দের।

দূরত্বে নোঙর করি। কেননা এটি ভাটার সময় ছিল। পানি নেমে গিয়েছিল। আমরা যখন এক মাইল দূরত্বে তখন জাহাজ থেকে নেমে নৌকায় চড়ে শহরের দিকে যাই। পানি কম হওয়ার কারণে নৌকা কাদায় লেগে যায়। আমি দুজনের কাঁধে ভর করে যাই। কেননা লোকেরা বলছিল, জোয়ার এসে যাবে। আর জোয়ার এলে সমস্যায় পড়তে হবে। কেননা আমি ভালোমতো সাঁতার জানি না। আমি শহরে পৌঁছে বাজারে ঘোরাঘুরি করি। একটি মসজিদও পরিদর্শন করি। এটি হযরত খিযির ও হযরত ইলিয়াস আলাইহিমাস সালামের দিকে সম্বোধিত। সেখানে মাগরিবের নামায আদায় করি। সেই মসজিদে হায়দারি ফকিরদের একটি গ্রুপ আছে। তাদের শায়খও সঙ্গে ছিলেন। আমি সেখানে বেশি দেরি করিনি, চলে আসি। সেখানকার রাজার নাম দুনকুল। তিনি বাদশাহর বাহ্যত অনুগত হলেও মূলত অবাধ্য।

এই শহর থেকে রওনা দিয়ে তিন দিন পর আমরা সান্দাপুর[১] দ্বীপে পৌঁছি। এই দ্বীপে ৩৬টি গ্রাম রয়েছে। এর পাশেই একটি উপসাগর। ভাটার সময় এর পানি মিষ্টি থাকে। আর জোয়ারের সময় লবণাক্ত হয়ে যায়। এই দ্বীপের মধ্যখানে দুটি শহর আছে। একটি হিন্দুরা তাদের শাসনামলে আবাদ করে। আরেকটি মুসলিমরা তা জয় করার পর আবাদ করে। এখানে একটি বড় জামে মসজিদ আছে, যা বাগদাদের মসজিদের মতো। সুলতান জামালুদ্দিন মুহাম্মাদ হানুরির ছেলে নাখোযা এটি নির্মাণ করেন।

এই দ্বীপ থেকে রওনা দিয়ে আমরা একটি ছোট দ্বীপে পৌঁছি, যা স্থলভাগের একদম কাছে। সেখানে গির্জা, বাগান ও পানির একটি হাউজ আছে।

কাফেরবেশী এক মুমিনের সঙ্গে সাক্ষাতের বিস্ময়কর দাস্তান

এখানে এক সাধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি একটি মূর্তির ঘরে দুটি মূর্তির মাঝখানে দেয়ালে ঠেক দিয়ে বসা ছিলেন। সাধনার চিহ্ন চেহারায় ভাসছিল। আমি তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চাইলাম। কিন্তু তিনি কোনো জবাব দিলেন না। আমি দেখলাম তার কাছে কোনো খাবারদাবার আছে কি না। কিন্তু কিছু দেখতে পেলাম না। তখন তিনি একটি চিৎকার মারেন, যাতে একটি নারিকেল গাছ থেকে এসে পড়ল। সেই নারিকেলটি তিনি আমাকে দিলেন।

---

[১] সিন্দাপুর সেই দ্বীপ যা বর্তমানে 'গোয়া' নামে প্রসিদ্ধ। হিন্দুস্তানের কড়া প্রতিবাদ সত্ত্বেও যার ওপর পর্তুগিজরা দখলদারত্ব প্রতিষ্ঠা করে আছে।

আমি খুবই বিস্মিত হলাম। আমি তাকে দিনার-দিরহাম সাধলাম, কিন্তু তিনি নিতে রাজি হলেন না। পরে আমি তাকে কিছু খাবার দিলাম, সেটাও নেননি। উটের পশমের তৈরি একটি রুমাল পাশে পড়ে থাকতে দেখলাম। আমি এটি হাতে নিয়ে দেখলাম। তিনি এটাও আমাকে দিয়ে দেন। আমার হাতে একটি তাসবিহ ছিল। তিনি এটি নিয়ে দানাগুলো উলট-পালট করে দেখলেন। আমি এটি তাকে দিয়ে দিলাম। তিনি এটি নাকের কাছে নিয়ে ঘ্রাণ নিলেন এবং রেখে দিলেন। পরে আসমানের দিকে ইশারা করলেন। এরপর কেবলার দিকে ইশারা করলেন। তিনি কী বলতে চাচ্ছেন তা আমার সাথীসঙ্গীরা কিছু বুঝলো না। আমি বুঝে গেলাম তিনি মুসলিম, ইসলাম গোপন করে রেখেছেন। নারিকেল খেয়েই তিনি দিন কাটান। আমরা যখন তার কাছ থেকে বিদায় নিই তখন আমি তার হাতে চুমু খাই। তিনি মুচকি হাসলেন এবং আমাদেরকে ইশারায় চলে যেতে বললেন। আমরা ফিরে আসছিলাম। আমি ছিলাম সবার পেছনে। তিনি আমার কাপড় ধরে টান দিলেন। আমি ফিরে তাকালে তিনি আমাকে দশ দিনার দিলেন। আমি যখন বাইরে বেরিয়ে আসি তখন সাথীসঙ্গীরা জিজ্ঞেস করেন, তোমাকে সাধু কেন আবার কাপড় ধরে টান দিয়েছিলেন? আমি বললাম, তিনি আমাকে দশ দিনার দিয়েছেন। তিন দিনার আমি জহিরুদ্দিনকে দিয়ে দিই। আর তিন দিনার দিই সানবালকে। আর তাদেরকে বলি, তিনি প্রকৃতপক্ষে মুসলিম। তিনি যখন আসমানের দিকে ইশারা করেন এর দ্বারা বোঝাতে চাচ্ছিলেন এক আল্লাহর ওপর ঈমান রাখি। আর কেবলার দিকে যখন ইশারা করলেন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে পয়গাম্বরের ওপর ঈমান রাখি। আমার কাছ থেকে তাসবিহ নিয়ে নেওয়ার দ্বারা তিনি মূলত এটার প্রমাণ দেন। আমার কাছ থেকে এই কথা শুনে তারা আবার ফিরে গেলেন। কিন্তু তারা গিয়ে আর ওই সাধুকে পেলেন না। অবশেষে আমরা ফিরে এলাম।

হিনওয়ার, হিন্দুস্তানে শাফেয়ীদের কেন্দ্র

পরদিন সকালে আমরা হানুরে পৌঁছি। এই শহর একটি উপসাগরের তীরে অবস্থিত, যেখানে জাহাজ যেতে পারে। এটি সমুদ্র থেকে আধা মাইল দূরত্বে। বর্ষাকালে সমুদ্র উত্তাল থাকে এবং তুফান হয়। চার মাস পর্যন্ত মাছ শিকার ছাড়া কেউ সমুদ্রে যায় না।

যখন আমরা হানুরে পৌঁছি তখন এক সাধু আমাদের কাছে আসেন এবং ছয়টি দিনার দেন। আমি সেই দিনার তার কাছ থেকে নিই। পরে তাকে

একটি দিনার দিতে চাইলাম। কিন্তু তিনি তা নিলেন না এবং চলে গেলেন। আমি আমার সাথীসঙ্গীদের কাছে এই ঘটনা বলি। আর এটাও বলি, তোমরা চাইলে এখান থেকে ভাগ নিতে পারো। কিন্তু তারা কেউ নিতে চাইল না। তারা বলল, তুমি আমাদেরকে আগে যে ছয় দিনার দিয়েছিলে সেটার সঙ্গে আরো ছয় দিনার মিলিয়ে আমরা তা ওই জায়গায় রাখি যেখানে সাধু বসেছিলেন। তাদের এই কথা শুনে আমি আরো বিস্মিত হই। পরে আমি এই দিনার অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নিজের কাছেই রেখে দিই।

হিনওয়ার শহরের অধিবাসীরা শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। তারা অনেক দীনদার এবং সচ্চরিত্রের অধিকারী। সামুদ্রিক শক্তির দিক থেকে তাদের প্রসিদ্ধি রয়েছে। সান্দাপুর জয় হওয়ার পর তারা আর কোথাও থাকেনি। এই শহরের আবেদদের মধ্যে শায়খ মুহাম্মাদ নাগুরি আমাদেরকে তার খানকায় দাওয়াত করেন। তিনি নিজের খাবার নিজেই রান্না করেন। ফকিহ ইসমাইল কুরআনে কারিম পড়ান। অত্যন্ত সচ্চরিত্রের অধিকারী। শহরের কাজি নুরুদ্দিন আলী। খতিবের নাম আমার মনে পড়ছে না। এই শহর এবং গোটা অঞ্চলের নারীরা সেলাইযুক্ত কোনো কাপড় পরে না। সেলাইহীন কাপড় তারা পরে। চাদরের এক আঁচল দ্বারা পুরো শরীর ঢেকে নেয়। আরেকটি চাদর দিয়ে মাথা ও বুক ঢাকে।[১] এই নারীরা সুদর্শন এবং সচ্চরিত্রের অধিকারী। তারা নাকে স্বর্ণের অলংকার পরে। তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা সবাই কুরআনের হাফেয। এই শহরে ছেলেমেয়েদের জন্য তেরোটি মক্তব আছে। এই শহর ছাড়া এটা আমি আর কোথাও দেখিনি। এই শহরের লোকেরা নিছক সমুদ্র বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল। তারা কৃষিকাজ করে না। মালাবারের লোকেরাও সুলতান জামালুদ্দিনকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর দেয়। কেননা তার কাছে সামুদ্রিক বড় শক্তি রয়েছে। এর বাইরে ছয় হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য রয়েছে।

হানুরের সুলতানের গুণ ও সৌন্দর্য

বাদশাহ জামালুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন হাসান অত্যন্ত নেককার। তিনি এক হিন্দু রাজার অধীনে, যার নাম হারিব। সুলতান জামালুদ্দিন সব সময় জামাতে নামায পড়েন। তার নিয়ম হলো, ভোর হওয়ার আগেই মসজিদে চলে যান।

---

[১] এর দ্বারা উদ্দেশ্য শাড়ি।

সকাল হওয়া পর্যন্ত তেলাওয়াত করেন। প্রথম সময়ে ফজরের নামায আদায় করেন। পরে বাহনে চড়ে শহরে বেরিয়ে পড়েন। চাশতের সময় ফিরে আসেন। প্রথমে মসজিদে দুই রাকাত নামায আদায় করে পরে রাজমহলে যান। আইয়্যামে বিযের রোযা রাখেন। আমি যখন তার কাছে ছিলাম ইফতারের সময় তিনি আমাকে ডেকে পাঠাতেন। ফকিহ আলী ও ফকিহ ইসমাইলও সেখানে থাকতেন। মাটিতে চারটি চেয়ার পাতা থাকত। এর মধ্যে একটিতে তিনি নিজে বসতেন আর বাকি তিনটি আমরা তিনজন বসতাম। খাবারের ধারাক্রম ছিল, প্রথমে তামার তৈরি দস্তরখান যাকে খাঞ্চা বলা হয়, তা আনা হয়। এর মধ্যখানে তামার একটি প্লেট রাখা হয়, যাকে তালেম বলা হয়। এরপর রেশমি কাপড় পরা একজন বাঁদি খাবারের পাত্র নিয়ে আসে। তামার তৈরি বড় বড় চামচও আনে। এক এক চামচ ভাত প্লেটে রাখে। এতে ঘি ঢালা হয়। একই প্লেটের অন্য পাশে মরিচ, আদা, লেবু ও আমের আচার রাখা হয়। এরপর ঝোলে ডুবিয়ে রান্না করা মুরগির গোশত দেওয়া হয়। ভাতের সঙ্গে এটা খাওয়া হয়। এটা খাওয়া হলে আরেক ধরনের রান্না করা মুরগির গোশত দেওয়া হয়। পরে বিভিন্ন ধরনের মাছ চামচ দিয়ে দেওয়া হয়। পরে ঘি দিয়ে রান্না করা সবজি আনা হয়। সেটাও ভাত দিয়ে খাওয়া হয়। এসব খাওয়া শেষ হলে দই অথবা লাচ্চি আনা হয়। এগুলো আনলে বুঝতে হবে খাবার শেষ। এরপর গরম পানি পান করা হয়। কেননা বর্ষাকালে ঠান্ডা পানি ক্ষতিকর।

আমি এই বাদশাহর কাছে দ্বিতীয় দফা প্রায় এগারো মাস অবস্থান করেছি। এই দীর্ঘ সময়ে রুটি খাইনি। কেননা এখানকার লোকদের খাবার ভাত। এমনিভাবে মালদ্বীপ, সায়লান, মালাবার ও মা'বারে তিন বছর ছিলাম। ভাত ছাড়া কিছু খাইনি। আমি পানি দিয়ে তা গিলতাম, কেননা এছাড়া ভেতরে যেত না।

বাদশাহ রেশমের পাতলা কাপড় পরেন। কোমরে চাদর বেঁধে রাখেন। গায়ে দুটি লেপ রাখেন। চুলগুলো থাকে এলোমেলো। এর ওপর ছোট একটি পাগড়ি বাঁধেন। যখন বাহনে চড়েন তখন একটি আবাও পরেন। এর ওপর লেপও জড়িয়ে নেন। তার সামনে লোকেরা বাদ্যযন্ত্র বাজাতে থাকে। এই দফায় আমরা তার কাছে তিন দিন অবস্থান করি। তিনি আমাদেরকে পথের খাবার দিয়ে দেন।

মুলাইবার
মুলাইবারের রাজার ইসলাম গ্রহণ, আরবিদের সম্মান ও প্রভাব

মুলাইবারের হিন্দু ও মুসলিমদের সঙ্গে তার আচরণ

তিন দিন পর মুলাইবার[১] সীমান্তে পৌঁছি। এটি ওই দেশ যেখানে গোল মরিচ উৎপন্ন হয়। এই দেশের দৈর্ঘ্য দুই মাসের পথ। নদীর তীর ধরে সান্দাপুর থেকে কুলিম পর্যন্ত চলে গেছে। সড়কের দুই পাশে গাছ রয়েছে। আধা মাইল দূর দূর একটি কাঠের ঘর পড়ে, যেখানে দোকান ও যাত্রীছাউনি বানিয়ে রাখা হয়েছে। প্রত্যেক মুসাফির হিন্দু হোক কিংবা মুসলিম, সেখানে আরাম করতে পারে। প্রতিটি ঘরের কাছে একটি কুয়া রয়েছে, যেখানে এক হিন্দু লোক পানি পান করায়। হিন্দুদের বাটিতে করে আর মুসলিমদের 'ওক' (এক ধরনের পাত্র) দ্বারা। যখন তারা ইশারায় নিষেধ করে তখন বন্ধ করে দেয়।

মুলাইবারে নিয়ম হলো, মুসলিমদেরকে ঘরে আসতে দেয় না। নিজেদের পাত্রে খাবারও খেতে দেয় না। আর খাওয়ালেও সেই পাত্র হয়ত ভেঙে ফেলে অথবা মুসলিমদের দিয়ে দেয়। যেখানে মুসলিম নেই সেখানে তারা মুসলিমদের জন্য খাবার রান্না করে দেয়। খাবার কলাপাতায় রেখে দেয়। এতেই তরকারি ঢেলে দেয়। যা কিছু বেঁচে যায় তা পশুপাখি অথবা কুকুরকে দিয়ে দেয়।

এই রাস্তায় সব মনজিলেই মুসলিমদের ঘর আছে। সেখানে গিয়ে মুসলিম মুসাফিররা উঠতে পারে। তারা মুসাফিরদের জন্য খাবার রান্না করে দেয়।

---

[১] মুলাইবার, এখানকার রাজা পারদমল ৮২৭ খ্রিস্টাব্দে আরব ব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলিম হন এবং হেজাযে হিজরত করেন। তিনি রাজপাট বণ্টন করে দেন। আর অসিয়ত করেন, আরব ব্যবসায়ীরা যেখানে মসজিদ, দোকান অথবা সরাইখানা বানাতে চান তার অনুমতি যেন দেওয়া হয় এবং এই কাজে যেন সহযোগিতা করা হয়। রাজার সেই অসিয়ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং দীর্ঘকাল ধরে এখানে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটছে।

১৭৭৪ হিজরিতে সুলতান হায়দার আলী এখানে দখল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৯২ হিজরিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি টিপু সুলতানের কাছ থেকে এই এলাকা ছিনিয়ে নেয়। এখানকার জমিদার নায়ের। কিন্তু অত্যাচারী মুপলারা (মুলাইবারি মুসলিম) তার বিরুদ্ধে কয়েকবার বিদ্রোহ করেছে।

মুসলিমদের ঘর না থাকলে এই এলাকায় মুসলিমদের জন্য সফর করা কঠিন ছিল। এই দুই মাসের রাস্তায় সামান্য জায়গাও এমন নেই যা আবাদ হয়নি। প্রতিটি মানুষের ঘর আলাদা আলাদা। ঘরের পাশেই উদ্যান। আর প্রতিটি উদ্যান কাঠের দেয়ালে ঘেরা। বাগানের মধ্যখান দিয়ে সড়ক অতিবাহিত হয়েছে। প্রতিটি বাগানের দেয়ালে সিঁড়ি লাগানো আছে। তাতে চড়ে অন্য বাগানে যাওয়া যায়।

কেউ ঘোড়া বা অন্য কোনো প্রাণীর ওপর আরোহণ করে চলতে পারে না। ঘোড়ায় শুধু বাদশাহ চড়তে পারেন। বেশির ভাগ লোক হয়ত পালকিতে চড়েন, যা চাকর বা ক্রীতদাসরা বহন করে নিয়ে যায় অথবা পায়ে হেঁটে চলেন, তিনি যে কেউই হোন না কেন। কারো কাছে ব্যবসায়িক পণ্য বা এ জাতীয় কিছু আসবাবপত্র থাকলে শ্রমিক ভাড়া করে তা বহন করেন। শ্রমিকরা পিঠের ওপর বোঝা বহন করে নিয়ে যায়। সুতরাং এমন সওদাগরও দেখেছি, যাদের সঙ্গে শত শত শ্রমিক রয়েছে আসবাবপত্র বহন করার জন্য। প্রত্যেক শ্রমিকের হাতে মোটা লাঠি থাকে। লাঠির মাথায় লোহার পেরেক লাগানো। আরেক মাথায় লোহার হুক লাগানো। যখন তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং থামার জন্য কোনো উপযুক্ত জায়গা না পান তখন হাতে থাকা লাঠি মাটিতে পুঁতে দেন। আর এর মধ্যে আসবাবপত্রের গাট্টি ঝুলিয়ে রাখেন। যখন ক্লান্তি দূর হয় তখন বোঝা নিয়ে আবার রওনা দেন। আমি কোনো রাস্তা এতটা নিরাপদ দেখিনি যতটা নিরাপদ এই রাস্তা। এখানে একটি নারিকেল চুরি করলেও চোরকে মেরে ফেলা হয়। গাছ থেকে যখন কোনো ফল পড়ে যায় তখন কেউ এটা উঠিয়ে নেয় না। যখন মালিক আসেন তিনি উঠান। কথিত আছে, কোনো হিন্দু লোক একটি নারিকেল উঠিয়েছিল। এই খবর গভর্নরের কাছে চলে যায়। তিনি একটি কাঠ মাটিতে পুঁতেন। সেই কাঠের মাথায় পেরেকযুক্ত আরেকটি কাঠ রাখেন। পরে সেই ব্যক্তিকে এই কাঠের ওপর উপুর করে শুইয়ে দেন। এতে পেরেকটি পেট দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বের হয়। মানুষের শিক্ষার জন্য লাশ সেখানেই রেখে দেওয়া হয়। এ ধরনের কাঠ রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় স্থাপন করা আছে, যাতে মুসাফিররা তা দেখে বুঝতে পারে।

রাতে রাস্তায় অনেক হিন্দুর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে। তারা রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে যায়। আমরা চলে যাওয়ার পর তারা আবার পথচলা শুরু করে। এখানে হিন্দুরা মুসলিমদের অসম্ভব রকম সম্মান করে। তবে এটা

সত্য, মুসলিমদের সঙ্গে তারা খায় না এবং তাদের ঘরেও ঢুকতে দেয় না। মুলাইবারে বারোজন রাজা রয়েছেন। সবচেয়ে বড় রাজার বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা পনেরো হাজার। আর ছোট রাজার সৈন্য সংখ্যা তিন হাজার। তারা কখনো লড়াই করে না এবং শক্তিশালীরা দুর্বলদের রাজ্য জয়ের চেষ্টা চালায় না। এক রাজার এলাকা শেষ হওয়ার পর আরেক রাজার এলাকা শুরু। কাঠের একটি দরজা পড়ে। সেখানে সামনে আসা রাজার নাম খোদাই করে লেখা রয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, অমুক রাজার আশ্রয়ের দরজা এটি। কোনো হিন্দু বা মুসলিম এক এলাকায় কোনো অপরাধ করে আরেক রাজার এলাকায় ঢুকে গেলে তার আর কোনো চিন্তা নেই। এমনকি সেই রাজা শক্তিশালী হলেও দুর্বল রাজার ওপর অপরাধীকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কোনো জোরজবরদস্তি করে না।

এই রাজাদের ছেলেরা তাদের বাবার উত্তরাধিকারী হয় না। বরং ভাতিজা উত্তরাধিকারী হয়। এই নিয়ম আমি সুদান ছাড়া দুনিয়ার আর কোথাও দেখিনি। মুলাইবারের কোনো রাজা যদি মনে করেন কোনো দোকানদারের বেচাকেনা বন্ধ করে দেবেন তাহলে রাজার ক্রীতদাস এসে ওই দোকানো গাছের ডাল ঝুলিয়ে দিয়ে যায়। যতক্ষণ এই ডাল ঝুলতে থাকবে ততক্ষণ কেউ তাদের দোকানো বেচাকেনা করতে পারবে না।

গোল মরিচের থোকা অনেকটা আঙুরের থোকার মতো। এটি নারিকেল গাছের সঙ্গে বপন করা হয়। এই গাছের কোনো শাখা হয় না। এর পাতাগুলো ঘোড়ার কানের মতো। এর ফলগুলো ছোট ছোট গুচ্ছে হয়। হেমন্তকালে তা তুলে ছাঁটাইয়ে রোদে শুকাতে দেওয়া হয়। যেমন কিসমিস বানানোর জন্য আঙুর শুকানো হয় এবং তা উল্টেপাল্টে দেওয়া হয়। শুকানোর পর তা কালো রং ধারণ করে। তখন ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা হয়।

আমাদের দেশের জনসাধারণের ধারণা, গোল মরিচ আগুন দ্বারা ভুনা হয়। যার কারণে তীক্ষ্ণতা আসে। মূলত এটা সঠিক নয়। তীক্ষ্ণতা আসে রোদের দ্বারা। কালুত[১] শহরে আমি দেখেছি এই গোল মরিচ পাল্লা দিয়ে মাপা হচ্ছে যেভাবে আমাদের দেশে বাজরা মাপা হয়।

---

[১] কালিকোট।

মুলাইবারের শহর ও স্থানগুলো, আবি সারুর ও মানজারুর ইত্যাদি

মুলাইবারের সর্বপ্রথম শহর, যেখানে আমরা প্রবেশ করি, সেটা হলো আবি সারুর। এটি একটি ছোট শহর। একটি বড় উপসাগরের তীরে। সেখানে নারিকেল গাছ অনেক বেশি। মুসলমানদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি হলেন শায়খে জুমা, যিনি আবি সিত্তাহ নামে প্রসিদ্ধ। এই ব্যক্তি অনেক দানশীল। তার সব সম্পদ ফকির-মিসকিনদের মধ্যে খরচ করেন। দুই দিন পর আমরা ফাকানাওর শহরে পৌঁছি। এটিও একটি উপসাগরের তীরে অবস্থিত। এখানকার আখ খুব ভালো হয়। যার কোনো তুলনা এই অঞ্চলে নেই। এই শহরে অনেক মুসলিম আছে। তাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি হলেন হুসাইন সাল্লাত। এই শহরে কাজি ও খতিবও আছেন। হুসাইন সাল্লাত এখানে একটি জামে মসজিদও বানিয়েছেন। এই শহরের রাজার নাম বাসাদাও। তার কাছে ত্রিশটি যুদ্ধ জাহাজ রয়েছে। কিন্তু সবগুলোর অফিসার মুসলিম, যার নাম লোলা। প্রথমে এই ব্যক্তি জলদস্যু ছিলেন। সওদাগরদের মালপত্র লুট করতেন। আমরা যখন এই শহরের কাছে নোঙর ফেললাম তখন রাজা তার ছেলেকে আমাদের কাছে পাঠালেন। তিনি জাহাজে আমাদের কাছে জিম্মি হিসেবে রইলেন। পরে আমরা শহরে প্রবেশ করি। রাজা আমাদেরকে তিন দিন পর্যন্ত মেহমানদারি করেন।

তিন দিন পর আমরা মানজারুর[১] শহরে পৌঁছি। এটি একটি বড় শহর। উপসাগরের তীরে, যাকে দুনব বলা হয়। উপসাগরটি এই দেশের সবচেয়ে বড় উপসাগর। এই শহরে পারস্য ও ইয়েমেনের বেশির ভাগ সওদাগর আসে। এখানে গোল মরিচ ও আদা বেশি হয়। এই শহরের রাজা মুলাইবারে সবচেয়ে বড়। তার নাম রাম দেও। এই শহরে চার হাজারের কাছাকাছি মুসলিম বাস করে। তাদের অবস্থানস্থল শহরের বাইরে একসঙ্গে। অনেক সময় শহরের লোকদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ হয়। তখন রাজা সন্ধি করে দেন। কেননা তিনি ব্যবসায়ীদের মুখাপেক্ষী। এই শহরে শাফেয়ী মাযহাবের একজন কাজি আছেন। যার নাম বদরুদ্দিন মাবারি। তিনি লোকজনকে পড়ানও।

এই শহরের পর আমরা হিলির দিকে গেলাম। দুই দিন সেখানে রইলাম। এটি একটি বড় শহর। বড় বড় ইমারত রয়েছে। একটি বড় উপসাগরের

---

[১] ম্যাঙ্গালুর।

তীরে শহরটি অবস্থিত। এই উপসাগরে বড় বড় জাহাজ নোঙর করে। এই শহর পর্যন্ত চীনের জাহাজ আসে। কালকুত, কুলিম ও হিলি ছাড়া কোথাও সেগুলো ভিড়তে পারে না। হিলি শহরকে হিন্দু মুসলিম উভয়ে বরকতময় মনে করে। কেননা এখানে একটি জামে মসজিদ আছে, যা বরকতপূর্ণ বলে প্রসিদ্ধ। মুসাফিররা মঙ্গলের সঙ্গে গন্তব্যে পৌঁছতে এই মসজিদে মানত করে। খতিব হোসাইন ও হাসান ওযানের অধীনে এই মসজিদের ভান্ডার।

হিলি থেকে বিদায় হয়ে আমরা 'জুরফাত্তান' পৌঁছি। যা হিলি থেকে মাত্র তিন ফরসাখ (একটি পরিমাপ) দূরত্বে। সেখানে একজন ফকিহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, যিনি বাগদাদে থাকেন, যাকে 'সারসারি' বলা হয়। সারসার বাগদাদ ও কুফার রাস্তায় অবস্থিত একটি শহর, বাগদাদ থেকে যার দূরত্ব দশ মাইল। এখান থেকে আমরা ফাত্তিন পৌঁছি। এখানে কয়লা বেশি পাওয়া যায়। দিল্লির মতো জামে মসজিদ রয়েছে। মসজিদের নিচের দিকে সিঁড়ি আছে। লোকেরা নিচে গিয়ে অযু ও গোসল করে। ফকিহ হুসাইন আমাকে বলেছেন, এই মসজিদ রাজা কুয়েলের দাদা বানিয়েছিলেন এবং তিনি মুসলমান হয়ে যান।

মসজিদের অসম্মানে খোদায়ি সাজা, হিন্দুদের দুর্গতি

পরে আমরা 'দাহফাত্তান' শহরে যাই। এটি একটি বড় শহর। বড় একটি নদীর তীরে অবস্থিত। সমুদ্রের তীরে একটি মসজিদ আছে। সেখানে মুসলিম মুসাফিররা এসে অবস্থান করে। কেননা এই শহরে কোনো মুসলিম নেই। এই শহরের বন্দর অনেক সুন্দর। এখানকার পানি অনেক মিষ্ট। এখানে সুপারি অনেক হয়। এখান থেকে সুপারি যায় চীন ও ভারতে। এখানকার বেশির ভাগ অধিবাসী ব্রাহ্মণ। হিন্দুরা তাদেরকে অনেক সম্মান করে। কিন্তু তারা মুসলিমদের প্রতি প্রচণ্ড শত্রুতা পোষণ করে। আর এ কারণেই এই শহরে কোনো মুসলিম অবস্থান করতে পারে না। বলা হয়ে থাকে, তারা এই শহরটি এ কারণে ধ্বংস করে না যে, এক ব্রাহ্মণ মসজিদের ছাদ ভেঙে এর আসবাবপত্র নিজের ঘরে লাগান। কিন্তু সেই ঘরে আগুন লেগে যায়। সেই আগুনে ওই ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনসহ পুড়ে মরে। এই ঘটনার পর থেকে লোকেরা মসজিদের সম্মান করতে থাকে। আর কেউ মসজিদের অসম্মান করেনি। সেখানে তারা একটি হাউজও বানিয়ে দেয় যাতে মুসলিম

মুসাফিররা পানি পান করতে পারে। হাউজের চারপাশে জাল লাগিয়ে দেয় যাতে পাখি আসতে না পারে।

সেখান থেকে আমরা ফান্দারিনায় পৌঁছি। এটিও একটি বড় শহর। বাজার ও বাগান অনেক বেশি। এখানে মুসলিমদের তিনটি মহল্লা আছে। প্রতিটি মহল্লায় মসজিদ রয়েছে। জামে মসজিদ সমুদ্রের তীরে। এখানে সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসার আসন পাতা আছে। সেটা খুবই মনোরম একটি দৃশ্য। এই শহরের কাজি ও খতিব আম্মানের নাগরিক।

কালিকোট
আরব ব্যবসায়ীদের উত্থান কাহিনি

আমরা কালিকোট শহরে পৌঁছি। মুলাইবারে এটি অনেক বড় বন্দর। চীন, জাওয়া, সায়লান, মালদ্বীপ, ইয়েমেন ও পারস্যের ব্যবসায়ীরা এখানে আসেন। বরং গোটা দুনিয়ার ব্যবসায়ীরা এখানে জড়ো হন। এখানকার বন্দর দুনিয়ার বড় বড় বন্দরগুলোর একটি। এখানকার রাজা হিন্দু, যাকে সামেরি বলা হয়। তার বয়স অনেক বেশি। তবে ফিরিঙ্গিদের মতো দাড়ি মুণ্ডিয়ে রাখেন।

ব্যবসায়ীদের প্রধানের নাম ইবরাহিম শাহ বান্দার। তিনি বাহরাইনের নাগরিক। বড় আলেম ও দানশীল। সব ধরনের ব্যবসায়ীরা জড়ো হয়ে তার দস্তরখানের খাবার খান। এই শহরের কাজি ফখরুদ্দিন উসমানও বড় দানশীল। খানকার শায়খ শিহাবুদ্দিন গাযদানি। যারা চীন ও হিন্দুস্তানে শায়খ আবু ইসহাক গাযদানির মানত মানে তারা তাকেই মানত দেয়। নাখোযা মিসকালও এই শহরে থাকেন। তিনিও অনেক প্রসিদ্ধ ও সম্পদশালী। তার জাহাজ ভারত, চীন, ইয়েমেন ও পারস্যে ব্যবসা করে।

যখন আমরা শহরের পাশে পৌঁছি তখন শায়খ শিহাবুদ্দিন ও ইবরাহিম শাহ বান্দার এবং বড় বড় ব্যবসায়ী, রাজার প্রতিনিধি যাকে ফাল্লাজ বলা হয়, সবাই আমাদের স্বাগত জানাতে আসেন। তাদের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র এবং জাহাজে পতাকাও ছিল। আমরা বড় সমাবেশে বন্দরে ঢুকি। বন্দরটি অনেক বিস্তৃত। তখন এখানে চীনের তেরটি জাহাজ নোঙর করা ছিল। আমরা জাহাজ থেকে শহরে অবতরণ করি এবং ঘর ভাড়া নিই। তিন মাস পর্যন্ত চীনের দিকে রওনা দেওয়ার অপেক্ষা করি। এই দীর্ঘ সময় রাজার বাড়ি থেকে আমাদের মেহমানদারির আয়োজন করা হয়।

মালদ্বীপ : দুনিয়ার এক বিস্ময়

'জাবিতুল মাহাল' দ্বীপের কথা শুধু শুনতাম। দশম দিনে আমরা সেখানে পৌঁছলাম। এই দ্বীপ দুনিয়ার বিস্ময়কর জিনিসগুলোর একটি। দুই হাজারের কাছাকাছি দ্বীপ। শ খানেক বা এর চেয়ে কম দ্বীপ নিয়ে একটি সমষ্টি। এসব

দ্বীপে ঢোকার শুধু একটি মাত্র সিংহদরজা। যা দিয়ে জাহাজ ঢুকতে পারে। জাহাজের জন্য পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন পড়ে। এক দ্বীপের বাসিন্দারা সব দ্বীপে ঘুরতে পারে। একটি দ্বীপ-সমষ্টি আরেকটি দ্বীপ-সমষ্টির এত কাছে যে, একটি থেকে বের হলে আরেকটির খেজুর গাছ দেখা যায়। নিদর্শন ভুলে গেলে গন্তব্যে পৌঁছা কঠিন। বাতাসের তোড় জাহাজকে সায়লান[১] অথবা মাবার দেশে নিয়ে যায়। এই দ্বীপের সব নাগরিক মুসলিম। তারা অনেক দীনদার ও নেককার। এই দ্বীপে অঞ্চল ভাগ করা আছে। প্রতিটি অঞ্চলের একজন করে প্রশাসক থাকেন। প্রশাসককে 'দোবি' বলা হয়। অঞ্চলগুলোর নাম হলো, বালপুর, গানলুস, মাহাল দাস। এই তিনটি অঞ্চলের নাম বেশ প্রসিদ্ধ। বাদশাহ সাধারণত এগুলোতে থাকেন। এছাড়া তালাদ্বীপ, কারায়িদু, তিম, তালাদমাতি, হালাদমাতি, পারিদো, কান্দাকাল, মুলুক, সোয়েদ ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল। সোয়েদ ছাড়া আর কোথাও ফসল উৎপন্ন হয় না। শুধু সোয়েদে এক ধরনের খাদ্যশস্য হয়। সেখানকার বাসিন্দারা এক ধরনের মাছ খায়, যাকে সেখানকার লোকেরা 'কালবুল মাছ' বলে। এর মাংস কালো হয়। এতে কোনো গন্ধ থাকে না। বরং চতুষ্পদ প্রাণীর গোশতের মতো গন্ধ আসে। এই দ্বীপে সবচেয়ে বেশি হয় নারিকেল। মাছের সঙ্গে নারিকেল খায়। নারিকেল গাছের ধরনও বিস্ময়কর। এক বছরে বারো বার ফল দেয়। প্রতি মাসে নতুন ফল আসে। নারিকেলের সব পণ্য এবং মাছে অসম্ভব রকমের শক্তি রয়েছে। এই দ্বীপের বাসিন্দারা এ কারণে গর্ব করে। ওই দ্বীপে আমার বিবাহিত চার স্ত্রী ছিলেন। আর বাঁদি ছিল এর বাইরে। প্রতি রাতে তাদের দ্বারা উপকৃত হতাম।[২] আমি দেড় বছর এখানে অবস্থান করি। পুরো সময় একই নিয়মে চলেছে।[৩]

---

[১] সায়লুন।

[২] ইবনে বতুতা তার রঙিন রাতগুলোর কাহিনি যে আঙ্গিকে বর্ণনা করেছেন এর পুরো অনুবাদ সমীচীন নয়। এখানে মূল আরবিটুকু লিখে দিচ্ছি, ولقد كان لى بها اربع نسوة وجوار سواهن، فكنت اطوف على جميعهن كل يوم.

[৩] তুঘলকদের অধীনে থেকে এই রং-তামাশা, যেখানে প্রতি মুহূর্তে তলোয়ার মাথায় ঝুলছিল, এটা কীভাবে সম্ভব!–রইস আহমাদ জাফরি।

চীন সফর

চীনা জাহাজ, সামুদ্রিক সফর, জাহাজ ডুবে যাওয়া, ফিরে আসা

চীনের সমুদ্রে চীনা জাহাজ সঙ্গে না থাকলে কেউ সফর করতে পারে না। চীনা জাহাজ তিন ধরনের হয়ে থাকে। বড় জাহাজকে 'জাঙ্ক' বলা হয়। মাঝারি জাহাজকে বলা হয় 'জদ'। আর ছোট জাহাজকে বলা হয় 'কাকাম'। বড় জাহাজের বারোটি মাস্তুল থাকে। আর ছোট জাহাজের তিনটি। এই মাস্তুল বাঁশের তৈরি। আর পাল বানানো হয় চাটাইয়ের মতো। পাল কখনো নিচে নামানো হয় না। বাতাস জাহাজের দিক পরিবর্তন করে দেয়। যখন জাহাজ নোঙর করে তখনো পাল টানানোই থাকে। বাতাসের সঙ্গে উড়তে থাকে।

প্রতিটি জাহাজে হাজারখানেক মানুষ থাকে। ছয়শ তো থাকে জাহাজের নাবিক। আর চারশ সেনা। তাদের মধ্যে কিছু তিরন্দাজ। আর কিছু লোক চাকার দ্বারা তেল লাগানোর কাজে নিয়োজিত। প্রতিটি জাহাজের নিচে তিনটি ছোট জাহাজ হয়। একটি বড়টির অর্ধেক, দ্বিতীয়টি এক তৃতীয়াংশ এবং তৃতীয়টি এর চতুর্থাংশ। এই জাহাজ চীনের শহর জায়তুনে বানানো হয় অথবা চীনকালায়।

চীনা জাহাজের নির্মাণপদ্ধতি ও ভেতরের অবস্থা

এই জাহাজগুলো বানানোর পদ্ধতি হলো, প্রথমে কাঠের দুটি দেয়াল বানানো হয়। পরে দেয়াল দুটি মোটা মোটা কাঠ দ্বারা জোড়া দেওয়া হয়। এই কাঠগুলোর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ তিন গজের মতো হয়ে থাকে। এরপর এতে পাটাতন বানানো হয়, যা জাহাজের সবচেয়ে নিচের অংশ। পরে সমুদ্রে নামানো হয়। এই ছাঁচটি পানির কাছাকাছি থাকে। লোকেরা এসে এখানে গোসল করে, তাদের প্রয়োজন সারে। নিচে লাঠির আকৃতির দাঁড় লাগানো আছে, যা খুঁটির মতো মোটা মোটা। এক একটি দাঁড় টানার কাছে পনেরোজন পর্যন্ত মাঝি নিয়োজিত থাকে। এই মাঝিরা দাঁড়িয়ে কাজ করে।

প্রতিটি জাহাজের চারটি করে ছাদ থাকে। সেখানে ঘর, কেবিন ও জানালার ব্যবস্থা থাকে সওদাগরদের জন্য। রুমের ভেতর পায়খানার ব্যবস্থাও থাকে।

রুমের দরজা লাগিয়ে তালা দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকে। যারা কেবিন বরাদ্দ নেয় তারা সঙ্গে স্ত্রীদেরও আনতে পারে। অনেক সময় কেবিনের ভেতর কে আছে সেটা জাহাজের নাবিক বা অন্য কেউ জানতেও পারে না। জাহাজের নাবিক ও সেনারা জাহাজেই বসবাস করে। তাদের পরিবার-পরিজনও সঙ্গে থাকে। অনেক সময় কাঠের ড্রাম বানিয়ে সেখানে তরিতরকারি ও আদা ইত্যাদি বোনা হয়। জাহাজের তত্ত্বাবধায়ক অত্যন্ত শানশওকতের অধিকারী হন। যখন তিনি স্থলভাগে যান তখন তার সঙ্গে তিরন্দাজ ও হাবশিরা হাতিয়ার নিয়ে আগে আগে চলে। সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্রও থাকে। যখন গন্তব্যে পৌঁছে সেখানে অবস্থান করার ইচ্ছা করেন তখন এর আশপাশে বর্শা পুঁতে রাখা হয়। যতক্ষণ তিনি সেখানে থাকেন বর্শা পোঁতা থাকে। চীনের লোকেরা কেউ কেউ কয়েকটি জাহাজের মালিক। তারা জাহাজে তাদের প্রতিনিধি নিয়োগ দেন। চীনের লোকদের চেয়ে বেশি সম্পদশালী দুনিয়ার আর কোনো দেশে নেই।

ভয়ংকর তুফানে পড়ে জাহাজ ধ্বংস হয়ে যাওয়া

যখন চীনের দিকে সফর শুরুর সময় ঘনিয়ে এলো তখন সামেরি আমাদের জন্য তীরে নোঙর করা তেরোটি জাঙ্ক থেকে একটি জাঙ্ক বরাদ্দ করলেন। এই জাঙ্কের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন সুলাইমান সাফদি শামি। তার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। আমি তাকে বললাম, আমার একটি কেবিন প্রয়োজন, যেখানে আর কেউ শরিক থাকবে না। কেননা আমার সঙ্গে কয়েকজন বাঁদি ছিল। বাঁদি ছাড়া আমি কখনো সফর করিনি।[১]

তিনি জবাব দিলেন, চীনের ব্যবসায়ীরা সব কেবিন বরাদ্দ নিয়েছেন। তবে আমার জামাতার কাছে একটি কেবিন আছে। সেটা দিতে পারি। তবে এতে পায়খানার ব্যবস্থা নেই। আমি সেটাও ব্যবস্থা করে দেওয়ার চেষ্টা করব। আমি আমার লোকদের নির্দেশ দিলাম আসবাবপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য। দাস-দাসীরা জাহাজে চড়ে বসল। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। আমি ইচ্ছা করলাম পরদিন জুমার নামায আদায় করে জাহাজে চড়ব। জহিরুদ্দিন ও সাম্বালও জাহাজে চড়ে গেলেন। দূতিয়ালির সব আসবাবপত্র ও প্রাণী তাদের সঙ্গে ছিল। আমার দাস বেলাল জুমার দিন সকালে আমার কাছে এসে বলল,

---

[১] কেননা কবির ভাষায়: জীবন জীবন্ত হৃদয়ের নাম, মৃত অন্তরে ধুলোর বাস।–রইস আহমাদ জাফরি।

আমি যে কেবিনটি ভাড়ায় নিয়েছি সেটা অনেক ছোট। এটা দিয়ে হবে না। আমি নাখোযার কাছে বিষয়টি আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, করার কিছু নেই, এর চেয়ে ভালো কেবিনের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তিনি বললেন, কাকাম অর্থাৎ সবচেয়ে ছোট জাহাজে চড়লে সেখানে ভালো কেবিনের ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে। আমি রাজি হয়ে গেলাম। আমি আমার সাথীসঙ্গীদের বললাম, আমার দাসী ও আসবাবপত্র জাঙ্ক থেকে নামিয়ে যেন কাকামে নিয়ে যায়। জুমার নামাযের আগে আমি সেটাতে আরোহণ করব।

এই সমুদ্রের নিয়ম হলো, আসরের পর সমুদ্র উত্তাল থাকে। তখন কেউ জাহাজে চড়তে পারে না। সব জাঙ্ক চলতে শুরু করে। শুধু ওই জাঙ্কটি বাকি ছিল যাতে দূতিয়ালির আসবাবপত্র ছিল। শনিবার রাত আমরা সমুদ্রের তীরে রইলাম। কাকাম থেকে কেউ যেমন নিচে নামতে পারেনি, তেমনি আমরাও চড়তে পারিনি। আমার কাছে বিছানা ছাড়া আর কিছু ছিল না। সকালে জাঙ্ক ও কাকাম উভয়টি বন্দর থেকে দূরত্বে চলে গেছে। জাঙ্ক ফান্দারিনায় অবস্থান করতে চেয়েছিল। কিন্তু ঢেউয়ের আঘাতে তা ডুবে যায়। কিছু যাত্রী বেঁচে যায় এবং অনেকেই ডুবে মারা যায়। এক ব্যবসায়ীর বাঁদিও ছিল এই জাহাজে। তিনি ওই বাঁদিকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি ঘোষণা দিলেন, যে তার বাঁদিকে জীবিত উদ্ধার করতে পারবে তাকে তিনি দশ দিনার দেবেন। ওই বাঁদি জাঙ্কের পেছনে একটি কাঠ ধরে বেঁচেছিল। এক নাবিক তাকে উদ্ধার করেন। কিন্তু তিনি কোনো অর্থ নিলেন না। বললেন, আমি এই কাজ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করেছি।

আমার জাহাজ ও আমার সাথীদের হৃদয়বিদারক পরিণতি

রাতে সমুদ্রের ঢেউ ওই জাঙ্ককে আঘাত করে, যে জাঙ্কে দূতিয়ালির উপহারের পণ্য ছিল। এটি ডুবে আরোহী সবাই মারা যায়। সকালে আমি সবাইকে সমুদ্রের তীরে পড়ে থাকতে দেখেছি। জহিরুদ্দিনের মাথা ফেটে গিয়েছিল। মগজ বেরিয়ে এসেছিল। মালিক সাম্বালের কানের ভেতর পেরেক ঢুকে অপর দিক দিয়ে বের হয়েছিল। আমি তাদের জানাযা পড়াই এবং দাফন করি। কালিকোটের রাজা গায়ে ধুতি পরে মাথায় ছোট পাগড়ি বেঁধে নগ্ন পায়ে এলেন। ক্রীতদাসেরা তার মাথার ওপর ছাতা ধরে রাখে। আর তার সামনে আগুন জ্বলছিল। তার সেনারা লোকদের মেরে মেরে বলতে থাকে, সমুদ্রের তীরে যা কিছু পড়ে আছে তাতে কেউ যেন হাত না দেয়।

মুলাইবারে নিয়ম হলো, এসব মালামাল সরকারি কোষাগারে যায়। তবে কালিকোটের নিয়ম হলো, এ ধরনের মালামালের মালিক জাহাজের লোকেরা।

কাকামের নাবিকরা যখন জাঙ্কের এই অবস্থা দেখল তখন তারা পাল উঠিয়ে রওনা দিয়ে দিল। এতে আমার সব আসবাবপত্র, দাস-দাসিরা ছিল। তারাও এর সঙ্গে চলে যায়। আমি একা তীরে রয়ে যাই। এক দাস ছিল আমার সঙ্গে। আমি তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলাম। সেও আমাকে ছেড়ে চলে গেল। আমার কাছে এখন শুধু ওই দশ দিনার রয়ে গেল যা সাধক আমাকে দিয়েছিলেন। আর একটি মাত্র বিছানা। লোকেরা বলাবলি করল, এই কাকাম অবশ্যই কাওলাম বন্দরে থামবে। এজন্য আমি কাওলাম যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। স্থল ও নদীপথ দিয়ে কাওলাম দশ মনজিল দূরত্বে। আমি নদীপথ দিয়ে কাওলামে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। এক মুসলিম শ্রমিককে আমার সঙ্গে নিলাম, যে আমার বিছানাপত্র বহন করবে। নদীপথে সফরকারীরা রাতের বেলায় স্থলে নেমে কোনো গ্রামে অবস্থান করতে হয়। পরদিন সকালে আবার চলা শুরু করে। আমরাও এভাবেই চলতে থাকলাম। নৌকায় আর কোনো মুসলিম ছিল না। আমি যে মুসলিম শ্রমিককে ভাড়া নিয়েছিলাম সে বিভিন্ন মনজিলে নেমে হিন্দুদের সঙ্গে বসে মদপান করে। আর আমার সঙ্গেও তর্কবিতর্ক করতে থাকে। এজন্য আমার মেজাজ প্রচণ্ড খারাপ হয়েছিল।

কুচিনের একটি শহর কাওলামে মুসলিম ব্যবসায়ীদের সম্পদ

পঞ্চম দিন আমরা কুনজিগরিতে[১] পৌঁছি। এটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। এখানে ইহুদিরা বসবাস করে। তাদের আমির ভিন্ন। তারা কাওলামের রাজাকে কর দেয়। নদীর তীরে দারুচিনি ও ব্রাজিল গাছ রয়েছে। এসব গাছের কাঠ জ্বালানি হিসেবে কাজে আসে। দশম দিন আমরা কাওলামে পৌঁছি। মুলাইবারে এই শহর সবচেয়ে সুন্দর। এখানকার বাজারও খুব উৎকৃষ্ট। এখানকার ব্যবসায়ীদের সুলি বলা হয়। তারা অনেক সম্পদশালী। অনেক ব্যবসায়ী জাহাজ ভরে পণ্য এনে তা মজুদ করে রাখে। এক্ষেত্রে মুসলিম ব্যবসায়ীরাও বেশ প্রসিদ্ধ। তাদের মধ্যে বেশি পরিচিত আলাউদ্দিন

[১] গণচীনের একটি জায়গা।

আঁওজি। তিনি 'আঁওহ' শহরের বাসিন্দা। তিনি মূলত রাফেযি মতাদর্শের। তার অনুসারীরাও একই মতাদর্শের। তবে তারা তাকিয়া (দীনের স্বার্থে মিথ্যা বলা) মতবাদে বিশ্বাসী না। এই শহরের কাযি কাযদিন একজন জ্ঞানী-গুণী মানুষ। মুসলমানদের মধ্যে অনেক বিশিষ্টজন হচ্ছেন মুহাম্মাদ শাহ বান্দার। তার ভাই তাকিউদ্দিন অনেক জ্ঞানী-গুণী। এই শহরের জামে মসজিদও অনেক উন্নত। এই শহর মুলাইবারের শহরগুলোর মধ্যে চীনের সবচেয়ে কাছের। এজন্য চীন থেকে অনেকেই এখানে সফরে আসে। এই শহরে মুসলিমদের অনেক সম্মান। রাজার নাম তিরদারি। তিনি মুসলিমদের অনেক সম্মান করেন। চোর ও অপরাধীদের ব্যাপারে খুবই কঠোর।

কাওলামে আমি দেখলাম, এক ইরাকি তিরন্দাজ অন্য আরেকজনকে হত্যা করেছে এবং আঁওজির ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ওই ব্যক্তি অনেক সম্পদশালী ছিলেন। মুসলিমরা সিদ্ধান্ত নিলেন খুন হওয়া ব্যক্তিকে দাফন করে দেবেন। কিন্তু রাজার প্রতিনিধি তাতে বারণ করলেন। তিনি বললেন, যতক্ষণ হত্যাকারীকে আমাদের কাছে সোপর্দ না করা হবে ততক্ষণ খুন হওয়া ব্যক্তিকে দাফন করা হবে না। লাশের সিন্দুক আঁওজির বাড়ির সামনে রেখে দেওয়া হয়। লাশ থেকে যখন দুর্গন্ধ বের হওয়া শুরু হলো তখন আঁওজি খুনিকে সোপর্দ করতে বাধ্য হলেন। আর বললেন, মৃতের উত্তরাধিকারীদের অর্থ দেওয়া হবে, তাকে যেন হত্যা না করা হয়। কিন্তু রাজার লোকজন তা মানল না এবং তাকে হত্যার বদলে হত্যা করল। এরপর খুন হওয়া ব্যক্তিকে দাফন করা হলো। কাওলামে শায়খ ফখরুদ্দিনের খানকায় অবস্থান করি। এই বুযুর্গ শায়খ শিহাবুদ্দিন গাযরুনির ছেলে। কাকামের কোনো খবর পাওয়া গেল না। ওই সময়ই চীনের বাদশাহর দূত যিনি দিল্লি থেকে ফিরছিলেন এবং জাঙ্কে আরোহণ করে কাওলামে প্রবেশ করলেন। তার জাঙ্কও ফেটে গিয়েছিল। চীনবাসী এটাকে কাপড়-চোপড় দিয়ে কোনোরকম রক্ষা করে নিজ দেশে রওনা করেছিল। পরবর্তী সময়ে চীনে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়।

গোয়ার জিহাদে আমার অংশগ্রহণ, মুসলিমদের জয়

আমি ইচ্ছা করেছিলাম কাওলাম থেকে দিল্লি ফিরে যাব এবং বাদশাহকে অবস্থা খুলে বলব। কিন্তু ভয় পেলাম, আবার জিজ্ঞেস করে না বসে—তুমি উপঢৌকন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলে কেন?[১] এজন্য আমি হিনওয়ার শহরে

[১] চূড়ান্ত পর্যায়ের অত্যাচার।

সুলতান জামালুদ্দিনের কাছে আসার ইচ্ছা করলাম। আর ভাবলাম, যতক্ষণ কাকামের সন্ধান না পাব তার কাছেই অবস্থান করব। যখন কালিকোটে পৌছলাম তখন সেখানে বাদশাহর কয়েকটি জাহাজ ছিল। যার মধ্যে তিনি সাইয়েদ আবুল হাসানকে অনেক সম্পদ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যাতে হারমুজ ও কাতিফে গিয়ে যত আরবি সম্ভব তাদের হিন্দুস্তানে নিয়ে আসা হয়। কেননা বাদশাহ আরবিদের সঙ্গে অনেক ভালোবাসা রাখতেন।

আমি আবুল হাসানের কাছে গেলাম। জানতে পারলাম, তার ইচ্ছা হলো গরমকালটি কালিকোটে কাটাবেন। এরপর আরবের দিকে সফর করবেন। আমি বাদশাহর কাছে ফিরে যাব কি না—এ ব্যাপারে তার পরামর্শ চাইলাম। তিনি ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন না। আমি কালিকোটের জাহাজে আরোহণ করলাম। এটি এই মৌসুমের শেষ সফর ছিল। অর্ধেক দিন আমরা চলতাম আর অর্ধেক দিন নোঙর করে রাখতাম। রাস্তায় জলদস্যুদের চারটি নৌকা পাই। অনেক ভয় লাগে। কিন্তু তারা কোনো কিছু করেনি। আমরা ভালোমতো হানুরে পৌছি।

আমি হানুরের সুলতানের কাছে যাই এবং সালাম করি। তিনি আমাকে এক ব্যক্তির ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। কেননা আমার সঙ্গে কোনো চাকর-বাকর ছিল না। পরে ডেকে পাঠালেন যাতে তার সঙ্গে নামায আদায় করি। আমি বেশির ভাগ সময় মসজিদে বসে থাকতাম। প্রতিদিন একবার কুরআন শরিফ খতম করতাম। পরবর্তী সময়ে দিনে দুইবার খতম করা শুরু করলাম। প্রথমটি সকালে শুরু করে দুপুর পর্যন্ত। আর দ্বিতীয়টি যোহর থেকে শুরু করে মাগরিব পর্যন্ত। তিন মাস পর্যন্ত এভাবে চলল। চল্লিশ দিন পর্যন্ত ইতেকাফেও থাকি।[১]

সুলতান জামালুদ্দিন বায়ান্নটি জাহাজ প্রস্তুত করেন। তার ইচ্ছা হলো বুলন্দাপুরে হামলা চালানো।

সেখানকার রাজা এবং তার ছেলের মধ্যে কিছুটা গোলমাল ছিল। রাজার ছেলে সুলতানকে লিখে পাঠালেন, সুলতান সান্দাপুর জয় করলে তিনি মুসলিম হয়ে যাবেন। আর নিজের বোনকে সুলতানের সঙ্গে বিয়ে দেবেন। যখন জাহাজ প্রস্তুত হলো তখন আমার মনে চিন্তা এলো, আমিও জিহাদের

---

[১] মূলত তুঘলকের অসম্ভব শক্তির প্রতিরোধ চেষ্টা।–রইস আহমাদ জাফরি।

সওয়াবে অংশ নিই। আমি কালামুল্লাহ খুলে প্রথমেই যে আয়াত পেলাম সেখানে দেখলাম,

يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ.

'যেগুলোতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে।'

এখানে স্পষ্ট বিজয়ের সুসংবাদ। সুলতান যখন আসরের নামাযের জন্য মসজিদে এলেন তখন আমি তাকে বললাম, আমিও সফর করতে চাই। সুলতান বললেন, ঠিক আছে, আমি আপনাকে জিহাদের আমির নিযুক্ত করতে চাই। আমি কুরআনে কারিমের সেই আয়াতের কথা বললাম। তিনি খুব খুশি হলেন। নিজেও জিহাদে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। অথচ প্রথমে তার যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। আমি এবং তিনি একই জাহাজে আরোহণ করি।

শনিবার দিন আমরা রওনা দিই। মঙ্গলবার সান্দাপুর পৌঁছি এবং উপসাগরে ঢুকি। বুঝতে পারলাম সান্দাপুরের বাসিন্দারা আমাদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। তারা ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করে রেখেছে। আমরা রাতের বেলা অপেক্ষা করি। সকাল হতেই যুদ্ধের নকিব বাজতে থাকে এবং জাহাজ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়। শত্রুপক্ষ ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা জাহাজে পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। এক ব্যক্তি বাদশাহর কাছে দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল। তার ওপর এসে পাথর লাগে। জাহাজের লোকজন পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাদের হাতে তলোয়ার ও ঢাল। সুলতান নিজেও জাহাজ থেকে নেমে যান। আমিও পানিতে নেমে পড়ি। আমাদের কাছে দুটি জাহাজ ছিল, যার পেছন দিকে খোলা। সেখানে ঘোড়াও ছিল। এই জাহাজগুলো এমনভাবে বানানো হয়েছিল, জাহাজের ভেতরে থেকেই অশ্বারোহী চড়তে পারে। লৌহবর্ম পরে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। আমরাও সেটাই করি।

মহান আল্লাহ মুসলিমদের সাহায্য করেন। আমরা তলোয়ার হাতে নিয়ে শহরে প্রবেশ করি। বেশির ভাগ লোক হিন্দু রাজার প্রাসাদে আশ্রয় নেয়। আমরা তাদের অগ্নিসংযোগ করি। অনেককে গ্রেফতার করি। সুলতান তাদের নিরাপত্তা দেওয়ার ঘোষণা দেন। তাদের নারীদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় দশ হাজার ছিল। তাদেরকে শহরের বাইরে থাকার জন্য জায়গা দেওয়া হয়। সুলতান নিজে রাজমহলে গিয়ে সেখানকার ঘরগুলো চাকুরে ও আমিরদের দিয়ে দিলেন। আমাকে একটি দাসী দিলেন,

যার নাম মামকি। আমি তার নাম রাখলাম মোবারক। তার স্বামী আমাকে বিনিময়মূল্য দিতে চাইল। আমি নিতে অস্বীকৃতি জানালাম। সুলতান আমাকে মিশরীয় একটি রুমালও দিয়েছিলেন, যা রাজার প্রাসাদে পাওয়া গিয়েছিল। আমি সুলতানের কাছে সান্দাপুরে ১৩ জুমাদাল উলা থেকে অর্ধ শাবান পর্যন্ত রইলাম। পরে সফরের অনুমতি চাইলাম। সুলতান আমার কাছ থেকে অঙ্গীকার নেন যাতে আমি আবার ফিরে আসি।

আমার দাসী, সাথীসঙ্গী ও দাসদের পরিণতি

পরে জাহাজে আরোহণ করে হানুর ও কালিকোট হয়ে শালিয়াত[১] পৌঁছি। এটি সুন্দর একটি শহর। এখানে উৎকৃষ্টমানের কাপড় বানানো হয়। এই শহরে অনেক দিন থাকলাম। পরে কালিকোটে ফিরে এলাম। আমার দুই গোলাম যারা কাকামে আরোহণ করেছিল তারা বলল, আমার বাঁদি যে গর্ভবতী ছিল, যার ব্যাপারে আমি অনেক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম, সে মারা গেছে। সুমাত্রার রাজা সব বাঁদি ও আসবাবপত্র ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন। আমার সাথীসঙ্গীরা কেউ কেউ সুমাত্রায়, কেউ চীনে এবং কেউ বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে।

এই অবস্থার কথা জেনে আমি হানুরে ফিরে এলাম। সেখান থেকে সিন্দাপুরে ফিরলাম। মুহাররম মাসের শেষ দিকে এখানে পৌঁছলাম। রবিউল আউয়াল মাসের ২ তারিখ পর্যন্ত এখানে থাকলাম। পরে কালিকোটের দিকে যাত্রা করলাম এবং মালদ্বীপ সফরের ইচ্ছা করলাম।

[১] আবে শালমার নামে প্রসিদ্ধ।

মালদ্বীপ

অধিবাসী, ঘরবাড়ি, আচার-আচরণ, প্রথা ও এখানকার নারীরা

এখানকার লোকেরা খুবই যোগ্য, বিশ্বস্ত, সহিহ ঈমান ও নিয়তের অধিকারী সত্যবাদী। হালাল খাবারের ব্যাপারে তারা খুবই আন্তরিক। তারা দোয়া করলে সেটা কবুল হয়। যখন কেউ এদের দিকে তাকায়, তখন তারা বলে আল্লাহ আমার প্রভু, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নবী এবং আমি দরিদ্র ও অজ্ঞ। শারীরিকভাবে তারা হালকা-পাতলা ধরনের। তারা যুদ্ধে অভ্যস্ত না। তাদের মূল হাতিয়ার দোয়া। একবার আমি এক চোরকে হাত কাটার নির্দেশ দিলাম। উপস্থিত সবাই অস্থির হয়ে উঠলেন। কারণ হিন্দুস্তানের চোর-ডাকাতেরাও কোনো ক্ষতি করা হয় না। কেননা তাদের অভিজ্ঞতা হলো, যারা তাদের মালপত্র চুরি করবে অথবা ছিনিয়ে নিয়ে যাবে তাৎক্ষণিকভাবে তার ওপর বিপদাপদ পতিত হবে।

প্রতিটি দ্বীপে মসজিদ আছে। বেশির ভাগ মসজিদ কাঠের তৈরি। এখানকার লোকেরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। বেশির ভাগ লোক দিনে দুই বার গোসল করে। কেননা এখানে গরম অনেক বেশি। অনেক ঘাম বের হয়। সুগন্ধি ও আতরের প্রচুর ব্যবহার হয়। ফজরের নামাযের পর নারীরা তাদের স্বামী অথবা তাদের ছেলেদের কাছে সুরমাদানি, গোলাব ও সুগন্ধি নিয়ে হাজির হন। তারা সুরমা লাগিয়ে দেন। গোলাব ও সুগন্ধি মাখিয়ে দেন। তাদের ঘরবাড়ি কাঠের তৈরি। ঘরের বিছানা মাটি থেকে উঁচুতে থাকে যাতে আর্দ্রতা থেকে রক্ষা পায়। এখানকার লোকেরা নগ্ন পায়ে থাকে। সেটা উচ্চবিত্ত হোক কিংবা নিম্নবিত্ত। তাদের অলিগলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। সেখানে নিয়মিত ঝাড়ু দেওয়া হয়। রাস্তার দুই পাশে গাছগাছালি ভরা। যার কারণে চলন্ত ব্যক্তিরা মনে করে যেন বাগানের মধ্যখান দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। ঘরে ঢোকার আগে প্রত্যেকেই পা ধুয়ে ঢুকে। নারিকেলের ছাল দিয়ে বানানো এক ধরনের পাপোশ বিছানো থাকে। তাতে পা ভালো মতো ঘষে পরিষ্কার করে নেয়। মসজিদে ঢোকার আগেও সেটা করা হয়।

মুসাফিরদের আদর-আপ্যায়ন

এখানকার নিয়ম হলো, যখন কোনো জাহাজ আসে তখন লোকেরা ছোট

নৌকা যাকে কান্দারা বলা হয়, তাতে বসে জাহাজের লোকদের অভ্যর্থনা জানায়। পান ও নারিকেল নিজেদের সঙ্গে নিয়ে যায়। যাকে খুশি তারা পান ও নারিকেল দেয়। যাকে এটা দেওয়া হয় তাকে বুঝাতে হবে তাদের মেহমান। তার আসবাবপত্র উঠিয়ে নিজেদের ঘরে নিয়ে যায়। যেন তাদের কোনো প্রিয়জন এসেছে। ওই মুসাফির বিয়ে করতে চাইলে তাকে বিয়েও করিয়ে দেওয়া হয়। যখন তারা চলে যায় তখন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে যায়। কেননা এখানকার নারীরা দ্বীপের বাইরে যায় না। বিয়ে করতে না চাইলে মেজবানের স্ত্রী মেহমানের জন্য খাবার রান্না করে এবং প্রয়োজনীয় সেবা দেয়। যখন সফরে যায় তখন পাথেয় সংগ্রহ করে দেয়। এর বিনিময়ে কিছু দিলে অনেক খুশি হয়।

নারিকেলের রশি ও পাত্র ইত্যাদি

এখানকার লোকেরা মাটির পাত্র মুরগির বিনিময়ে কিনে। একটি ডেকচির বিনিময় পাঁচটি মুরগি। এসব দ্বীপ থেকে জাহাজ মাছের গোশত, নারিকেল, চাদর, তুলার তৈরি পাগড়ি, তামার পাত্র, নারিকেলের রশি নিয়ে যায়। নারিকেলের ওপরের ছোবড়া সমুদ্রের কিনারে পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। পরে তা মুগুর দিয়ে পিটিয়ে ছোবড়ার আঁশ ছড়ানো হয়। পরে মেয়েরা তা দিয়ে সরু রশি তৈরি করেন। সেই রশি ইয়েমেন, হিন্দুস্তান ও চীনে বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এই রশি বেশ মজবুত হয়। হিন্দুস্তান ও ইয়েমেনে জাহাজের কাঠ এই রশি দ্বারা জোড়া লাগানো হয়। সেখানে লোহার পেরেক ব্যবহার করা হয় না। কেননা লোহার পেরেক পাথরের সঙ্গে টক্কর লাগলে ভেঙে যায়। আর রশি দ্বারা জাহাজ বানালে সেটা যেকোনো দুর্যোগেও সাধারণত ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

এসব দ্বীপে কড়ির খুব প্রচলন। কড়ি এক ধরনের প্রাণী (শামুক) হয়। এগুলো বেছে বেছে সমুদ্রের কিনারে একটি গর্তে রাখা হয়। এতে ওই প্রাণী শুকিয়ে যায় এবং এর সাদা হাড়টুকুই বাকি থাকে। একশ কড়িকে 'সিয়াহ' বলা হয়। সাতশ কড়িকে 'কাল', বারো হাজারকে 'কুত্তি' এবং এক লাখ কড়িকে 'বুসতু' বলা হয়। চার বুসতুকে এক চতুর্থাংশ দিনারের বিনিময়ে বিক্রি করা হয়। অনেক সময় দাম পড়ে গেলে দশ বসতুতেও বিক্রি করে। বাংলায় এর বিনিময়ে চাল দেওয়া হয়। বাংলায়ও কড়ির ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। ইয়েমেনবাসীও কড়ি কিনে। বালুর পরিবর্তে জাহাজে এগুলো

বিছিয়ে দেওয়া হয়। সুদানেও কড়ির প্রচলন আছে। মালি ও জুজে এক চতুর্থাংশ দিনারের বিনিময়ে ১১৫০ কড়ি বিক্রি হয়।

মালদ্বীপের নারীরা এবং তাদের চালচলন

এই দ্বীপের নারীরা তাদের মাথা ঢাকে না। তাদের রানিও মাথা ঢাকেন না। চুল চিরুনি করে। চুলগুলো মাথার এক দিকে এনে বেঁধে রাখে। বেশির ভাগ একটি চাদর পরে, যার দ্বারা নাভির নিচে পা পর্যন্ত ঢেকে যায়। বাকি শরীর নগ্ন থাকে। হাট-বাজার ও অলিতে-গলিতেও নারীরা এভাবেই চলাফেরা করে।

আমি যখন সেখানকার কাজি নিযুক্ত হলাম তখন অনেক চেষ্টা করেছি এই নিয়ম ভাঙার। পোশাক পরার নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু আমি সফল হইনি। পরে আমি নির্দেশ দিয়েছি, আমার সামনে কোনো নারী এসে মামলা পেশ করতে হলে তাকে পুরো শরীর ঢেকে আসতে হবে। আমি এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারিনি। কোনো কোনো নারী শাড়ির ওপর একটি ছোট ও লম্বা আস্তিনের একটি কুর্তা পরে। আমার বাঁদিদের পোশাক ছিল দিল্লির লোকদের মতো। তারা তাদের মাথাও কাপড় দ্বার ঢেকে রাখত। কিন্তু স্থানীয় নারীরা এটাকে ভালো চোখে দেখত না। তাদের অলংকার হলো কাঁকন। দুই হাত কব্জি থেকে নিয়ে কনুই পর্যন্ত এর দ্বারা ঢাকা থাকত। এই কাঁকন ছিল রুপার তৈরি। কেননা বাদশাহ ও তার স্বজনদের ছাড়া কেউ স্বর্ণের তৈরি কাঁকন পরতে পারতো না। তারা পায়ে নূপুরও পরতো, যাকে পায়েল বলা হয়। সোনার হার গলায় পরে, যাকে বসদরদ বলা হয়।

এই দ্বীপে একটি বিস্ময়কর নিয়ম আছে। সেটা হলো, এখানকার নারীরা পাঁচ দিনার অথবা এর চেয়ে কম বেতনে খাওয়া-পরার বিনিময়ে মানুষের বাসাবাড়িতে কাজ করে। এটাকে কেউ দোষের কিছু মনে করে না। সম্পদশালী লোকদের বাড়িতে দশ-বিশজন করে কাজের মহিলা আছে। কোনো কাজের মহিলা পাত্র ভেঙে ফেললে সেটা তার বেতন থেকে কাটা হবে। এমনিভাবে এখানকার অনেক নারী নারিকেলের রশি তৈরির কাজে নিয়োজিত থাকে।

এই দ্বীপে খুব সহজেই বিয়ে হয়ে যায়। কেননা মোহর খুবই কম হয়। নারীরা সদাচারের জন্য বিখ্যাত। বেশির ভাগ মানুষ মোহর নির্দিষ্টও করে

না। এমতাবস্থায় 'মহরে মিছিল' দেওয়া হয়। নারীরা তাদের স্বামীদের শুধু এক ধরনের খেদমত করে না। বরং তারা খাবার এনে দেয়, হাত ধুইয়ে দেয়, অযুর পানি এনে দেয়, ঘুমানোর সময় হাত-পা বানিয়ে দেয়। এখানকার নারীরা স্বামীর সঙ্গে কখনো খায় না। এমনকি স্বামীরা জানেও না তাদের স্ত্রীরা কী খায়। আমি সেখানকার কয়েকজন নারীকে বিয়ে করেছিলাম। অনেক পীড়াপীড়ির পর কেউ কেউ আমার সঙ্গে খাবার খেতে সম্মত হয়েছে, আবার কেউ কেউ হয়নি। আমি অনেক চেষ্টা করেছি তাদের খাবার দেখতে, কিন্তু তাতে আমি ব্যর্থ হয়েছি।

মালদ্বীপের অধিবাসীদের ইসলাম গ্রহণ

এই দ্বীপের বিভিন্ন বিশ্বস্ত মানুষ যেমন ফকির ঈসা ইয়েমেনি, ফকিহ মুয়াল্লিম আলী ও কাজি আবদুল্লাহ প্রমুখ আমার কাছে এটা বর্ণনা করেছেন যে, এই দ্বীপের অধিবাসীরা মূর্তিপূজক ছিল। প্রতি মাসে সমুদ্রের দিক থেকে এক জিন আসত। তাদের নিয়ম ছিল, যখনই ওই জিনকে দেখত একটি কুমারী মেয়েকে সাজিয়ে সমুদ্র তীরবর্তী মন্দিরে রেখে দিত। সকালে তাকে মৃত এবং কুমারিত্ব হারানো অবস্থায় পেত। প্রতি মাসে নিজেদের মধ্যে লটারি হত। যার নাম লটারিতে উঠতো সে তার মেয়েকে পাঠাত বাধ্য হত।

একবার ওই দ্বীপে আবুল বারাকাত বারবারি নামে এক মুসাফির এলেন। তিনি হাফেযে কুরআন ছিলেন। তিনি মিহাল দ্বীপে এক বৃদ্ধার ঘরে অবস্থান করেন। এক দিন তিনি ঘরে ঢুকে দেখলেন ওই বৃদ্ধা এবং তার স্বজনরা কান্নাকাটি করছে। কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, এই মাসে লটারিতে ওই বৃদ্ধার নাম এসেছে। আর তার মেয়ে মাত্র একটিই।

আবুল বারাকাত বললেন, তোমার মেয়ের পরিবর্তে আমি সেখানে যাব। ওই ব্যক্তির দাড়ি-গোঁফ কিছু ছিল না। কুমারী মেয়ের পরিবর্তে তাকে মন্দিরে রেখে আসা হলো। তিনি অযু করে সেখানে কুরআনে কারিম তেলাওয়াত শুরু করলেন। জিন এলো, কিন্তু যখন তাকে কুরআন তেলাওয়াত করতে দেখল তখন ফিরে গেল। এদিকে সকাল হয়ে গেল। আবুল বারাকাত তেলাওয়াত করছিলেন। বৃদ্ধা ও তার স্বজনরা তার লাশ নেওয়ার জন্য এসে তাকে জীবিত অবস্থায় দেখে চমকে উঠল। তাকে বাদশাহর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। বাদশাহর নাম ছিল শানোরাজা। তাকে পুরো ঘটনা খুলে বলা হলো এবং তিনি খুবই বিস্মিত হলেন।

আবুল বারাকাত মাগরেবি বাদশাহকে মুসলিম হতে উদ্বুদ্ধ করেন। বাদশাহ বললেন, আপনি আগামী মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আগামী মাসেও আপনি মন্দির থেকে জীবিত অবস্থায় ফিরলে আমি মুসলিম হয়ে যাব। মাগরেবি সেখানে রয়ে গেলেন। এক মাস পূর্ণ না হতেই বাদশাহর অন্তরে ইসলামের ভালোবাসা ঢুকে যায়। তিনি তার আমির ও প্রজাসাধারণসহ মুসলিম হয়ে যান। মন্দির ভেঙে দিলেন এবং গোটা দ্বীপের মানুষ মুসলিম হয়ে গেল। এভাবে অন্যান্য দ্বীপের মানুষও মুসলিম হয়ে গেল।

মাগরেবির প্রভাবে এই দ্বীপের সবাই মালেকী মাযহাবের অনুসারী হয়ে যায়। এই দ্বীপের লোকেরা মাগরেবিকে অনেক ভালোবাসত। তার নামে একটি মসজিদও নির্মাণ করে, যা আজও তার নামে প্রসিদ্ধ। সেই মসজিদের মেহরাবে খোদাই করে লেখা আছে, সুলতান আহমাদ শানোজাদা, আবুল বারাকাত মাগরেবির হাতে মুসলমান হন। ওই বাদশাহ দ্বীপের আয়ের এক তৃতীয়াংশ মুসাফিরদের জন্য বরাদ্দ করেন। কেননা, তাদের মুসলিম হওয়ার উসিলা ছিলেন একজন মুসলিম। এখন পর্যন্ত সেটা বাস্তবায়ন হয়ে আসছে।

মালদ্বীপের রানি ও তার অবস্থা

এটাও একটি বিস্ময়কর বিষয় যে, এসব দ্বীপের বাদশাহ একজন নারী। তার নাম খাদিজা। তিনি সুলতান জালালুদ্দিন উমর বিন সুলতান সালাহুদ্দিন সালেহ বাঙালির মেয়ে।

এই দ্বীপগুলোর সরকারি সব নির্দেশনা খেজুর পাতায় লেখা হয়। কাগজে শুধু কুরআনে কারিম ও কিতাবাদি লেখা হয়। সরকারি নির্দেশনামা জুমার দিন খতিব অথবা অন্য কোনো দিন শোনানো হয়। নির্দেশনামা শুরু করা হয় এভাবে– হে খোদা! তোমার বাঁদিকে সাহায্য করো, যাকে তুমি তার ইলমের কারণে সব মানুষের ওপর সম্মানিত করেছ এবং যাকে তুমি সমস্ত মুসলিমের জন্য রহমত বানিয়েছ। তিনি কে? তিনি সুলতানা খাদিজা। জালালুদ্দিনের মেয়ে, যিনি সুলতান সালাহুদ্দিনের ছেলে ছিলেন।

এই দেশের নিয়ম হলো, যখন কোনো মুসাফির আসে, প্রথমে রাজপ্রাসাদে যায়। সেই মুসাফির সঙ্গে করে দুটি কাপড় নিয়ে যায়। একটি রানিকে সালাম করার সময় তার পায়ের নিচে বিছিয়ে দেয়। আর দ্বিতীয়টি উযির জামালুদ্দিনকে সালাম করার সময় তার পায়ের নিচে বিছিয়ে দেওয়া হয়।

এই রানির সৈন্য সংখ্যা এক হাজারের কাছাকাছি। তারা সবাই বিদেশি। তারা প্রতিদিন রাজপ্রাসাদে আসে এবং সালাম করে চলে যায়। তারা ভাতা হিসেবে চাল পায়। যা সরকারি কোষাগার থেকে আসে। মাস শেষ হওয়ার পর সৈন্যরা রাজপ্রাসাদে আসে এবং সালাম করে। উযির করে বলে, আমাদের সালাম রানির কাছে পৌছে দিন। আমরা আমাদের ভাতার জন্য এসেছি। তখন উযির নির্ধারিত ভাতা দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। কাজি ও সব উযির প্রতিদিনই আসে। ক্রীতদাসেরা তাদের সালাম রানির কাছে পৌছে দেয় এবং তারা সন্তুষ্ট হয়ে চলে যায়।

উযিরে আজম যিনি রানির প্রতিনিধি, তাকে কালকি বলা হয়। কাজিকে ফিন্দিয়ার কামুলা বলা হয়। কাজির পদ সবচেয়ে বড়। তার নির্দেশ বাদশাহর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি রাজপ্রাসাদে নির্ধারিত আসনে বসেন। তিন দ্বীপের আয় কাজির জন্য বরাদ্দ। এটা সুলতান আহমাদ শাহ শানোরাজের সময় থেকে চলে আসছে। খতিবকে বলা হয় হিন্দি বাহরি। দেওয়ানকে ফালদারি, হাকিমকে কিতায়িক, সমুদ্র সেনাপতিকে মামায়িক বলা হয়। এসব পদধারীদের উযির বলা হয়। এই দেশে কোনো কারাগার নেই। বেশি কয়েদি হলে সওদাগরদের জন্য বানানো কাঠের তৈরি ঘরে বন্দি করে রাখা হয়। একজন কয়েদি হলে হাজতখানায় রেখে দেওয়া হয়, যেমন আমাদের দেশে ফিরিঙ্গি কয়েদিদের বন্দি করে রাখা হয়।

মালদ্বীপের রাত-দিন

আমার উত্থান ও পতন, নতুন নতুন বিয়ে, বিদায়

সর্বপ্রথম আমি কানলুস দ্বীপে পৌছি। এই দ্বীপটি অনেক সুন্দর। এখানে মসজিদ অনেক বেশি। এখানে সালেহ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে অবস্থান করি। আমি এখানে এসেছি নাখোযা উমর হানুজির জাহাজে করে। এই ব্যক্তি হাজি এবং জ্ঞানী-গুণী। তিনি একটি নৌকা (কান্দারা) ভাড়া করলেন এবং রানি ও উযিরের জন্য উপঢৌকন নিয়ে চললেন। আমিও তার সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম।

ষষ্ঠ দিন আমরা উসমানের দ্বীপে পৌছি। এই ব্যক্তি অনেক জ্ঞানী ও নেককার। তিনি আমাদের মেহমানদারি করেন। আমরা অষ্টম দিনে উযিরের দ্বীপে পৌছি, যাকে তালমাদি বলা হয়। দশম দিন মহালের দ্বীপে পৌছি। সেখানে রানি ও উযির থাকেন।

সেখানকার নিয়ম হলো, কেউ অনুমতি ছাড়া জাহাজ থেকে নামতে পারবে না। যখন অনুমতি এলো আমি মসজিদের দিকে রওনা করলাম। খাদেমরা বললেন, প্রথমে উযিরের কাছে যেতে হবে। আমি নাখোযাকে আগেই বলে দিয়েছিলাম, আপনার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে কিছু জানি না বলবেন। কেননা আমার ভয় ছিল আবার আমাকে এই দ্বীপে রেখে দেয় কি না! আমি এটা ঘুণাক্ষরেও জানতাম না, কেউ একজন আগেই আমার ব্যাপারে লিখে পাঠিয়েছে যে, এই ব্যক্তি অমুক, তিনি দিল্লির কাজি ছিলেন।

আমি যখন রাজপ্রাসাদে পৌঁছি তৃতীয় দরজার কাছে অবস্থান করি। কাজি ঈসা ইয়েমেনি আমার কাছে এলেন। তিনি আমাকে সালাম করলেন। আমি উযিরকে সালাম করলাম। নাখোযা ইবরাহিম এলেন এবং নিজের সঙ্গে করে দশটি ঘোড়া আনলেন। প্রথমে তিনি রানির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন। তার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি কিছু জানেন না বলে জানালেন। পরে তিনি আমার কাছে পান ও গোলাব পাঠালেন। এটাকে এই দেশে অনেক সম্মানের মনে করা হয়। আমি রাজপ্রাসাদের অবস্থান করতে লাগলাম। এরপর আমাদের জন্য খাবার এলো। একটি বড় খাঞ্চার মধ্যে কয়েকটি পেয়ালা ছিল। তাতে ভুনা গোশত, মুরগির গোশত, মাখন ও মাছ ছিল।

পরদিন সকাল সকাল উযির আমার কাছে একটি খিলআত (শাহি পোশাক) পাঠালেন। সঙ্গে ভাত, ঘি, ভুনা গোশত এবং নারিকেলের মধু পাঠালেন। নারিকেলের মধুকে এখানকার লোকেরা কুরবানি বলে। অর্থাৎ চিনির পানি দ্বারা বানানো। সঙ্গে খরচের জন্য এক লাখ কড়িও পাঠালেন। দশ দিন পর সায়লান দ্বীপ থেকে একটি জাহাজ এলো। এতে আরব ও আজমের সাধকরাও ছিলেন। তারা আমাকে ভালো মতো চিনতেন। তারা উযিরের কর্মচারীদের কাছে আমার প্রকৃত পরিচয় জানিয়ে দেন। এরপর তারা আমাকে আরো বেশি সম্মান করতে থাকেন।

রমযানের চাঁদ রাতে উযির আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি গেলাম। সেখানে আমির ও অন্যান্য উযিররা উপস্থিত ছিলেন। খাবার এলো। দস্তরখানে অনেক ধরনের মানুষ যোগ দিলেন। উযির আমাকে নিজের পাশে বসালেন। তার কাছে কাজি ঈসা, উযির ফামলদারি ও উযির আমরধরি অর্থাৎ সেনাপতি উপস্থিত ছিলেন। ভাত, মুরগির ঝোল, মাখন, গোশত ভুনা

ইত্যাদি দস্তরখানে রাখা হয়। খাবারের পর এখানকার লোকেরা নারিকেলের মধু যাতে সুগন্ধি মেশানো থাকে, তা পান করে। এটি খাবার হজমে সহায়তা করে। খাবার শেষ হওয়ার পর উযির তার ঘরে চলে গেলেন, আমিও তার সঙ্গে গেলাম। আমরা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একটি বাগানের মধ্যখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। উযির বললেন, এই বাগানটি আপনাকে দিয়ে দেওয়া হলো। এখানে আপনার থাকার জন্য একটি ঘর বানিয়ে দেওয়া হবে। সুতরাং আমি তার কৃতজ্ঞতা আদায় করলাম এবং তার জন্য দোয়া করলাম।

মারাঠি বাঁদির বিপরীতে মালদ্বীপের বাঁদি প্রত্যাখ্যান করলাম

পরদিন আমার জন্য একটি বাঁদি পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আর বলা হলো, এই বাঁদি আপনার পছন্দ হলে রেখে দেবেন। না হলে একটি মারাঠি বাঁদি পাঠানো হবে। মারাঠি বাঁদি আমার অনেক পছন্দের। আমি বললাম, মারাঠি বাঁদি পাঠিয়ে দেবেন। উযির পাঠিয়ে দিলেন। তার নাম ছিল গুল বুস্তান। ফারসি বলতে পারত। পরদিন মাবারি এক বাঁদি আমার কাছে পাঠানো হলো। তার নাম ছিল আনবারি। তৃতীয় রাতে ইশার নামাযের পর উযির তার কিছু সাথীসঙ্গী নিয়ে আমার থাকার জায়গায় এলেন। তার সঙ্গে দুজন ছোট ছোট ক্রীতদাস ছিল। আমি তাকে দেখে সালাম করলাম। তিনি আমার খবরাখবর জানতে চাইলেন। আমি দোয়া করলাম। এরপর এক গোলাম একটি বাক্স সামনে রাখল। এর ভেতর থেকে রেশমি কাপড় বের করল। এরপর সেখান থেকে একটি ডিব্বা বের করল, যার মধ্যে মোতি ও অলংকারাদি ছিল। সবগুলো আমাকে দিয়ে বললেন, এই আসবাবপত্রগুলো বাঁদির সঙ্গে পাঠালে সে জানত এগুলো আমাদের মনিবের। এখন এগুলো আপনার আসবাব। আপনি নিজের পক্ষ থেকে এগুলো বাঁদিদের দিয়ে দিন। আমি তার জন্য দোয়া করলাম এবং কৃতজ্ঞতা আদায় করলাম। কেননা তিনি কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য ছিলেন।

দিল্লি থেকে মালদ্বীপে বেশি আভিজাত্য

নৌ-সেনাপতি উযির সুলাইমান তার মেয়েকে আমার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার বার্তা পাঠালেন। আমি উযির জামালুদ্দিনের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলাম। কিন্তু তিনি অসম্মতি জানালেন। আর বলে পাঠালেন, আমি আমার মেয়ে যে সুলতান শিহাবুদ্দিনের বিধবা স্ত্রী, তাকে আপনার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাচ্ছি।

ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর তাকে আপনার সঙ্গে বিয়ে দেব।[১] কিন্তু আমি তাতে সম্মত হলাম না। কারণ এটাকে আমি অশুভ মনে করলাম। কেননা এর আগে তার দুই স্বামী মারা গেছেন। ইতিমধ্যে আমার গায়েও জ্বর আসে। এই দ্বীপে নতুন যে মুসাফির আসে তার অবশ্যই জ্বর হয়ে থাকে। এজন্য সফরের ইচ্ছা পাকাপোক্ত করে ফেললাম। কিছু অলংকার আমি কড়ির বিনিময়ে বিক্রি করে দিলাম। বাংলায় যাওয়ার জন্য একটি জাহাজও ভাড়া করলাম। উযিরের ইচ্ছা ছিল আমি যেন না যাই। তিনি তার সঙ্গীকে আমার কাছে পাঠালেন এবং প্রস্তাব দিলেন, আপনি আমাদের এখানে অবস্থান করলে যা চাইবেন তাই দেওয়া হবে।

আমি মনে মনে ভাবলাম, আমি এই মুহূর্তে তার সাম্রাজ্যে অবস্থান করছি। তিনি থাকতে বাধ্য করার চেয়ে সন্তুষ্টচিত্তে সম্মত হলে সেটা ভালো হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে আমি অবস্থান করব। ওই ব্যক্তি গিয়ে উযিরের কাছে এটা বললেন। উযির তা শুনে অনেক খুশি হলেন এবং আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি বললাম, আপনি আমাকে এখানে রাখতে চাইলে কয়েকটি শর্ত মানতে হবে। উযির বললেন, আমি সব শর্ত মানতে রাজি, আপনি বলুন। আমি প্রথম শর্তে বললাম, পায়ে হেঁটে চলতে পারব না। এই দেশের নিয়ম হলো, উযির ছাড়া কেউ ঘোড়ায় চড়ার অনুমতি পায় না।

উযির বললেন, আপনি পালকিতে চড়তে চাইলে তা প্রস্তুত আছে। অন্যথায় ঘোড়া বা মাদি ঘোড়া যা পছন্দ হয় নিন। আমি একটি মাদি ঘোড়া পছন্দ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে তা হাজির করা হলো। সঙ্গে শাহি পোশাকও আনা হলো।

যে কারো সঙ্গে হোক বিয়ে হতে হবে

শাওয়ালের দ্বিতীয় দিন নৌ-সেনাপতি উযির সুলাইমানের মেয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা হয়। তিনি বললেন, আজ বিয়ে হয়ে যাবে। আমি উযিরকে বলে পাঠালাম, তার মহলে তার সামনে বিয়ে হবে। উযির তা মঞ্জুর করলেন। পান ও চন্দন আনা হলো। লোকজনও জড়ো হলো। কিন্তু উযির সুলাইমানের দেরি হয়ে গেল। আসবেন বলে জানিয়েও এলেন না। দ্বিতীয়বারও লোক গেল। তিনি জানালেন, তার মেয়ে আছে। কিন্তু এলেন

[১] এই মেয়ে বালেগা হওয়ার পূর্বেই বিধবা হয়ে গিয়েছিল।

না। শেষ পর্যন্ত উযির আমার কানে কানে বললেন, তার মেয়ে হয়ত মানছে না। কিন্তু যেহেতু লোকজন জড়ো হয়ে গেছে আপনার সম্মতি থাকলে রানির বাবার বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে আপনার বিয়ে দিয়ে দিই। তার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হয়েছে। আমি সম্মতি দিলাম। উযির সঙ্গে সঙ্গে কাজি ও সাক্ষীদের ডেকে পাঠালেন এবং বিয়ে হয়ে গেল। উযির আমার পক্ষ থেকে মোহর আদায় করে দিলেন। কয়েক দিন পর তিনি আমার ঘরে এলেন। খুবই নেককার নারী ছিলেন। প্রথম দিনই তিনি আমার শরীরে সুগন্ধি মেখে দেন। আমার কাপড়েও সুগন্ধি লাগিয়ে দেন। তিনি খুব হাসিখুশি ছিলেন। কখনো তার চেহারা মলিন দেখা যায়নি।

কাজির পদ, একটির পর দ্বিতীয়টি, অতঃপর অব্যাহত বিয়ে

এই বিয়ের পর উযির আমাকে কাজির পদ নিতে বাধ্য করেন। কাজি হওয়ার পর আমি শরয়ি নিয়মকানুন চালুর চেষ্টা চালাই। এই দ্বীপে আমাদের দেশের মতো অনেক মোকাদ্দমা ও দেনদরবার নেই। এখানকার নিয়ম ছিল, তালাক দেওয়ার পরও যতক্ষণ দ্বিতীয় বিয়ে না হয়েছে ততক্ষণ আগের স্বামীর সংসারে থাকতে পারত। এ ধরনের পঁচিশজনকে আমি তলব করি এবং তাদের বেত্রাঘাত করি। এটি ব্যাপকভাবে প্রচার করি। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের ঘর থেকে বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করি। নামাযের পাবন্দির ব্যাপারেও আমি কঠোরতা করি। নির্দেশ দিয়ে দিই, জুমার আযানের পর বাজারে বা অলিগলিতে কাউকে পেলে তাকে ধরে আনা হবে। ইমাম ও মুয়াযযিনদের ভাতা নির্ধারণ করে দিই। সব দ্বীপে এ ধরনের নির্দেশনা জারি করি। নারীদের কাপড় পরার নির্দেশ দিই। কিন্তু এক্ষেত্রে সফল হইনি। আমি দ্বিতীয় বিয়ে করি। তিনিও বড় উযিরের মেয়ে। এই উযিরের দাদা সুলতান দাউদ শানোরাজার নাতি ছিলেন। এরপর সুলতান শিহাবুদ্দিনের বিধবা স্ত্রীকেও আমি বিয়ে করি। উযির আমাকে যে বাগান দিয়েছিলেন সেখানে তিনটি ঘর তৈরি করি। চতুর্থ স্ত্রী ছিলেন উযির আবদুল্লাহর মেয়ে। তিনি নিজের ঘরে আলাদা থাকতেন। তিনি ছিলেন আমার সবচেয়ে প্রিয়। যখন আমি এই আত্মীয়তার সম্পর্ক করে নিই তখন সব উযির এবং দ্বীপবাসী আমাকে ভয় পেতে থাকেন। তারা উযিরের কাছে আমার ব্যাপারে চোগলখুরি করতে থাকেন। এ ক্ষেত্রে বেশি ভূমিকা পালন করেন উযির আবদুল্লাহ। শেষ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করে দেন।

ঘটনাক্রমে এক দিন সুলতান জামালুদ্দিনের এক ক্রীতদাসের ব্যাপারে উযিরের কাছে অভিযোগ আসে, এই ক্রীতদাস বাদশাহর দাসীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছে। উযির সাক্ষী পাঠালেন। তারা বাঁদির থাকার জায়গায় গিয়ে দেখলেন বাঁদি ও ক্রীতদাস একই বিছানায় শুয়ে আছে। তারা উভয়কে গ্রেফতার করলেন। সকালে আমার কাচারিতে গিয়ে বসি। উযির আমার কাছে আরেক উযিরকে এই বলে পাঠালেন যে, গত রাতে এই ঘটনা ঘটেছে, এ ব্যাপারে শরিয়তের যে নির্দেশনা সেটাই যেন বাস্তবায়ন করি। আমি তাদের দুজনকে এক পাশে নিয়ে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দিলাম। পরে বাঁদিকে ছেড়ে দিলাম আর ক্রীতদাসকে গ্রেফতার রাখতে বললাম। এরপর আমি ঘরে চলে যাই। উযির আমার কাছে কয়েকজন বড় বড় আমির পাঠালেন। তারা এসে সুপারিশ করলেন আমি যেন ক্রীতদাসকেও ছেড়ে দিই। আমি বললাম, উযির কি এক অসভ্য ক্রীতদাসের পক্ষে সুপারিশ করছেন, যে তার মনিবের সম্মানের প্রতি কোনো খেয়াল রাখেনি! আমি ক্রীতদাসকে বেত লাগানোর নির্দেশ দিলাম। বেত চাবুকের চেয়েও কঠোর শাস্তি। পরে তার গর্দানে রশি বেঁধে পুরো দ্বীপে ঘোরানো হয়।

আমিররা গিয়ে উযিরের কাছে এই ঘটনা বললেন। তিনি রাগে ফেটে পড়লেন। রাগের চোটে কখনো উঠতে লাগলেন, আবার কখনো বসতে লাগলেন। এ সময় উযির সব উযির ও সেনাবাহিনীর সব অফিসারকে ডাকালেন। আমাকেও ডেকে পাঠালেন। আমি তার ডাক পেয়ে ছুটে যাই এবং নিয়ম বহির্ভূতভাবে তার প্রতি কোনো সম্মান দেখাইনি। শুধু সালাম দিয়ে বসে যাই। পরে আমি উপস্থিত সবার উদ্দেশে বলি, আপনারা সবাই সাক্ষী থাকবেন, আমি সব পদ থেকে ইস্তফা দিলাম। কেননা আমার নির্দেশনা চলার মতো নয়। এর মধ্যেই মাগরিবের আযান হয়ে যায়। উযির তার মহলে চলে গেলেন। আমার কাছে বরখাস্তকৃত কাজিকে পাঠালেন। এই ব্যক্তি খুবই বাকপটু ছিলেন। তিনি এসে আমাকে বললেন, উযির বলেছেন আপনি তাকে জনসম্মুখে অসম্মান করেছেন, তার প্রতি কোনো সম্মান দেখাননি। আমি বললাম, যতক্ষণ আমার অন্তর পরিষ্কার ছিল ততক্ষণ আমি সম্মান দেখিয়েছি। যখন অন্তর আর পরিষ্কার থাকেনি তখন আর সম্মান দেখাইনি। কাজি আমার কাছে পুনরায় এসে বললেন, আপনি দ্বীপ থেকে চলে যেতে চাচ্ছেন। আপনি যদি আপনার ধারকর্জ পরিশোধ করতে পারেন এবং বিয়ে করা নারীদের মোহর আদায় করতে পারেন তাহলে চলে যাবেন।

আমি বললাম, ঠিক আছে। আমি ঘরে গেলাম এবং সব ধারকর্জ পরিশোধ করে দিলাম। যখন উযির জানতে পারলেন আমি ধারকর্জও পরিশোধ করেছি তখন সফরের অনুমতি দিতে তালবাহানা করতে লাগলেন। আমি শক্ত শপথ করে বললাম, এই দ্বীপে আর থাকব না। নিজের সব আসবাবপত্র নিয়ে একটি মসজিদে চলে গেলাম। এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিই। আরেকজন গর্ভবতী থাকায় নয় মাসের সময় নির্ধারণ করি। নয় মাসের মধ্যে ফিরে না এলে তার তালাকের অধিকার থাকবে। সুলতান শিহাবুদ্দিনের বিধবাকে নিজের সঙ্গে নিই। মুলুক দ্বীপে তার বাবা থাকেন, সেখানে রেখে যাব বলে ইচ্ছা করলাম। আর নিজের প্রথম স্ত্রী যার মেয়ে রানির বোন তাকেও নিজের সঙ্গে নিই।

ইবনে বতুতার পক্ষ থেকে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র

সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর দায়িত্বে থাকা উযিরের সঙ্গে আমি এই অঙ্গীকার করি যে, আমি মা'বার দেশে যাচ্ছি। সেখানকার বাদশাহ আমার স্ত্রীর ভগ্নিপতি। তার বাহিনী এই দ্বীপে নিয়ে আসব এবং এই দ্বীপকে পুনরায় তার অধীনস্থ করব। আর তার সহযোগী হয়ে আমি থাকব। আমি এর নিদর্শন এটা ঠিক করি যে, যখন আমরা জাহাজে সাদা পতাকা দাঁড় করব তখন দ্বীপে আপনারা (দুই উযির) বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন। উযিরের আচরণ যদি প্রকাশ্যে পাল্টে না যেত আমার অন্তরে কখনো এমনটা আসত না।

এরপর আমার কাছে উযির ও আমির এলেন। তারা আমাকে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে অনুরোধ করলেন। আমি বললাম, আমি তো শপথ করেছি। তারা বললেন, শপথ তো ভাঙা যায়। আপনি একবার এই দ্বীপ থেকে কোথাও যান এরপর আবার ফিরে আসুন। আমি বললাম, ঠিক আছে, তা করা যাবে। সফরের রাতে আমি উযিরের কাছে গেলাম বিদায় নিতে। তিনি আমার সঙ্গে কোলাকুলি করলেন এবং কাঁদতে থাকলেন। তাঁর চোখের অশ্রু আমার পায়ে এসে পড়ছিল। ওই রাত পুরোটা দ্বীপের নিরাপত্তা অনেক জোরদার করা হয়, আবার আমার শ্বশুর ও জামাতা যেন আমার সঙ্গে মিলে বিদ্রোহ ঘোষণা না করে বসে। আমি সেখান থেকে বিদায় নিয়ে উযির আলীর দ্বীপে পৌঁছি। সেখানে যাওয়ার পর আমার স্ত্রীর প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হলো। সে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করল। আমি তাকে তালাক দিয়ে সেখান থেকে বিদায় করে দিই। আর উযিরের কাছে একটি পত্র লেখি এই মর্মে যে, অন্যান্য স্ত্রীদেরও

আমি তালাক দিয়েছি। প্রথমে নয় মাসের যে মেয়াদ নির্ধারণ করেছিলাম তা রহিত করে দিই। এবার আমার সঙ্গে মাত্র একজন বাঁদি রইল যাকে আমি ভালোবাসতাম।[১]

মালদ্বীপ থেকে বিদায়, রাস্তায় আরো দুটি বিয়ে

এরপর পর্যায়ক্রমে সব দ্বীপে ঘুরে বেড়াই। একটি দ্বীপে এক স্তন বিশিষ্ট নারী দেখতে পেলাম। তার দুই মেয়ে। এর মধ্যে একজন এক স্তনের অধিকারী, আরেকজন দুই স্তনের অধিকারী। তবে একটি ছোট আরেকটি বড়। বড় স্তনে দুধ ছিল আর ছোটটিতে দুধ ছিল না। এটা দেখে আমি খুবই বিস্ময় বোধ করলাম। একটি দ্বীপ ছিল খুবই ছোট। সেখানে মাত্র একটি ঘর। ওই লোক কাপড় বোনার কাজ করেন। তার স্ত্রীর বাচ্চা ছিল। নারিকেল গাছ লাগানো ছিল। তার কাছে ছিল একটি ছোট্ট নৌকা। সেই নৌকায় বসে লোকটি মাছ ধরত। কোথাও গেলে এই নৌকাতে করেই যেত। আমি এই তাঁতির জীবনের ব্যাপারে ঈর্ষা করলাম। মনে মনে বললাম, এই দ্বীপটি যদি আমি পেয়ে যাই এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করব। এখানকার মাটিতেই সমাহিত হতে চাই।

এরপর আমরা মুলুক দ্বীপে পৌঁছি। সেখানে নাখোযা ইবরাহিমের জাহাজ ছিল। যা দ্বারা আমি মা'বার যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। নাখোযার সঙ্গে তার সাথীসঙ্গীরা ছিল। তিনি আমাকেও দাওয়াত করলেন। আমি ওই দ্বীপে সত্তর দিন অবস্থান করলাম। সেখানে দুই নারীকে বিয়ে করি। দ্বীপটি এই পরিমাণ সবুজাভ যে, গাছের ডাল ভেঙে মাটি অথবা দেয়ালে গেঁথে দিলে পাতা বেরিয়ে আসে এবং গাছ হয়ে যায়। আনার গাছ এখানে বারো মাসই ফল দেয়। এরপর আমরা মহাল দ্বীপের দিকে চলে যাই।

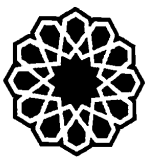

[১] স্ত্রীর চেয়েও এই বাঁদি ছিল বেশি সৌভাগ্যবান।

লঙ্কা

রাবনের দেশে প্রবেশ

এসব দ্বীপ থেকে মা'বারের দূরত্ব মাত্র তিন দিনের। কিন্তু আমরা নয় দিন সফর করতে থাকলাম। নবম দিন সায়লানের[১] দ্বীপে পৌঁছলাম। স্মরণদ্বীপের পাহাড় যার চূড়া ছিল আকাশছোঁয়া সেখান থেকে দেখা যাচ্ছিল। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল ধোঁয়ার স্তম্ভ। যখন আমরা পৌঁছলাম জাহাজের নাবিকেরা বলল, এই বন্দরটি এমন কোনো রাজার নয় যেখানে ব্যবসায়ীরা নির্বিঘ্নে যেতে পারে। বরং এই শহরটি ডাকাতদের সর্দারের। তার জাহাজ সমুদ্রে দস্যুপনায় লিপ্ত থাকে। এজন্য আমরা সেখানে জাহাজে নোঙর ফেলতে ভয় করলাম। কিন্তু প্রবল বেগে বাতাস বইছিল। জাহাজ ডুবে যাওয়ার মতো উপক্রম হলো। আমি নাখোযাকে বললাম, আমাকে তীরে নামিয়ে দিন। আমি ওই রাজার কাছ থেকে আপনার জন্য নিরাপত্তা নিয়ে আসছি। তিনি আমাকে তীরে নামিয়ে দিলেন। আমার কাছে বিধর্মীরা এসে বলল, তুমি কে? আমি বললাম, মা'বারের বাদশাহর বন্ধু। রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এসেছি। আর এই জাহাজ রাজার জন্য উপঢৌকনে ভরা। তারা গিয়ে রাজাকে খবর দিল। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি বাতালা[২] শহরে গেলাম তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সেটা এই রাজার রাজধানী। একটি ছোট শহর। এর চারপাশে কাঠের প্রাচীর। দুর্গও কাঠের নির্মিত। সমুদ্রের তীরে দারুচিনির কাঠে ভরা। এই কাঠ সমুদ্রে ভেসে ভেসে আসে। মা'বার ও মালাবারের লোকেরা এই কাঠ ফ্রিতে পায়। তবে রাজাকে কাপড় ইত্যাদি উপঢৌকন হিসেবে দিয়ে থাকে। মা'বার ও এই দেশের মধ্যখানে মাত্র এক দিনের এবং এক রাতের পথ। এই দেশে বকম কাঠ অনেক বেশি হয়। হিন্দি উদ, যাকে কালগি বলা হয়, সেটাও অনেক হয়।

আমার ওপর সায়লান রাজার যত অনুগ্রহ ও দান

যখন আমি রাজার কাছে গেলাম তখন তিনি আমার সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলেন। নিজের পাশে আমাকে বসালেন। আমার সঙ্গে কোমল ও মোলায়েম ভাষায়

---

[১] সায়লুন।

[২] এর নাম পাতলাম।

কথা বললেন। আর এটাও বললেন, আপনার সাথীসঙ্গীরা যেন নির্ভয়ে জাহাজ থেকে অবতরণ করে। তারা যতক্ষণ এখানে থাকবে আমি তাদের প্রতি মেহেরবান থাকবা। কেননা মা'বারের বাদশাহর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব রয়েছে। আমি তার কাছে তিন দিন থাকলাম। প্রতিদিন আগের দিনের চেয়ে বেশি সম্মান ও আপ্যায়ন করা হতো। তিনি ফারসি ভাষা বুঝতেন। তাকে যখন সব দেশ ও শহরের অবস্থার কথা জানালাম তিনি খুব খুশি হলেন। একদিন আমি তার কাছে গিয়ে দেখলাম মোতির স্তূপ পড়ে আছে। কেননা এখানকার লোকেরা সমুদ্রে ডুব দিয়ে মোতি বের করে আনে। সেখান থেকে ভালো ভালো মোতিগুলো আলাদা করা হচ্ছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি কোথাও মোতি বের করতে দেখেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। কায়স ও কিশ দ্বীপে দেখেছি। এর গভর্নর ইবনুস সাওয়ায়ি। তিনি বললেন, আমিও এটা শুনেছি।

পরে তিনি কয়েকটি দানা উঠালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, সেখানে কি এ ধরনের বড় বড় মোতি হয়? আমি বললাম, না, ছোট ছোট হয়। এটা শুনে অনেক খুশি হলেন এবং বললেন, আমি আপনাকে এই দানাগুলো উপহার হিসেবে দিলাম। আমাকে বললেন, কোনো লজ্জা পাবেন না। আপনার যা কিছু প্রয়োজন আমাকে বলবেন। আমি বললাম, আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে কদম শরিফ যিয়ারত করব। সায়লানে আদম আ.-কে 'বাওয়া' ও হাওয়া আ.-কে 'মামা' বলে। রাজা বললেন, আমি আপনার সঙ্গে লোক দিয়ে দেব, সে আপনাকে ওই জায়গায় পৌছে দেবে। এটা কঠিন কোনো কাজ নয়। আমি বললাম, যে জাহাজে করে আমি এসেছি সেটা মা'বারের রাস্তায় যেন কোনো বাধার মুখে না পড়ে এবং যখন ফিরে আসব তখন যেন আপনার জাহাজে করে পৌছে দেওয়া হয়। তিনি বললেন, আচ্ছা।

যখন আমি জাহাজের লোকদের এই কথা বললাম তখন তারা বললেন, আপনাকে ছাড়া আমরা যাব না। আপনি যদি এক বছরেও ফিরে আসেন আমরা এখানে অপেক্ষা করব। আমি রাজাকে বিষয়টি বললাম। তিনি বললেন, আপনি ফিরে না আসা পর্যন্ত জাহাজ এখানেই থাকবে এবং জাহাজের সব লোক আমাদের মেহমান। রাজা আমার সফরের জন্য একটি ডুলির ব্যবস্থা করলেন এবং আমার সঙ্গে একটি ক্রীতদাস দিলেন। সে আমাকে ডুলিতে তুলে নিয়ে যেত। আর আমার সঙ্গে চার সাধককে দিলেন, যারা প্রতি বছর কদম মোবারক যিয়ারত করতে যান। তিনজন ব্রাহ্মণ,

দশজন শ্রমিক এবং আরো ১৫ জনকে আমার আসবাবপত্র বহনের জন্য সঙ্গে দিলেন। এই রাস্তায় পানির প্রচুর উৎস রয়েছে। প্রথম দিন আমরা একটি নদীতে পৌঁছি এবং বাঁশের তৈরি ভেলায় করে নদী পার হই। সেখান থেকে আমরা মানারমান্দালি পৌঁছি। এটি একটি ভালো শহর। সেই রাজার নিয়ন্ত্রিত এলাকার সীমানায় পড়েছে এটি। সেখানের রাজার পক্ষ থেকে নিয়োজিত কর্মীরা আমাদের দাওয়াত করেন। একটি বাছুর যাড় জবাই করা হলো। এটি জঙ্গল থেকে জীবিত ধরে আনা হয়েছিল। খাবারে ভাত, ঘি, মাছ, মুরগি ও দুধের ব্যবস্থাও ছিল। এই শহরে একজন খুরাসানি ছাড়া কোনো মুসলিম ছিল না। তিনিও মূলত অসুস্থ হওয়ার কারণে রাস্তায় রয়ে গিয়েছিলেন। তিনিও আমাদের সঙ্গী হলেন।

একজন মর্দে মুমিনের অবদান

এরপর আমরা সালাদাত বন্দরে পৌঁছি। এরপর একটি জঙ্গলে আসি, যেখানে অনেক পানি ছিল। সেখানে হাতিও ছিল। কিন্তু এই হাতি বিদেশি এবং যিয়ারতকারীদের কোনো কষ্ট দেয় না। এসবই শায়খ আবদুল্লাহ বিন খাফিফের বরকত। তিনি মূলত প্রথম এই রাস্তা আবিষ্কার করেন। অন্যথায় সেখানকার হিন্দুরা এই রাস্তায় মুসলমানদের যেতে বাধা দিত। তাদের সঙ্গে খাবার খেতো না, তাদের কাছে কোনো কিছু বিক্রি করত না। এই শায়খের কারণেই মুসলমানদের সম্মান করত। নিজেদের ঘরে তাদের থাকতে দিত। নিজেদের সঙ্গে খাবার খেতে দিত। তাদের কাছে নিজের পরিবার-পরিজনকে স্বস্তির সঙ্গে রেখে যেত। আজও শায়খ আবদুল্লাহ খাফিফকে অত্যন্ত সম্মান করে এবং তাকে 'বড় শায়খ' বলে।

কানকার, ইয়াকুত পাথরের প্রান্তর, বিস্ময়কর সব অভিজ্ঞতা

এরপর আমরা কানকার শহরে পৌঁছি। এটি সালানের সবচেয়ে বড় রাজার রাজধানী। এটি দুটি পাহাড়ের মাঝখানে একটি নদীর তীরে অবস্থিত। নদীটির নাম 'ইয়াকুত'। কেননা এতে ইয়াকুত পাথর পাওয়া যায়।

শহরের বাইরে শায়খ উসমান সিরাজির মসজিদ রয়েছে। এই শহরের রাজা এবং এখানকার লোকেরা তার কবর যিয়ারত করতে আসে এবং তাকে অনেক সম্মান করে। এই শহরের রাজাকে 'লুনার' বলা হয়। তার কাছে একটি সাদা হাতি আছে। আমি এটা ছাড়া দুনিয়ার কোথাও সাদা হাতি

দেখিনি। উৎসবের দিন রাজা এতে চড়েন। এর মাথার ওপর বড় বড় ইয়াকুতের হার বাঁধা আছে। ওই ইয়াকুত যাকে বাহারমান বলা হয় তা এই শহরে হয়। কোনো কোনো ইয়াকুত নদী থেকে বের হয়, আবার কোনো কোনোটা মাটি খুঁড়ে বের করতে হয়। সায়লান দ্বীপে সবখানে ইয়াকুত পাওয়া যায়। যারা ইয়াকুত খুঁজে তারা ভূমির একটি অংশ কিনে এবং সেখানে মাটি খুঁড়ে তা বের করে। যেখানে সাদা পাথর বের হয় সেখানে ইয়াকুত পাওয়া যায়। সেই সাদা পাথর তারা পাথর খোদাইকারীদের কাছে নিয়ে যায়। তারা পাথরের ভেতর থেকে ইয়াকুত বের করে। কোনো কোনো ইয়াকুত লাল, কোনোটি হলুদ এবং কোনোটি সবুজ হয়ে থাকে। নীল ইয়াকুতকে 'নিলাম' বলা হয়। যে ইয়াকুত দামে একশ ফানাম থেকে বেশি হয় তা রাজার হয়ে যায়। রাজা এর দাম পরিশোধ করে কিনে নেন। আর এর চেয়ে কম মূল্যের ইয়াকুত মালিক তার নিজের কাছে রেখে দিতে পারে। একশ ফানাম সোনার ছয় দিনারের সমান।

সায়লানে নারীরা রং-বেরঙের হার পরে। তারা হাত ও পায়ে নূপুর পরে। রাজার দাসীরা ইয়াকুতের জালি মাথায় পরে। সাদা হাতির মাথায় সাতটি ইয়াকুত প্রতিটি মুরগির ডিমের বরাবর। রাজা ইরমি শাকরাওয়ারতির কাছে ইয়াকুতের একটি পেয়ালা দেখলাম, যা হাতের তালু বরাবর। এতে উদের তেল রাখা ছিল। আমি বিস্ময় বোধ করলাম। তিনি বললেন, আমার কাছে এর চেয়েও বড় ইয়াকুত আছে।

কানকার থেকে আমরা একটি গুহায় পৌঁছলাম। এটাকে উস্তাদ মাহমুদ লুরির গুহা বলা হয়। এই ব্যক্তি আল্লাহর ওলি ছিলেন। তিনি এই গুহা পাহাড়ের চূড়ায় একটি ঝরনার কাছে বানিয়েছেন। সেখান থেকে আমরা একটি নদীর কাছে পৌঁছি। এটাকে বানরের নদী বলা হয়। এই পাহাড়ে বানর অনেক বেশি হয়ে থাকে। তাদের গায়ের রং কালো। এর লেজগুলো বড় বড় হয়ে থাকে। শায়খ উসমান, তার ছেলে এবং অন্যরাও জানিয়েছেন, একটি বানর আগে আগে থাকে এবং তাকে সবাই বাদশাহর মতো মান্য করে।

পরে আমরা খায়রজান নদীর তীরে পৌঁছি। পরে আমরা একটি জায়গায় পৌঁছি যাকে 'বৃদ্ধের ঘর' বলা হয়। এর সামনে আর বসতি নেই। এর কাছেই বাবা তাহেরের একটি গুহা আছে, যিনি ওলি ছিলেন।

শরণ দ্বীপের পাহাড়
উড়ন্ত জোঁক, গুহা, কদম শরিফ

সামনে সাবিকের গুহা। সাবিক ছিলেন এক রাজা। তিনি দুনিয়াবিরাগী হয়ে এই গুহায় চলে এসেছিলেন। এখানে আমরা উড়তে পারে এমন জোঁক দেখেছি। এগুলো পানির কাছে যে গাছ বা ঘাস থাকে সেগুলোতে বসে। যখন কোনো মানুষ কাছে যায় তখন লাফিয়ে এসে চিমটি কাটে। যেখানে চিমটি কাটে সেখান থেকে অনেক রক্ত বের হয়। লোকজন লেবু প্রস্তুত রাখে। জোঁকে চিমটি দিয়ে ধরলে লেবুর রস দেয়। এতে জোঁক নিচে পড়ে যায়। এরপর আমরা হাফত গুহার দিকে গেলাম। পরে আকাবা ইস্কান্দরিয়ার দিকে, এরপর ইস্পাহানির দিকে, পরে ঝরনার দিকে গেলাম। সেখানে অনাবাদ একটি দুর্গ আছে। এর নিচ দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত হয়েছে, যাকে গুতাহগাহ ইরফান বলা হয়। সেখানে একটি গর্ত আছে, যাকে গারে নারেঞ্জ বলা হয়। অন্য আরেকটি গর্ত আছে, এটাকে রাজার গর্ত বলা হয়। এর পাশ দিয়ে পাহাড়ের দরজা রয়েছে। যাকে 'জাবালে শরণ দ্বীপ' বা শরণ দ্বীপের পাহাড় বলা হয়। এই পাহাড়টি দুনিয়ার বড় পাহাড়গুলোর একটি।[১] আমরা এটা সমুদ্র থেকে দেখেছি। অথচ এটি উপকূল থেকে নয় মঞ্জিল দূরত্বে। যখন আমরা এর ওপরে আরোহণ করলাম তখন নিচে মেঘ ভাসতে দেখা গেল। এই পাহাড়ে এমন অনেক গাছ আছে যার পাতা কখনো ঝরে পড়ে না এবং নানা রং ধারণ করে। লাল গোলাপ ফুল হাতের তালুর বরাবর হয়। লোকদের ধারণা, এই ফুলের মধ্যে আল্লাহ ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম কুদরতিভাবে লেখা রয়েছে।

এই পাহাড় থেকে কদম মুবারকে যাওয়ার দুটি রাস্তা। একটিকে বাবার রাস্তা বলা হয়, অন্যটিকে মামার রাস্তা। অর্থাৎ আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালামের রাস্তা। মামার রাস্তা সহজ। কিন্তু বাবার রাস্তা অনেক দুর্গম। এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া অনেক কঠিন। পাহাড়ে সিঁড়ি বানিয়ে রাখা হয়েছে, যা দিয়ে ওপরে আরোহণ করা হয়। এসব সিঁড়িতে লোহার রড গেঁথে শিকল ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে আগন্তুকরা সহজেই ওপরে চড়তে পারে। এ ধরনের দশটি শিকল রয়েছে। দশম শিকল থেকে নিয়ে খিযিরের গুহা পর্যন্ত

---

[১] উচ্চতা ৭৪২০ ফিট।

দূরত্ব সাত মাইল। এটি একটি খোলা ময়দানে অবস্থিত। এর পাশে একটি পানির ঝরনা রয়েছে। এটিও খিযিরের নামে পরিচিত। খিযিরের গুহায় এসে যিয়ারতকারীদের সঙ্গে যা কিছু থাকে তা সেখানে রেখে যায়। এরপর আরো দুই মাইল পথ পাড়ি দিয়ে কদম মুবারকের কাছে পৌঁছে। এই কদম[১] (পা) মুবারক হলো বাবা আদম আলাইহি সালামের পায়ের চিহ্ন, যা কালো একটি পাথরের ওপর। সমতল থেকে উঁচুতে ময়দানে পড়ে আছে পাথরটি। কদম মুবারক পাথরের ভেতরে দেবে গিয়েছিল। এর কারণে পায়ের ছাপ বসে যায়। এর দৈর্ঘ এগারো হাত। এখানে চীনের লোকজন আসে। তারা ওই পাথর থেকে এক আঙুল পরিমাণ ভেঙে নিয়ে গেছে। সেটা জায়তুন শহরে একটি মন্দিরে নিয়ে রেখেছে। হিন্দু যিয়ারতকারীরা সেখানে সোনা, ইয়াকুত ও মোতি দিয়ে ভরে যায়। এজন্য ফকির যখন খিযির গুহায় পৌঁছে দ্রুতবেগে সবার আগে পৌঁছার চেষ্টা করে, যাতে যা কিছু পায় নিতে পারে। আমরা যখন আসি দেখলাম অল্প কিছু সোনা ও গয়নাগাটি পড়ে আছে। আমরা এগুলো আমাদের নিরাপত্তারক্ষীদের দিয়ে দিলাম। নিয়ম হলো, যিয়ারতকারীরা খিযির গুহায় তিন দিন অবস্থান করবে। এই তিন দিন নিয়মিত সকাল-সন্ধ্যা কদম মুবারক যিয়ারত করতে আসবে। আমরাও এমনটাই করি।

তিন দিন পর আমরা মা হাওয়া আলাইহিস সালামের রাস্তায় ফিরে আসি। রাস্তার গ্রাম ও কেন্দ্রগুলো পাহাড়ের ওপরে। পাহাড়ের গোড়ায় গাছ লাগানো। এটি এমন গাছ যার পাতা ঝরে না। এসব গাছের পাতার ব্যাপারে তান্ত্রিকরা অনেক মিথ্যা বর্ণনা দেয়। বলে থাকে, যারা এই পাতা খাবে তারা জোয়ান হয়ে যাবে। চাই যত বৃদ্ধই হোক না কেন। এই পাহাড়ের নিচে ওই নদী যেখানে ইয়াকুত পাওয়া যায়। এর পানি সম্পূর্ণ নীল ও স্বচ্ছ।

সেখান থেকে আমরা দুই দিনে দিনওয়ারে পৌঁছি। এটি অনেক বড় শহর। সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। এখানে ব্যবসায়ীদের আনাগোনা বেশি। এখানকার মন্দিরে দিনওয়ার নামে মূর্তি রয়েছে। এখানে প্রায় তিন হাজার ব্রাহ্মণ ও যোগী থাকে। আর পাঁচশর মতো হিন্দু মেয়ে—যারা তাদের সামনে নাচে-গায়। এই শহরের সব আয় মন্দিরের জন্য বরাদ্দ। মূর্তি স্বর্ণের তৈরি।

---

[১] এই পবিত্র পা বুদ্ধদের কাছে মহাত্মা বুদ্ধের, হিন্দুদের কাছে শিয়োজির। আর মুসলিমদের মতে, এটি হযরত আদম আলাইহিস সালামের।

মানুষের মতো আকৃতি। এর চোখের স্থানে দুটি বড় বড় ইয়াকুত লাগিয়ে রাখা হয়েছে। বলা হয়ে থাকে, রাতে ফানুসের মতো আলো দেয়। এরপর আমরা কালি (গালি) শহরে পৌঁছি। এটি একটি ছোট শহর। দিনওয়ার থেকে ছয় ফরসং দূরত্বে। এখানে নাখোদা ইবরাহিম নামে এক মুসলিম থাকেন। তিনি আমাদের মেহমানদারি করান। এরপর আমরা কলম্বোর দিকে রওনা করি।[১] শরণ দ্বীপে এই শহর সবচেয়ে বড় ও সুদর্শন। এর রাজার উযির, যিনি নৌবাহিনীর প্রধান, যাকে জালিসতি বলা হয়, তিনি এখানে থাকেন। তার সঙ্গে পাঁচশ হাবশি থাকে। এখান থেকে রওনা করে তিন দিন পর আমরা বাতালায় পৌঁছি। এখানকার রাজা যার কথা আগে আলোচনা করে এসেছি, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। নাখোযা ইবরাহিম আমার অপেক্ষায় ছিলেন।

মা'বারের দিকে রওনা
সেখানকার বাদশাহ, অধিবাসী ও জলদস্যুদের কবলে পড়া

পরে আমরা মা'বারের[২] দিকে চললাম। বাতাস প্রবল বেগে বইছিল। জাহাজে পানি ওঠা শুরু হলো। আমাদের জাহাজ পাথরের মধ্যে গিয়ে লাগল। পাথরের সঙ্গে ধাক্কায় ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হলো। পরে আমরা ছোট একটি উপসাগরে চলে যাই। জাহাজ ডুবতে লাগল। মৃত্যুকে আমরা চোখের সামনে দেখতে পেলাম। কেউ কেউ নিজের কাছে থাকা সবকিছু ফেলে দিল। কেউ কেউ অসিয়ত করতে লাগল।

আমরা জাহাজের মাস্তুল কেটে ফেলে দিই। জাহাজের নাবিকরা কাঠের একটি নৌকা বানালেন। স্থলভাগ সেখান থেকে দুই ফারসাখ দূরে ছিল। আমিও নৌকায় উঠার ইচ্ছা করলাম। দুই বাঁদি এবং আমার এক সঙ্গী ছিল। তারা বলল, আমাদেরকে আপনি কোথায় রেখে যাচ্ছেন? আমি বললাম, তুমি এবং বাঁদিরা চলে যাও। আমি জাহাজেই অবস্থান করব। বাঁদি বলল, আমি অনেক সাঁতার জানি। নৌকার সঙ্গে একটি রশিতে ঝুলে যাব এবং সাঁতার কেটে চলে যাব। মুহাম্মাদ বিন ফারহান, মিশরীয় এক ব্যক্তি এবং এক বাঁদি

---

[১] বর্তমানে কলম্বো শ্রীলঙ্কার রাজধানী।

[২] মা'বার দ্বারা উদ্দেশ্য ওই উপকূল যা ক্যারোমন্ডেল ও কর্নাটক নামে প্রসিদ্ধ। মালাবার শেষ হয়ে রা'স কামারিতে, পরে মা'বার শুরু হয়েছে, যার সীমানা তিলুর পর্যন্ত।–রইস আহমাদ জাফরি।

নৌকায় চড়ে বসল। অন্য বাঁদি সাঁতরে এলো। জাহাজের লোকেরাও রশি বেঁধে নিল এবং তারাও সাঁতরাতে থাকল। আমি মূল্যবান আসবাবপত্র, মোতি ও আম্বার ইত্যাদি তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম। তারা সবাই ভালোমতো তীরে পৌঁছে গেল। কেননা বাতাস অনকূল ছিল। আর আমি জাহাজেই রইলাম। জাহাজের মালিকও অনেক কষ্টে তীরে পৌঁছে গেছেন। জাহাজের নাবিকরা আরেকটি নৌকা বানানো শুরু করল। এটি বানানো শেষ করতে করতে রাত হয়ে যায়। এর মধ্যেই জাহাজে পানি উঠে গেল। আমি জাহাজের পেছনের অংশে গিয়ে বসলাম এবং সকাল পর্যন্ত সেখানে রইলাম।

সকালে কয়েকজন হিন্দু লোক এলো একটি নৌকা নিয়ে। তারা আমাকে তীরে পৌঁছে দিল। আমি তাদেরকে বললাম, আপনাদের বাদশাহর আত্মীয়। তারা বাদশাহর প্রজা ছিল। এজন্য তাৎক্ষণিকভাবে আমার ব্যাপারে বাদশাহকে লিখে পাঠাল। সেখানে আমরা তিন দিন ছিলাম। তিন দিন পর মা'বারের বাদশাহর পক্ষ থেকে কামরুদ্দিন নামে এক আমির, কয়েকটি বাহন এবং কয়েকজন পদাতিক সেনা নিয়ে এলেন। সঙ্গে দশটি ঘোড়া এবং একটি ডুলি (পালকি বিশেষ) নিয়ে এলেন। আমি, আমার সঙ্গী, জাহাজের মালিক এবং এক বাঁদি বাহনে চড়ে বসলাম। আরেক বাঁদিকে ডুলে বসালাম। ওইদিন আমরা হারকাতু দুর্গে পৌঁছি। রাত সেখানেই কাটাই। বাঁদি, ক্রীতদাস ও সঙ্গী থেকে আমি সেখানেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। পরদিন আমরা বাদশাহর ক্যাম্পে পৌঁছি।

মা'বারের সুলতানরা এবং তাদের শান-শওকত

মা'বারের বাদশাহ গিয়াসুদ্দিন দামগানি। তিনি প্রথমে মালিক মুজির বিন আবি রেজার বাহনের চাকর ছিলেন। তিনি সুলতান মুহাম্মাদ তুঘলকের অন্যতম খাদেম ছিলেন। এরপর সুলতান জালালুদ্দিনের ছেলে আমির হাজির চাকরি করেন। এরপর বাদশাহ হয়ে যান। প্রথমে তার নাম ছিল সিরাজুদ্দিন। বাদশাহ হওয়ার পর গিয়াসুদ্দিন উপাধি ধারণ করেন।

আমি যখন ক্যাম্পের কাছে পৌঁছি আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য এক নিরাপত্তারক্ষীকে পাঠালেন। তিনি কাঠের একটি ঘরে বসা ছিলেন। নিয়ম ছিল, বাদশাহর কাছে কেউ মোজা না পরে যেতে পারে না। আমার কাছে তখন মোজা ছিল না। এক হিন্দু লোক আমাকে মোজা দিলেন। অথচ

সেখানে অনেক মুসলিম উপস্থিত ছিলেন, কেউ দিলেন না। আমি হিন্দু লোকের চক্ষুলজ্জায় বিস্মিত হলাম। আমি বাদশাহর সামনে গেলাম। আমাকে বসার নির্দেশ দেওয়া হলো। কাজি হাজি সদরুয্যামান বাহাউদ্দিনকে ডেকে পাঠালেন। তার পাশে তিনটি তাঁবু আমার জন্য ব্যবস্থা করে দিলেন। বিছানা ও খাবার পাঠালেন।

মালদ্বীপে হামলার প্ররোচনা

আমি বাদশাহর কাছে গেলাম এবং তাকে মালদ্বীপে হামলা চালানোর প্ররোচনা দিলাম। তিনি হামলার ব্যাপারে পোক্ত ইচ্ছা পোষণ করেন। এর জন্য জাহাজও ব্যবস্থা করেন। সেখানকার রানির জন্য উপহার এবং আমির ও উযিরদের জন্য শাহি পোশাকও ব্যবস্থা করেন। রানির বোনের সঙ্গে বিয়ের জন্য আমাকে উকিল নিযুক্ত করেন। দ্বীপের গরিব-দুঃখীদের জন্য তিনটি জাহাজে করে সদকার পণ্য পাঠানোর নির্দেশ দেন। আমাকে বললেন, পাঁচ দিন পর আমরা ফিরে আসব। নৌ সেনাপতি সারলাক বললেন, (সাগর উত্তাল থাকায়) মালদ্বীপের দিকে আগামী তিন মাস পর্যন্ত সফর করা সম্ভব নয়।

বাদশাহ আমাকে বললেন, তুমি পাটানে চলে যাও। নির্ধারিত সময়ের পর রাজধানী মুতরায় ফিরে রওনা হওয়া যাবে। আমি তার কাছেই অবস্থান করলাম। ইতিমধ্যে আমার বাঁদি ও সঙ্গীরা এসে পৌঁছাল।

আশপাশেই বেলাল দেও নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অনেক বড় একজন রাজা। তার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা এক লাখের কাছাকাছি। তার সঙ্গে বিশ হাজার মুসলিমও ছিল। যাদের বেশির ভাগ চোর-ডাকাত ও পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাস। তিনি মা'বারে হামলা করলেন। এ সময় বাদশাহর কাছে মাত্র ছয় হাজার সেনা রয়েছে। যাদের মধ্যে অর্ধেক পেশাদার সেনা আর বাকিরা কোনো কাজের নয়। তাছাড়া তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো সরঞ্জামও ছিল না। কাবান শহরের বাইরে তুমুল লড়াই হয়। মা'বারের বাহিনী পরাজিত হয়। তারা রাজধানী মুতরায় ফিরে আসে। রাজা কাবান অবরোধ করেন। এই শহর অনেক বড় ও মজবুত ছিল। তিনি লাগাতার দশ মাস এটি অবরোধ করে রাখেন। দুর্গের লোকদের কাছে মাত্র চৌদ্দ দিনের খাবার অবশিষ্ট আছে।

রাজা বার্তা পাঠালেন, দুর্গ ছেড়ে দাও তাহলে তোমাদের নিরাপত্তা দেওয়া হবে। তারা বললেন, আমরা আগে বাদশাহকে এই খবর পৌঁছাই। রাজা বললেন, ঠিক আছে। তবে চৌদ্দ দিনের ভেতরেই অনুমতি আন। রাজা সুলতান গিয়াসুদ্দিনকে চিঠি লিখলেন। তিনি ওই চিঠি জুমার দিন সবাইকে পড়ে শোনালেন। এটা শুনে সবাই কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বললেন, আমরা আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। রাজা ওই শহর নিয়ে নিতে পারলে পরে আমাদের শহরে আসবে। গ্রেফতার হওয়ার চেয়ে তলোয়ারের ছায়ায় মরা শ্রেয়। বীর-বাহাদুর সবাই অগ্রগামী হলেন। তবে সংখ্যায় তারা তিন শয়ের কাছাকাছি। ডান পাশে সাইফুদ্দিন বাহাদুরকে দাঁড় করালেন। এই ব্যক্তি বড় আলেম, পরহেযগার ও বীর ছিলেন। বাম পাশে ছিলেন মালিক মুহাম্মাদ সালাহদার। আর সুলতান ছিলেন মধ্যখানে। সঙ্গে তার তিন হাজার সেনাও। বাকি তিন হাজারকে আগে-পিছে করে নিয়োজিত করা হয়। আসাদুদ্দিন কায়খসরু ফারসিকে সর্দার বানানো হয়। সূর্যাস্তের সময় সফর শুরু হয়। শত্রুরা সম্পূর্ণ বেখবর ছিল। তাদের ঘোড়া খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিল। আসাদুদ্দিন অতর্কিত হামলা করে বসেন। রাজা ভাবলেন, চোর এসেছে, এজন্য কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই বাইরে বের হয়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে বাদশাহ গিয়াসুদ্দিনও পৌঁছে গেলেন। রাজা চরমভাবে পরাজিত হলেন। ভাবলেন, ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে যাবেন। তার বয়স তখন আশি বছর। গিয়াসুদ্দিনের ভাতিজা নাসিরুদ্দিন তাকে ধরে ফেললেন। তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। কারণ তাকে চিনতে পারেননি। কিন্তু সঙ্গে থাকা এক ক্রীতদাস বললো, তিনিই রাজা। এজন্য নাসিরুদ্দিন তাকে গ্রেফতার করলেন এবং নিজের চাচার কাছে নিয়ে গেলেন। বাদশাহ বাহ্যত তাকে সম্মান করলেন। কর হিসেবে তার কাছ থেকে অনেক হাতি-ঘোড়া আদায় করলেন। তাকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে ওয়াদাও করেন। কিন্তু যখন তার কাছে আর কিছু রইল না তখন তাকে ধরে গলাকেটে হত্যা করলেন। তার চামড়া উঠিয়ে ভেতরে ভুসি ভরে তা মুতরার প্রাচীরে ঝুলিয়ে রাখেন। আমিও সেখানে তার চামড়া ঝুলে থাকতে দেখেছি।

সুলতান গিয়াসুদ্দিনের দুঃখজনক ইন্তেকাল

এবার আমি আসল উদ্দেশ্যের দিকে ফিরে যাই। আমি ক্যাম্প থেকে রওনা করি এবং পাতান[১] শহরে পৌঁছি। এটি একটি বড় শহর। এর বন্দরও

[১] কাবিরি নদীর তীরে একটি বড় বন্দর, যা পরবর্তী সময়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

বিস্ময়কর। এখানে কাঠের একটি দুর্গ বানানো রয়েছে। ওপরে ছাউনি দেওয়া। শত্রুদের ভয় থাকলে বন্দরের কাছাকাছি থাকা জাহাজের লোকেরা এই দুর্গে প্রবেশ করে এবং শত্রুদের থেকে নির্বিঘ্ন হয়ে যায়। এখানে পাথরের তৈরি একটি মসজিদও রয়েছে। আঙুর ও আনার অনেক বেশি হয়। এখানে সালেহ মুহাম্মাদ নিশাপুরির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি প্রবল ভাবাবেগসম্পন্ন একজন সাধক। তার চুল লম্বা লম্বা, যা কাঁধ পেরিয়ে যায়। তার কাছে সাতটি শেয়াল ছিল, যারা ফকিরদের সঙ্গে খাবার খায়। তাদের সঙ্গে বসে থাকে। তার দরবারে ২০ জন ফকির রয়েছে। তাদের মধ্য থেকে একজনের কাছে একটি হরিণ রয়েছে, যা সিংহের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু সিংহ কিছুই করে না। আমি পাতান শহরে অবস্থান করি। সুলতান গিয়াসুদ্দিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমি পাতানে এসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। আমি তার জন্য কিছু উপহার পেশ করলাম। তিনি নৌবাহিনীর প্রধান খাজা সরওয়ারকে ডেকে পাঠালেন। আর বললেন, যে জাহাজ মালদ্বীপে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল তা যেন আর অন্য কোনো কাজে লাগানো না হয়। তিনি আমার উপঢৌকনের মূল্য পরিশোধ করতে চাইলেন। আমি নিতে অস্বীকৃতি জানালাম। পরবর্তী সময়ে এই অস্বীকৃতির কারণে পস্তাতে হয়েছে। কারণ সুলতান মারা যান এবং আমি কিছুই পাইনি।

মা'বারের নতুন বাদশাহ সুলতান নাসিরুদ্দিন

নাসিরুদ্দিন ছিলেন বাদশাহর ভাতিজা। তিনিই স্থলাভিষিক্ত হলেন। কেননা বাদশাহর কোনো ছেলে জীবিত ছিলেন না। নাসিরুদ্দিন দিল্লিতে বাদশাহর চাকুরে ছিলেন। যখন তার চাচা মা'বারের বাদশাহ হলেন তখন তিনি দিল্লি থেকে ফকিরের বেশ ধারণ করে পালিয়ে আসেন। গিয়াসুদ্দিন মারা যাওয়ার পর তিনি বাদশাহ হবেন এটা তার কপালে লেখা ছিল। সবাই তার বাইআত গ্রহণ করল। কবিরা তার শানে কবিতা পাঠ করলেন। তিনি সবাইকে বড় বড় উপহার দিলেন।

এই ব্যক্তি অনেক জ্ঞানী ও বাহাদুর ছিলেন। আমার ক্ষেত্রে নির্দেশ দিলেন, যে জাহাজ তার চাচা মালদ্বীপে পাঠানোর জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন, তা যেন আমার সঙ্গে পাঠানো হয়। এ সময় আমি ওই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ি যা সেই এলাকায় মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি বুঝে গেলাম, আর

বুঝি বাঁচব না। তবে আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে এটা ঢেলে দেন যে, আধা সের তেঁতুল গুলে পান করি। এতে তিন দিন পর্যন্ত আমার পাতলা পায়খানা হতে থাকে। এভাবে আমি সুস্থ হয়ে যাই। আমি মাতরা[১] ছাড়তে চেয়েছিলাম। এজন্য বাদশাহর অনুমতি প্রার্থনা করি। তিনি বললেন, আপনার মালদ্বীপে যেতে মাত্র এক মাস বাকি। আপনি এখানেই অবস্থান করুন যাতে আমি আখুন্দে আলমের (তার চাচা) নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে পারি। আর তিনি আপনার সঙ্গে যাদের পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন তাদের যেন পাঠাতে পারি। আমি বললাম, আর অবস্থান করতে পারব না। পরে তিনি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিলেন, আমি যে জাহাজে যেতে চাই সেটা যেন তারা ব্যবস্থা করে দেন। আমি দেখলাম, ইয়েমেনে যাওয়ার জন্য আটটি জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। আমি একটি জাহাজে চড়ে বসলাম। রাস্তায় আমরা চারটি জাহাজ দেখতে পাই। এগুলোর মধ্যে কিছুটা প্রতিযোগিতা হয়। আমরা কুলিমে পৌঁছি। তখনো আমার অসুস্থতা কিছুটা বাকি ছিল। এখানে তিন মাস অবস্থান করি।

জলদস্যুদের হামলা, সবকিছু লুট

পরে একটি জাহাজে চড়ে আমি সুলতান জামালুদ্দিন হানুরের দিকে চললাম। হানুর ও ফাকনুরের মধ্যখানে হিন্দুরা আমাদের ওপর হামলা করে বসল। তাদের কাছে বারোটি জঙ্গি জাহাজ ছিল। তুমুল লড়াই হয়। শেষ পর্যন্ত আমরা পরাজিত হই। যা কিছু আমার কাছে ছিল এবং বিভিন্ন সময় যা কিছু জমা করেছিলাম সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়। মোতি ও ইয়াকুত যা সায়লানের রাজা দিয়েছিলেন; কাপড় ও বরকতময় যেসব জিনিস আল্লাহর ওলিরা বিভিন্ন সময় দিয়েছেন, কোনো কিছুই রেখে যায়নি। আমার শরীরে মাত্র একটি পায়জামা রয়ে যায়। একইভাবে জাহাজের সবার জিনিসপত্র লুট করা হয়। লুটপাট শেষে আমাদেরকে তীরে ফেলে যায়।

আমি কালিকোটে ফিরে এলাম এবং একটি মসজিদে প্রবেশ করলাম। এক ফকিহ আমার জন্য কাপড় পাঠালেন। কাজি পাগড়ি পাঠালেন। এক ব্যবসায়ী কিছু কাপড়-চোপড় পাঠান। এখানে এসে আমি জানতে পারি, উযির জামালুদ্দিনের ইন্তেকালের পর উযির আবদুল্লাহ রানি খাদিজাকে বিয়ে

[১] এটি মাদরাজের শহর মাদুরা।

করেন। আর যে নারীকে আমি গর্ভবতী অবস্থায় রেখে গিয়েছিলাম তার ছেলেসন্তান হয়েছে। মালদ্বীপে যাওয়ার ব্যাপারে মন চাইল। কিন্তু তখন তখন আবদুল্লাহর শত্রুতার কথা মনে পড়ে গেল। আমি কুরআনে কারিম খুলে ভাগ্য পরীক্ষা করলাম। সেখানে খুলতেই এই আয়াত বের হলো,

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا

'তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না।'[১] আমি ইতিবাচক দেখে ছুটে চললাম।

আরেক দফা মালদ্বীপে, নবজাতক ছেলে

দশ দিন পর আমি মালদ্বীপে পৌঁছি এবং কানলুস দ্বীপে নামি। এর গভর্নর ছিলেন আবদুল আজিজ। তিনি আমাকে অনেক খাতির-যত্ন করেন। তিনি আমার মেহমানদারি করেন এবং আমার সঙ্গে একটি নৌকা দেন। এরপর আমি হায়লি দ্বীপে পৌঁছি। এই দ্বীপে রানি এবং তার বোন ঘোরাফেরার জন্য আসতেন। জাহাজে বসে সমুদ্রে অবকাশ যাপন করতেন। এই সময় উযির ও আমিররা রানির জন্য উপহার পাঠাতেন। এখানেই অবস্থান করছিলেন রানির বোন, তার স্বামী মুহাম্মাদ বিন জামালুদ্দিন খতিব এবং তার মা, যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল। খতিব আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এলেন এবং খাবারও নিয়ে এলেন। এক আমির উযির আবদুল্লাহকে আমার আসার বার্তা পৌঁছালেন। তিনি দ্বীপে প্রবেশ করায় আমার ওপর জরিমানা করলেন। আর আমার ছেলেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমি ভাবলাম, তাকে (বাচ্চা) এখানে থাকাই উত্তম হবে। আমি বাচ্চাটি তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম। পরে আমি সেখান থেকে চলে আসি। তেতাল্লিশ দিন পর্যন্ত জাহাজে করে চলে বাংলায় পৌঁছি।

---

[১] সূরা হামিম সিজদা : ৩০

বাংলায় সফর

বাংলার শহর, লোকজন, সাধারণ অবস্থা এবং নিত্যপণ্যের স্বল্পমূল্য

বাংলা অনেক বিস্তৃত একটি দেশ। এখানে চাল অনেক উৎপন্ন হয়। আর জিনিসপত্র এত সস্তা আমি দুনিয়ার কোথাও দেখিনি। এক দিনার দিয়ে ২৫ রিতিল[১] চাল পাওয়া যায়। অথচ সেই বছর চালের দাম বেশি ছিল।

অসম্ভব কম দাম, আমি একটি বাঁদি কিনি

দুধ দেয় এমন মহিষের দাম মাত্র তিন মুদ্রা। এখানে গরু হয় না। বড় বড় মুরগি এক দিরহামে পাওয়া যায় আটটি। এক দিরহামে কবুতরের বাচ্চা পাওয়া যায় ১৫টি। মোটাতাজা ভেড়া পাওয়া যায় দুই দিরহামে। এক রিতিল চিনি চার দিরহাম। এক রিতিল গোলাব আট দিরহাম। এক রিতিল ঘি চার দিরহাম। মিষ্টি তেলের রিতিল দুই দিরহাম। ত্রিশ গজ লম্বা তুলার একটি কাপড়ের দাম দুই দিনার। সুদর্শন বাঁদি পাওয়া যায় একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে। এই দাম দিয়ে আমি আশুরা নামে এক বাঁদি ক্রয় করি। সে অত্যন্ত সুদর্শন ছিল। আমার সঙ্গী লুলু নামে এক ক্রীতদাস কিনে দুই দিনার দিয়ে।

বাংলার প্রথম শহর চাটগামে প্রবেশ

বাংলার প্রথম শহর যেখানে আমরা প্রবেশ করি সেটা হলো সুগাওয়া।[২] এটি একটি বড় শহর, সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। এখানে গঙ্গা ও যমুনা নদী মিলিত হয়েছে। এই দুটি নদী মিলিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। এখানকার বন্দরে অনেক জাহাজ ভিড়ে। এটা নিয়ে এখানকার লোকেরা লক্ষ্ণৌর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। বাংলার বাদশাহ ফখরুদ্দিন। তিনি ফখর নামে প্রসিদ্ধ। বাদশাহ অনেক জ্ঞানী-গুণী। বিদেশি, সাধক ও সুফিদের অনেক ভালোবাসেন। যখন আমি চাটগামে পৌঁছি সেখানকার বাদশাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ

---

[১] রিতিল দ্বারা উদ্দেশ্য মণ। কারো কারো মতে সাড়ে বারো সের সমপরিমাণ। আবার কেউ কেউ বলে সাড়ে চৌদ্দশ সের সমপরিমাণ।

[২] হুগলি নদীর তীরে একটি বন্দরনগরী, যাকে চাটগাম বলা হয়।

করিনি। কেননা এই বাদশাহ দিল্লির সঙ্গে লড়াই করছিলেন। এজন্য তার সঙ্গে সাক্ষাতের পরিণতি ভালো হবে বলে মনে হলো না।[১]

কামরূপ ও সেখানকার বৈশিষ্ট্য

চাটগাম থেকে আমি কামরাদ[২] পাহাড়ের দিকে রওনা করি। এই দেশ চাটগাম থেকে এক মাসের পথ। এটি অনেক বিস্তৃত পাহাড়ি অঞ্চল। চীন ও তিব্বতের সঙ্গে সংযুক্ত। এই দেশের অধিবাসীরা আকৃতিতে তুর্কিদের মতো। এমন জোরালো সেবাদানকারী সম্ভবত আর কোথাও নেই। এখানকার একজন ক্রীতদাস অন্য এলাকার ক্রীতদাসদের চেয়ে অনেক বেশি কাজে আসে। এখানকার জাদুগিররাও বিখ্যাত।

কারামাতের অধিকারী বুযুর্গ শায়খ জালালুদ্দিন তাবরেজি

আমার এখানে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল শায়খ জালালুদ্দিন তাবরেজির সঙ্গে সাক্ষাৎ। তিনি আল্লাহর ওলি হিসেবে বিখ্যাত। এই শায়খ সমকালীন কুতুব ছিলেন। তার অনেক কারামতের কথা প্রসিদ্ধ। তার বয়সও অনেক বেশি। তিনি বলেন, আমি খলিফা মুস্তাসিম বিল্লাহকে বাগদাদে দেখেছি। তাকে যখন হত্যা করা হয় সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম। একশ পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। চল্লিশ বছর বয়স থেকে তিনি অব্যাহতভাবে রোযা রাখেন। দশ দিন পরপর একবার ইফতার করতেন। তার শরীর ছিল হালকা-পাতলা। পা ছিল লম্বা লম্বা। কপাল ছিল কিছুটা সরু। এই দেশের বেশির ভাগ মানুষ তার হাতে মুসলিম হন। তার এক সঙ্গী আমার কাছে বলেছেন, তিনি তার মৃত্যুর একদিন আগে সব বন্ধুবান্ধবকে ডেকে পাঠিয়েছেন এবং আল্লাহকে ভয় করার অসিয়ত করেছেন। আর বলেছেন, ইনশাআল্লাহ আগামীকাল তোমাদের থেকে বিদায় নেব। যোহরের নামাযের শেষ সেজদায় তার প্রাণ চলে যায়। গুহার কাছে খনন করা একটি কবর বের হলো। সেখানে কাফন ও সুগন্ধি ব্যবস্থা করা ছিল। তার সাথীসঙ্গীরা গোসল দিয়ে, কাফন পরিয়ে, জানাযা পড়ে তাকে দাফন করেন। আল্লাহ তার ওপর রহমত করুন।

---

[১] তুঘলকের সন্ত্রাস এই খোশমেজাজ পর্যটককেও সতর্ক হতে বাধ্য করেছিল।

[২] আসাম।

আমি যখন শায়খের কবর যিয়ারত করতে যাই তখন শায়খের অবস্থানস্থল থেকে দুই মঞ্জিল দূরত্বে তার চার সঙ্গীর সাক্ষাৎ পাই। তারা বলেন, শায়খ বলেছেন, এক পশ্চিমা পর্যটক আমাদের এখানে আসছে, তাকে স্বাগত জানাতে যাও। এজন্য আমরা আপনাকে স্বাগত জানাতে এসেছি। আমার ব্যাপারে মূলত তার কোনো জানাশোনা ছিল না। যা কিছু জেনেছেন সেটা কাশফ দ্বারা। আমি তাদের সঙ্গে শায়খের খেদমতে হাজির হই। আমি তার খানকায় পৌঁছি, যা গুহার বাইরে ছিল। আশপাশে কোনো জনবসতি ছিল না। এই দেশের হিন্দু-মুসলিম সবাই তার সান্নিধ্য লাভের জন্য আসে। তার জন্য নানা উপহারও নিয়ে আসে। এগুলো ফকির-মিসকিনরা খায়। শায়খ শুধু গরুর দুধ খেয়ে জীবন ধারণ করেন। আমি যখন তার খেদমতে হাজির হই তিনি আমার সম্মানে দাঁড়িয়ে যান। আমার দেশের খোঁজখবর নেন। আমি সবকিছু খুলে বলি। পরে আমাকে খানকায় নিয়ে যান এবং তিন দিন পর্যন্ত মেহমানদারি করেন। আমি প্রথম দিন যখন শায়খের খেদমতে যাই তিনি একটি রুমাল গায়ে দিয়ে রেখেছিলেন। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, শায়খ যদি আমাকে এই রুমালটি দিয়ে দিতেন! আমি যখন বিদায় হয়ে আসছিলাম তখন তিনি সেই রুমালটি নিজের শরীর থেকে খুলে আমাকে পরিয়ে দেন। নিজের মাথা থেকে টুপি খুলে আমার মাথায় রাখেন।

দরবেশরা বলেছেন, শায়খ সাধারণত এ ধরনের রুমাল পরতেন না। শুধু আপনার আসার খবর শুনে এই রুমালটি পরেন। তিনি বলেছেন, এই পর্যটক রুমালটি আমার কাছে চাইবে এবং এটি একজন কাফের বাদশাহ ছিনিয়ে নিয়ে যাবে এবং আমার ভাই বোরহানুদ্দিনকে দিয়ে দেবে। যখন আমি দরবেশদের কাছে এসব শুনি তখন মনে মনে পাক্কা নিয়ত করি– শায়খ আমাকে নিজের পোশাক দান করেছেন, এটি আমার জন্য অমূল্য নেয়ামত। আমি এই রুমাল পরে কখনো কোনো মুসলিম বা কাফের বাদশাহর সামনে দিয়ে যাব না।

আমি শায়খের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। অনেক দিন পর আমার চীনে যাওয়ার সুযোগ হয়। খানসা শহরে আমি নিজের সাথীসঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। রাস্তায় এক উযিরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে ডেকে নিজের কাছে নিয়ে যান। আমার হাত ধরে খোঁজখবর নেন। কথা বলতে বলতে আমরা বাদশাহর দরজায় পৌঁছে যাই। আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসার ইচ্ছা করি। কিন্তু তিনি অনুমতি দেননি। তিনি

আমাকে ধরে বাদশাহর কাছে নিয়ে গেলেন। বাদশাহ আমার কাছে মুসলিম বাদশাহদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আমি তার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিই। তখন বাদশাহর দৃষ্টি এসে পড়ে আমার সেই রুমালের ওপর। তিনি রুমালটির অনেক প্রশংসা করেন। উযির বললেন, এটি খুলো। এই অবস্থায় তার নির্দেশ না মেনে কোনো উপায় নেই। বাদশাহ আমার রুমালটি খুলে নিয়ে যান। আর এর বিনিময়ে দশটি রাজকীয় পোশাক, আসবাবপত্র ভর্তি একটি ঘোড়া এবং খরচের জন্য নগদ অর্থ উপহার দেন। কিন্তু এগুলো পেলেও আমার প্রচণ্ড কষ্ট হয়। শায়খের সেই কথা মনে পড়ে যায়। তার কারামত আমাকে বিস্মিত করে।

পরের বছর চীনের রাজধানী খান বালিকে যাই। ঘটনাক্রমে শায়খ বোরহানুদ্দিন সাগেরজির খানকায় যাওয়ার সুযোগ হয়। সেখানে গিয়ে দেখি শায়খ কিতাব পড়ছেন এবং সেই রুমালটি পরে আছে। আমি খুবই বিস্মিত হই। রুমালটি উলট-পালট করে দেখি। শায়খ আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি এটি উল্টে-পাল্টে দেখছেন কেন? আপনার কি এটা চেনা চেনা লাগছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমার কাছ থেকে এটি খানসার বাদশাহ নিয়ে গিয়েছিলেন। শায়খ বললেন, শায়খ জালালুদ্দিন এই রুমালটি আমার জন্য বানিয়েছিলেন। আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, অমুক ব্যক্তি মারফত তোমার কাছে রুমালটি পৌঁছাবে। শায়খ আমাকে সেই চিঠিটিও দেখান। আমি সেই চিঠিটি পড়ি এবং শায়খের বিশ্বাসের ওপর বিস্মিত বোধ করি। পরে শায়খ বোরহানুদ্দিনের কাছে পুরো ঘটনা খুলে বলি। তিনি বললেন, আমার ভাই শায়খ জালালুদ্দিনের মর্যাদা এর চেয়েও অনেক বেশি। দুনিয়ার সবকিছুতে তার প্রভাব আছে। এখন তিনি ইন্তেকাল করেছেন। এরপর তিনি বলেন, আমার কাছে তথ্য আছে, তিনি প্রতিদিন ফজরের নামায মক্কা মোয়ায্যামায় আদায় করতেন। প্রতি বছর হজ করতেন। আরাফা ও ঈদের দিন অদৃশ্য হয়ে যেতেন। তিনি কোথায় আছেন সেটা কেউ জানত না।

সোনারগাঁও : পূর্ব বাংলার প্রাচীন রাজধানী

শায়খ জালালুদ্দিনের কাছে বিদায় নিয়ে পনেরো দিন পর্যন্ত সফর করার পর আমরা সোনারগাঁওয়ে[১] পৌঁছি।

---

[১] দীর্ঘদিন যাবত এই শহর পূর্ব বাংলার রাজধানী ছিল। এটি ঢাকা থেকে কয়েক মাইল দূরত্বে। এখানে

'জাভা' সফর

রাস্তার স্থানগুলো, বিস্ময়কর দৃশ্য ও প্রথা

আমরা 'জাভা'গামী একটি জাহাজ প্রস্তুত অবস্থায় দেখলাম। এখান থেকে জাওয়া চল্লিশ দিনের পথ। আমরা জাহাজে আরোহণ করি এবং পনেরো দিন পর ব্রাহানকারদের[১] দেশে পৌঁছি। এখানকার লোকেরা 'হামজ' সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা হিন্দুও না মুসলিমও না। বাঁশের ঘরে থাকে। যার ছাউনি খড়ের। সমুদ্রের তীরে তাদের অবস্থান। এখানে কলা, সুপারি ও পান বেশি উৎপন্ন হয়। পুরুষেরা আমাদের মতোই, কিন্তু তাদের চেহারা কুকুরের মতো। তবে নারীদের চেহারা ঠিক আছে এবং তারা অনেক সুন্দরী। এখানকার পুরুষেরা প্রায় নগ্ন অবস্থায় থাকে। শুধু বিশেষ অঙ্গ এবং দুটি নিতম্ব ঢেকে রাখে বাঁশের বেত দ্বারা, যা কারুকাজ করা থাকে এবং পিঠে বাঁধা থাকে। আর তাদের নারীরা গাছের পাতা দ্বারা নিজেদের সতর ঢাকে।

এই শহরে জাভা ও বাঙলার মুসলিমরা পৃথক মহল্লায় থাকে। এই লোকেরা চতুষ্পদ প্রাণীর মতো ঘোষণা দিয়ে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হয়। এক একজন পুরুষের ত্রিশজন করে স্ত্রী থাকে। এর চেয়ে কম বা বেশি নয়। এই লোকেরা কখনো ব্যভিচার করে না। কোনো পুরুষকে ব্যভিচার অবস্থায় ধরতে পারলে তাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। তবে তারা তাদের নিজেদের পরিবর্তে অন্য কাউকে কিংবা কোনো ক্রীতদাসকে দিয়ে দিলে ছাড় পেয়ে যায়। আর কোনো নারী ব্যভিচার করলে তার শাস্তি হলো রাজার সব ক্রীতদাস তার সঙ্গে সঙ্গম করতে থাকবে। এভাবে সে মারা যাবে এবং তার লাশ সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। এজন্য তারা জাহাজের কোনো লোককে নিজেদের জনবসতিতে আসতে দেয় না। তবে তারা অবস্থান করতে চাইলে মানা করে না। বেশির ভাগ লোক তীরে এসে কেনাকাটাও করে। জাহাজের লোকদের জন্য তারা হাতিতে করে পানি নিয়ে যায়। কেননা সমুদ্র তীরে মিষ্ট পানি পাওয়া যায় না। তবে পানি আনার জন্য জাহাজের লোকদের শহরের ভেতরে ঢুকতে দেয় না। কেননা তাদের নারীরা সুন্দর পুরুষদের দেখলে তাদের প্রতি আসক্ত হয়ে যেতে পারে। এই দেশে হাতি অনেক বেশি। কিন্তু বাদশাহ ছাড়া কেউ হাতির ওপর চড়তে পারে না। তারা জাহাজের লোকদের

উৎকৃষ্টমানের সূতি কাপড় তৈরি হয়।

[১] এর দ্বারা উদ্দেশ্য আরাকান।

কাছ থেকে কাপড় কিনে নেয়। তাদের কথাবার্তাও বিস্ময়কর। সেখানকার অধিবাসী কিংবা সেখানে নিয়মিত যাদের যাতায়াত আছে তাদের ছাড়া কেউ সেই কথা বুঝতে পারে না।

আমরা ওই বন্দরে অবস্থান করছিলাম। এক রাতে ঘটনাক্রমে জাহাজের মালিকের এক ক্রীতদাস, যে ওই লোকদের কাছে যাতায়াত করত, সেখানকার এক নারীর সঙ্গে একটি গুহার কাছে সাক্ষাৎ করে। ওই নারীর স্বামী এই খবর পেয়ে গেল। তাদের দুজনকে ধরে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। রাজা নির্দেশ দিলেন ক্রীতদাসের লজ্জাস্থান যেন কেটে ফেলা হয় এবং তাকে যেন ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। আর নারীর ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন, উপস্থিত সবাই তার সঙ্গে সঙ্গম করবে, এমনকি এভাবেই যেন তার মৃত্যু হয়। পরে রাজা সমুদ্রের তীরে আমাদের কাছে এলেন এবং নিজের এই নির্দেশের ব্যাপারে অপারগতা পেশ করলেন। বললেন তিনি এটা করতে বাধ্য। পরে জাহাজের মালিককে সেই ক্রীতদাসের বিনিময় দিয়ে দেন।

জাভা দ্বীপ সুমাত্রা অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়ায় অবতরণ

সেখান থেকে রওনা দিয়ে পঁচিশ দিন সফরের পর আমরা জাভা দ্বীপে[১] পৌঁছি। লুবান জাবির নামে এই দ্বীপ পরিচিত। অত্যন্ত সবুজাভ একটি দেশ। নারিকেল, সুপারি, লং, উদ, কাঁঠাল, আম, জাম, কমলা ও কর্পূর গাছ এই দ্বীপে বেশি হয়। লোকেরা বেচাকেনা করে এক ধরনের ধাতুর টুকরো দিয়ে। এ ছাড়া পরিষ্কার করা হয়নি এমন সোনা-রুপার টুকরো দিয়েও বেচাকেনা করা হয়। এই দ্বীপে প্রচুর সুগন্ধি তৈরি হয়। তবে এর বেশির ভাগই কাফের অধ্যুষিত এলাকায়, মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় কম। যখন আমরা বন্দরে পৌঁছি সেখানকার অধিবাসীরা আমাদের স্বাগত জানানোর জন্য ছোট-বড় জাহাজে করে ছুটে আসে। নারিকেল, বাদাম, আম ও মাছ উপহার হিসেবে নিয়ে আসে।

এরপর আমাদের কাছে নৌবাহিনীর প্রতিনিধি এলেন এবং সব ব্যবসায়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। আমাদেরকে স্থলভাগে নামার অনুমতি দেন। পরে আমরা বন্দরে অবতরণ করি। এটি অনেক বড় জায়গায় অবস্থিত। সমুদ্রের

---

[১] বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া নামে প্রসিদ্ধ।

তীরে ঘর বানিয়ে রাখা হয়েছে, যার নাম 'সারহা'। এখান থেকে শহর চার মাইল। এরপর আমরা সুলতানের রাজধানীর দিকে চললাম। এই শহর অনেক বড়। এর চারপাশে কাঠের প্রাচীর। প্রাসাদও কাঠের তৈরি। বাদশাহর নাম মালিক জহির। এই ব্যক্তি অনেক যোগ্য এবং দানশীল। শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। ইলমি লোকদের সঙ্গে অত্যন্ত ভালোবাসার সম্পর্ক রাখেন। তার মজলিসে সবসময় ইলমের চর্চাই হয়। তিনি অনেক বেশি জিহাদও করেন আবার চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয়ীও। জুমার নামাযের জন্য সবসময় পায়ে হেঁটে আসেন। এখানকার অধিবাসী সবাই শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। তারা জিহাদের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী এবং কাফেরদের ওপর বিজয়ী। আশপাশের কাফেরদের কর পরিশোধ করে থাকতে হয়।

আমরা যখন রাজপ্রাসাদের দিকে গেলাম এবং প্রাসাদের কাছাকাছি পৌঁছে দেখলাম, আমাদের চলার পথে দুই পাশে মাটিতে বর্ষা পুঁতে রাখা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে, যে কেউ বাহনে চড়ে আসুক বাহন নিয়ে এরচেয়ে সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। আমরা সেখানে ঘোড়া থেকে নেমে গেলাম এবং রাজপ্রাসাদের আঙিনায় প্রবেশ করলাম। সেখানে আমরা সাক্ষাৎ পেলাম বাদশাহর প্রতিনিধির, যাকে উমদাতুল মুলক বলা হয়। তিনি উঠে এসে আমাদের সালাম করলেন। অথচ সালামের স্থলে তারা মুসাফাহা করে থাকেন। পরে তিনি আমাদেরকে পাশে বসালেন। আর বাদশাহর কাছে আমাদের আসার খবর জানিয়ে একটি চিরকুট লিখে ক্রীতদাসের মাধ্যমে পাঠালেন। সঙ্গে সঙ্গে জবাব এলো। পরে ক্রীতদাস একটি কাপড়ের গাট্টি নিয়ে এলো। বাদশাহর সহকারী তা নিজ হাতে নিলেন এবং আমাকে হাতে ধরে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। যাকে তারা 'ফারোখানা' বলে। এটি তাদের দিনের বেলায় আরাম করার জায়গা। কেননা বাদশাহর সহকারী সকালে আসেন ইশার পরে বাড়িতে যান। বড় বড় আমির ও উযিরদের রুটিনও তেমনি। সেখানে গিয়ে তিনি গাট্টি থেকে তিনটি কাপড় বের করলেন। এর মধ্যে একটি খাঁটি রেশমের, দ্বিতীয় রেশম ও তুলা দিয়ে বানানো এবং তৃতীয়টি রেশম ও সুতি কাপড়ের তৈরি। পরে গাট্টি থেকে আরো তিনটি কাপড় বের করলেন, যাকে 'তাহতানিয়া' বলা হয়। পরে আরো তিনটি কাপড় বের করলেন, যাকে 'ওসতানি' বলে। পরে ইরমাকের তিনটি কাপড় বের করলেন, যার মধ্যে একটি ছিল সাদা। এরপর বের করলেন তিনটি

পাগড়ি। আমি এগুলো থেকে একটি চাদর পায়জামার পরিবর্তে বেঁধে নিলাম। আর প্রতিটি ধরনের কাপড় থেকে একটি করে নিলাম। আর বাকি কাপড়গুলো আমার সাথীসঙ্গীরা নিলেন। এরপর খাবার এলো। বেশির ভাগ খাবার ছিল ভাত-জাতীয়। এরপর আনা হলো ফলের রস। এরপর পান। পান আসা মানে খাবার পর্ব শেষ। আমরা পান নেওয়ার পর উঠে যাই। বাদশাহর সহকারীও আমাদের সঙ্গে বাহনে চড়ে এলেন এবং আমাদেরকে একটি বাগানে নিয়ে গেলেন। এর চারপাশে কাঠের প্রাচীর ছিল। আর মধ্যখানে কাঠের তৈরি ঘর। সেখানে মখমলের বিছানা বিছানো ছিল। বেতের তৈরি চৌকি পাতা ছিল। রেশমের গদি, হালকা-পাতলা লেপ ও হেলান দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আমরা সেখানে বসলাম এবং আমাদের সঙ্গে বাদশাহর সহকারীও বসলেন। পরে আমির দাওলাসা এলেন। তিনি সঙ্গে করে দুটি বাঁদি এবং দুজন ক্রীতদাস নিয়ে এলেন। আর আমাকে বললেন, বাদশাহ বলেছেন, এই যত্নআত্তি আমাদের স্তর অনুযায়ী, সুলতান মুহাম্মাদ শাহ হিন্দের শান অনুযায়ী নয়। পরে বাদশাহর সহকারী চলে গেলেন এবং আমির দাওলাসা আমার কাছে রইলেন। আমি আগে থেকেই তাকে চিনতাম। কারণ তিনি একবার সুলতানের পক্ষ থেকে দূত হয়ে দিল্লির বাদশাহর দরবারে গিয়েছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, বাদশাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে কবে? তিনি বললেন, এখানকার নিয়ম হলো, কোনো মুসাফির তিন দিন পর্যন্ত বাদশাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন না। যখন সফরের কষ্ট দূর হয়ে যায়, মুসাফির শারীরিকভাবে সুস্থ-সবল হয়ে উঠেন তখন তিনি বাদশাহকে সালাম করার অনুমতি পান। সুতরাং আমাদেরও এখানে তিন দিন থাকতে হলো। আমাদের জন্য প্রতিদিন তিন দফা খাবার আসত। সকাল-সন্ধ্যা ফলমূল ও বিরল জিনিসপত্র আসত।

সুলতানের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য

চতুর্থ দিন ছিল শুক্রবার। আমির দাওলাসা আমাদের কাছে এসে বললেন, আজ মসজিদে বাদশাহকে সালাম দেওয়ার সুযোগ পাবেন। আমি মসজিদে গেলাম এবং জুমার নামায আদায় করলাম। বাদশাহর প্রহরী কিরান আমার সঙ্গে ছিলেন। আমি বাদশাহর কাছে গেলাম। সেখানে কাজি আমির সাইয়েদ এবং তার ছাত্ররা ডানে-বামে বসা ছিলেন। বাদশাহ আমার সঙ্গে মুসাফাহা

করলেন। আমি সালাম করলাম, বাদশাহ আমাকে তার বাম পাশে বসালেন। সুলতান মুহাম্মাদ হিন্দুস্তানের বাদশাহ এবং আমার সফরের খোঁজখবর নিলেন। আমি বাদশাহর বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিলাম। এরপর ফিকহে শাফেয়ীর বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে আসরের নামায পর্যন্ত আলোচনা হলো। বাদশাহ আসরের নামাযের পর একটি কামরায় চলে গেলেন এবং কাপড় খুলে ফেললেন। তিনি মসজিদে আসতেন মৌলভিদের মতো কাপড় পরে এবং পায়ে হেঁটে আসতেন। এরপর শাহি পোশাক পরলেন, যা তুলা ও রেশমের তৈরি। যখন মসজিদ থেকে বের হলেন সেখানে হাতি ও ঘোড়া দাঁড়ানো ছিল। সেখানকার নিয়ম হলো, বাদশাহ যখন হাতিতে চড়েন তখন অন্যান্য কর্মকর্তারা ঘোড়ায় চড়েন। আর বাদশাহ যখন ঘোড়ায় চড়েন অন্যরা চড়েন হাতিতে। আর জ্ঞানী-গুণী লোকেরা বাদশাহর ডান পাশে থাকেন। ওই দিন বাদশাহ চড়লেন হাতিতে। আর আমরা সবাই ঘোড়ায় আরোহণ করলাম এবং রাজপ্রাসাদের দিকে গেলাম। যথারীতি আমরা আমাদের অবস্থানস্থলে নেমে গেলাম এবং সুলতান বাহনে চড়ে রাজপ্রাসাদের অন্তর মহলে চলে গেলেন।

মহলের বাইরের দহলিজে উযির, আমির, কাতিব, কর্মকর্তা ও সেনা অফিসাররা কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রথম কাতারে উযির ও কর্মকর্তারা। সুলতানের চারজন উযির। তারা সালাম করলেন এবং নির্ধারিত স্থানে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। পরের কাতারে মৌলভি ও বিশিষ্টজনরা। পরের কাতারে বাদশাহর সাথীসঙ্গী, বিচারক ও কবিরা। এরপর সেনা অফিসারদের কাতার। এরপর ক্রীতদাসদের কাতার সালাম করল। সুলতান তার দরবার হলের সামনে হাতির ওপর সওয়ার হয়ে বসে রইলেন। বাদশাহর ডান পাশে পঞ্চাশটি সজ্জিত হাতি দাঁড়িয়েছিল, বাঁ পাশেও একই পরিমাণ হাতি দাঁড়িয়েছিল। এরপর ডান পাশে পঞ্চাশটি ঘোড়া এবং বাঁ পাশে পঞ্চাশটি ঘোড়া। এগুলোর ওপর বাদ্যযন্ত্র রাখা ছিল। বাদশাহর সামনে প্রহরী দাঁড়ানো ছিল। এরপর গায়ক ও বাদকেরা এলো। তারা গান শুরু করে দিল। এরপর ঘোড়া সামনে আনা হলো, যার ওপর রেশমের কম্বল জড়ানো ছিল। যার পায়ে ছিল স্বর্ণের নূপুর আর সিল্কের সোনার রশি। ঘোড়াটি বাদশাহর সামনে নাচ দেখাল। তার নাচ দেখে আমি বিস্মিত হলাম। এ ধরনের তামাশা হিন্দুস্তানের বাদশাহর সামনেও আমি দেখেছি।

বাদশাহর ভাতিজা ও একটি প্রেমের গল্প

যখন মাগরিবের সময় হলো সুলতান অন্দর মহলে প্রবেশ করলেন এবং অন্যরা নিজ নিজ জায়গায় চলে গেলেন। সুলতানের এক ভাতিজা ছিলেন। তার বিয়ে হয়েছিল সুলতানের মেয়ের সঙ্গে। তিনি এক আমিরের মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন। তাকেই বিয়ে করতে চাচ্ছিলেন। এখানকার নিয়ম হলো, যখন কোনো আমির বা প্রজার মেয়ে যৌবনে পৌঁছে তখন সুলতানকে খবর পাঠানো হয়। সুলতান সেই মেয়েকে দেখার জন্য নারীদের পাঠান। তারা পছন্দ করলে সুলতান তাকে বিয়ে করে। আর পছন্দ না হলে অভিভাবকরা যেখানে খুশি বিয়ে দিতে পারে। লোকেরা আকাঙ্ক্ষা করে, আমাদের মেয়েটি যেন বাদশাহর পছন্দ হয়। কেননা বাদশাহর সঙ্গে বিয়ে হলে তার বাবার মর্যাদা অনেক বেড়ে যায়। যখন ওই মেয়ের বাবা বাদশাহর অনুমতি প্রার্থনা করলেন তখন যথারীতি বাদশাহর পক্ষ থেকে নারীরা তাকে দেখার জন্য গেলেন। তাদের দেওয়া মতামতের ভিত্তিতে বাদশাহ ওই মেয়েকে বিয়ে করেন। এতে বাদশাহর ভাতিজার প্রেমের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। তিনি কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। অবশেষে একবার বাদশাহ শিকারের উদ্দেশে গেলেন এবং এক মাসের পথ দূরত্বে কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এদিকে ভাতিজা বিদ্রোহ করে বাদশাহ হয়ে গেলেন। কিছু লোক তার কাছে বাইআতও হয়ে গেল। বাকি লোকেরা তার আনুগত্য প্রকাশ করল না। বাদশাহ যখন এই খবর পেলেন সঙ্গে সঙ্গে সুমাত্রার দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন। বাদশাহর ভাতিজা যে পরিমাণ ধনসম্পদ সঙ্গে নেওয়া সম্ভব তা নিয়ে প্রেমিকাসহ 'মুলজাওয়া' দেশের দিকে পালিয়ে গেলেন। এরপর বাদশাহ শহরের চারপাশে প্রাচীর নির্মাণ করেন।

আমি সুলতানের নিকট সুমাত্রায় পনেরো দিন অবস্থান করলাম। পরে সফরের অনুমতি চাইলাম। কেননা তখন ছিল চীন সফরের উপযুক্ত সময়। যেকোনো সময় চীনে সফর করা কঠিন। সুলতান আমার সফরের জন্য একটি কাফেলা তৈরি করে দিলেন। সফরের পাথেয়ও জোগাড় করে দিলেন এবং আরো সদাচার করলেন। আল্লাহ তার অনুগ্রহের উপযুক্ত বদলা দিন। তিনি নিজের কিছু লোক নিযুক্ত করে দিলেন যারা প্রতিদিন আমাদেরকে মেহমানদারি করত। আমরা একুশ দিন পর্যন্ত এই দেশের তীর ধরে চললাম।

সিয়াম ও কম্বোডিয়া

বিরল প্রথা, বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা ও আশ্চর্যজনক ঘটনাবলি

পরে আমরা 'মাল জাওয়া'য়[১] পৌঁছি। এই দেশের অধিবাসীরা মুসলিম নয়। এই দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পৌঁছতে দুই মাস সফরের প্রয়োজন পড়ে। সুলতান জহিরের দেশে ধূপ, কর্পূর, লবঙ্গ ও ভারতীয় ঘৃতকুমারী ছাড়া আর কোনো সুগন্ধি উৎপন্ন হয় না। এগুলো বেশির ভাগ মাল জাওয়ায় উৎপন্ন হয়। এগুলোর ব্যাপারে যা কিছু দেখেছি এবং জিজ্ঞেস করে জেনেছি তা লিখে রেখেছি। ধূপের গাছ ছোট হয়। মানুষের সমান উচ্চতা, কোনোটি ছোটও হয়। ধূপ মূলত এক ধরনের আঠা, যা গাছের শাখা থেকে বের হয়। কাফেরদের এলাকার চেয়ে মুসলমানদের এলাকায় ধূপ তুলনামূলক বেশি হয়।

কর্পূরের গাছ একদম বাঁশের মতো। তবে কঞ্চিগুলো লম্বা ও মোটা হয়। আর কর্পূর কঞ্চি থেকে বের হয়। যখন বাঁশ কাটা হয় তখন এর ভেতর থেকে কর্পূর বের হয়।

ভারতীয় ঘৃতকুমারী একটি গাছে হয়, যা অনেকটা ওক গাছের মতো। তবে এর ছাল পাতলা হয়। এর পাতাগুলো একদম ওকের পাতার মতো। এর শিকড় অনেক লম্বা হয় এবং এর থেকে আতরের সুগন্ধি ভেসে আসে। তবে কাঠ ও পাতায় কোনো সুগন্ধি নেই। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় ঘৃতকুমারীর সব গাছ জনসাধারণের মালিকানায়। আর কাফের অধ্যুষিত এলাকায় বেশির ভাগ গাছ কারো মালিকানায় নয়।

লবঙ্গ গাছ অনেক মোটা ও বিস্তৃত হয়। এটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার তুলনায় কাফেরদের এলাকায় বেশি হয়। আর সেগুলো এত বেশি পরিমাণে যে, কারো মালিকানায় নেই। আমাদের দেশে যেসব লবঙ্গ আসে সেগুলো এসব গাছের লাকড়ি। আর ওই জিনিস যা আমাদের দেশে 'নাওয়ারুল কারামফুল' বলা হয়, তা ওই ফুল যা ঝরে পড়ে। লবঙ্গের ফলকে জায়ফল বলে। আর যে কলি এতে থাকে সেটাকে জুতরি বলে। আমি সবগুলোই দেখেছি।

---

[১] সিয়াম ও কম্বোডিয়া এলাকায়।

মাল জাওয়ার বাদশাহ

মাল জাওয়ার বাদশাহ কাফের। আমি তাকে রাজপ্রাসাদের বাইরে মাটিতে বসে থাকতে দেখেছি। সেখানে কোনো বিছানা বিছানো ছিল না। তার বাহিনী ও কর্মকর্তা-কর্মচারী সবাই সামনে উপস্থিত ছিল। সবাই ছিল পদাতিক। এই দেশে ঘোড়া নেই। একমাত্র বাদশাহ ঘোড়ায় চড়েন। আর সাধারণ লোকেরা হাতিতে চড়ে। এই হাতিতে চড়েই লড়াইয়েও যায়। বাদশাহর কাছে যখন আমার কথা বলা হলো, তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি এলাম এবং اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى (আল্লাহর দেখানো পথ গ্রহণকারী এই সালামের উপযুক্ত) বলে সালাম দিলাম। তিনি এটাকে গতানুগতিক সালাম মনে করলেন। এতে খুব খুশি হলেন এবং আমাকে মারহাবা বললেন। আমার জন্য মাটিতে বিছানা বিছিয়ে দিলেন এবং বললেন, এতে বসুন। আমি ভাষ্যকারের মাধ্যমে বললাম, যতক্ষণ বাদশাহ মাটিতে বসে থাকবেন ততক্ষণ আমি কোনোভাবেই বিছানায় বসতে পারব না। ভাষ্যকার জানালেন, বাদশাহর অভ্যাস হলো, তিনি নিতান্তই বিনয় প্রদর্শনের জন্য মাটিতে বসেন। আপনি একজন মেহমান। এ ছাড়া একজন বড় বাদশাহর পক্ষ থেকে এসেছেন।[১] এজন্য আপনাকে সম্মান করা জরুরি। সুতরাং আমি বসে গেলাম।

বাদশাহ হিন্দুস্তানের অবস্থা জানতে চাইলেন। অত্যন্ত ছোট ছোট প্রশ্ন করলেন। পরে আমাকে বললেন, তিন দিন পর্যন্ত আপনারা আমাদের মেহমান। এরপর আপনাদের যাওয়ার অনুমতি আছে। বাদশাহর দরবারে এক ব্যক্তিকে দেখলাম সে নিজের গলার কাছে ছুরি ধরে রেখেছে এবং কিছু বলছে, যার কিছুই আমি বুঝিনি।

বিশ্বস্ততার হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য

পরে সেই লোক ছুরিটি এমনভাবে গলায় চেপে ধরল যে, গলা কেটে গেল এবং মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আমি খুবই বিস্মিত হলাম। বাদশাহ আমার কাছে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার দেশেও কি কেউ এমন করে? আমি বললাম, কখনো না। বাদশাহ এই কথা শুনে হাসলেন এবং

---

[১] তুঘলকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরও ইবনে বতুতা নিজেকে তার দূত হিসেবেই পরিচয় দিয়ে যাচ্ছিলেন।

বললেন, সে আমার ক্রীতদাস। আমার প্রতি এই পরিমাণ ভালোবাসা পোষণ করে যে, নিজের প্রাণ আমার জন্য উৎসর্গ করে দিচ্ছে। পরে বাদশাহ লাশটি জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। বাদশাহ মৃত ব্যক্তির সন্তানদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন এবং এভাবে মৃত্যুতে তার বংশের মর্যাদা অনেক বেড়ে গেল। সেখানে উপস্থিত এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন, গলা কাটার আগে ওই লোক বলছিলেন, বাদশাহ তার কাছে এতটাই প্রিয় যে, বাদশাহর জন্য তিনি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। এর আগে তার বাবা ও দাদাও এই বাদশাহর বাবা ও দাদার জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। এরপর আমি দরবার থেকে উঠে চলে এলাম। সেখানে তিন দিন থাকলাম।

প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ

পরে আমরা সামুদ্রিক সফর শুরু করি। ত্রিশ দিন সফর করার পর প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করি। এর পানি একদম কালো। এর মধ্যে লালচে ভাবও চোখে পড়ে। ধারণা করা হয়, এর তীরের দেশগুলোর মাটির রঙের কারণে পানি এই রং ধারণ করেছে। এই সমুদ্রে বাতাসও নেই, ঢেউও নেই। এজন্য সমুদ্রের কোনো উত্তালতাও নেই। এজন্য প্রত্যেক জাহাজের সঙ্গে আরো তিন চারটি ছোট জাহাজ থাকে। বড় জাহাজে এক দিকে বিশটি অপর দিকে বিশটি করে দাঁড় থাকে। এক একটি দাঁড় মাস্তুলের মতো হয়ে থাকে। প্রতিটি দাঁড়ে ত্রিশজন করে কাজ করে। প্রতিটি দাঁড়ে দুটি বড় বড় রশি বাঁধা থাকে। যখন একটি দল দাঁড়ে টান দেয় তখন একই সঙ্গে অপর দলও টান দেয়। আর এই টান দেওয়ার সময় তারা সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন সুন্দর শব্দ বের করে।

এই সমুদ্রে আমরা সাঁইত্রিশ দিন চলি। আমরা এত দ্রুত সময়ে কীভাবে সমুদ্র পাড়ি দিলাম সে ব্যাপারে নাবিকরা বিস্ময়বোধ করে। কেননা এই সফর কমপক্ষে পঞ্চাশ দিনের।

চীন দেশে

সেখানকার ফসল, বৈশিষ্ট্য, কৃষি, ফলমূল ও শিল্প

সতেরো দিন পর আমরা চীন দেশে প্রবেশ করি। বাতাস অনুকূলে ছিল। জাহাজ অনেক দ্রুত চলে। চীন দেশটি অনেক বড় ও উর্বর। কৃষি, সোনা-রুপার খনি ও ফসল উৎপন্নের দিক থেকে কোনো দেশ এর সঙ্গে মোকাবেলা করার মতো নয়। শহরের মধ্যখান দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত হয়েছে। এটাকে আবে হায়াত[১] (জীবনের পানি) এবং 'সারদ'ও বলে। এই নামে নদী হিন্দুস্তানেও আছে। খান বালিকের[২] কাছে একটি পাহাড় আছে, সেখান থেকে এই নদীটি নির্গত হয়েছে। সেই পাহাড়কে 'কুহে বুযনা' বলে। এটি চীনের মধ্যখান দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে এবং 'সিন আস সিন'[৩] শহরে এসে শেষ হয়েছে। নীলনদের মতো এর তীরেও গ্রাম, ক্ষেতখামার, বাগান ও বাজার রয়েছে। মিশরের তুলনায় এখানকার অধিবাসী অনেক বেশি। চীনের আখ মিশরের আখের চেয়ে ভালো। এখানে আঙুর ও বরই প্রচুর হয়। আমি মনে করতাম দামেশকে উৎপন্ন উসমানি বরইয়ের মতো বরই দুনিয়ার আর কোথাও বুঝি উৎপন্ন হয় না। কিন্তু চীনের বরই এর চেয়েও ভালো। এখানকার তরমুজও অতুলনীয়। খাওয়ারিজম ও ইস্পাহানের তরমুজের মতো। আমাদের দেশে যে ধরনের ফল উৎপন্ন হয় এর সবগুলোই চীনে ভালো হয়। এখানে অনেক গম উৎপন্ন হয়। এখানকার গমের মতো বড় দানার গম আর কোথাও দেখিনি। মশুর ও মটরশুটির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

চীনামাটি ও এর পাত্রের কথা

চীনামাটির পাত্র শুধু যাইতুন ও সিনকালান শহরে তৈরি হয়। এটি পাহাড়ের মাটি দ্বারা তৈরি করা হয়। যা আগুনে কয়লার মতো পোড়ানো হয়। এর মধ্যে পাথর মেশানো হয়। লাগাতার তিন দিন আগুন দিয়ে পোড়ানো হয়। এরপর পানি ঢেলে দেওয়া হয়। এতে মাটি হয়ে যায়, যার দ্বারা খামিরা

---

[১] কিয়াং নদী।

[২] পেকিং (বর্তমান বেইজিং)।

[৩] ক্যানটন।

বানানো হয়। উন্নতমানের পাত্র বানানোর জন্য খামিরা তৈরি করতে এক মাস সময় দিতে হয়। সাধারণ মানের জন্য দশ দিন সময় লাগে। এসব পাত্র সেখানে এত কম দামি হয় যেমন আমাদের দেশে সাধারণ মাটির পাত্র; বরং এর চেয়েও কম। পরে সেগুলো হিন্দুস্তানসহ অন্যান্য দেশে রপ্তানি করে। এমনকি পশ্চিমা দেশগুলোতেও যায়। আর সেখানে গিয়ে এসব পাত্র অনেক দামি হয়ে ওঠে।

চীনের মোরগ-মুরগি ও এর শারীরিক গঠন

চীনের মোরগ ও মুরগি হাঁসের চেয়েও বড় হয়। সেখানকার মুরগির ডিমও হাঁসের ডিমের চেয়ে বড় হয়। তবে সেখানকার হাঁসগুলো ছোট ছোট। আমি একটি মুরগি কিনে সেটা রান্না করতে গেলাম। কিন্তু একটি পাত্রে তা সংকুলান হলো না। পরে দুটি পাত্রে রাঁধতে হয়। মোরগ উটপাটির সমপরিমাণের হয়। যখন সেগুলো পালক ছাড়ে তখন বিশাল একটি লাল দেহ ছাড়া আর কিছু থাকে না। চীনা মোরগ আমি প্রথমে দেখি কাওলামে। আমি এটাকে উটপাখির বাচ্চা মনে করেছিলাম। যখন জানলাম এটি মোরগ তখন খুবই বিস্মিত বোধ করলাম। আমার এক বন্ধু বলেছিলেন, চীনের মোরগ এর চেয়েও বড় হয়। যখন সেখানে গেলাম বাস্তবে তার প্রমাণ পেলাম।

চীনবাসীর ধর্ম ও শাসনপদ্ধতি

চীনের নাগরিক অমুসলিম। তারা মূর্তিপূজক। তারা মৃতদেহ হিন্দুদের মতো সৎকার করে। চীনের বাদশাহ তাতার। তিনি চেঙ্গিস খানের বংশধর। চীনের প্রায় প্রত্যেক শহরেই মুসলিম জনবসতি আছে। সেই জনবসতিগুলো পৃথক স্থানে। সেখানে জামে মসজিদ ও ছোট মসজিদ রয়েছে। চীনের মুসলিমদের বেশ মূল্যায়ন করা হয়। চীনের অমুসলিমরা শূকর ও কুকুরের গোশত খায়। বাজারে এসবের বেচাকেনা হয়। সেখানকার অধিবাসীরা বেশ সম্পদশালী। কিন্তু খাবারদাবার ও পোশাক-আশাকে তা প্রদর্শন করতে চায় না। একজন বড় ব্যবসায়ী, যার অর্থের কোনো অভাব নেই, তিনিও সাধারণ মানের সুতি কাপড় পরেন। তবে তারা সোনা ও রুপার পাত্র ব্যবহারে বাড়াবাড়ি করে। প্রত্যেকের হাতে লাঠি থাকে এবং সেটির ওপর ভর করে চলে। তারা বলে, লাঠি আমাদের তৃতীয় পা।

চীনে রেশমের উৎপাদন

চীনে প্রচুর রেশম উৎপাদন হয়ে থাকে। কেননা রেশমের গুটি ফলের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে নিজে নিজেই বেড়ে ওঠে এবং সেগুলোর বিশেষ যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। এখানকার গরিব ও নিঃস্ব লোকেরা রেশমের কাপড় পরে। ভিনদেশি বণিকেরা না কিনলে রেশমের চেয়ে মূল্যহীন কোনো জিনিস চীনে হতো না। সুতার একটি কাপড়ের বিপরীতে রেশমের কয়েকটি কাপড় পাওয়া যায়।

চীনে ধাতব মুদ্রার পরিবর্তে নোটের প্রচলন

এখানকার অমুসলিমদের মধ্যে একটি প্রচলিত রীতি হলো, যার কাছে যত সোনা ও রুপা আছে তা গলিয়ে এক একটা ইনগট তৈরি করে বাড়ির প্রবেশ পথে ঝুলিয়ে রাখে। কারো কাছে এ ধরনের পাঁচটি ইনগট থাকলে সে হাতে একটি আংটি পরিধান করে। দশটি থাকলে দুটি আংটি। যার কাছে পনেরো কিনতার (এক কিনতার সোয়া সের) থাকলে তাকে 'সত্তি' বলে। যেমন মিশরে কারেম অর্থাৎ মহাজন বলা হয়। এক কিনতারের মালিককে 'বারকালা' বলে। চীনের লোকেরা সোনা কিংবা রুপা দিয়ে লেনদেন করে না। তারা নিজেদের কাছে যত সোনা বা রুপা আছে তা গলিয়ে ইনগট বানিয়ে রাখে। আর কাগজের নোট দ্বারা লেনদেন করে। সেই কাগজের প্রতিটি আকার হয় হাতের তালু বরাবর। তাতে বাদশাহর সিল মারা থাকে। এ ধরনের পঁচিশটি কাগজকে 'বালিশত' বলা হয়। আমাদের দেশে এই শব্দটি দিনার অর্থে ব্যবহার হয়। যখন এসব কাগজ বেশি ব্যবহার কিংবা কোনো কারণে ফেটে যায়, নির্ধারিত অফিসে নিয়ে গেলে এর বিনিময়ে নতুন নোট দিয়ে দেয়। সেই অফিস একজন বড়মাপের আমিরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। কেউ বাজারে দিনার কিংবা দিরহাম নিয়ে গেলে সেগুলো দ্বারা কেনাকাটা করতে পারবে না। তবে সেই দিনার বা দিরহামের বিনিময়ে কাগজের নোট নিতে পারবে। আর এর বিনিময়ে যা খুশি কেনাকাটা করতে পারবে।

চীনে পাথরের কয়লার ব্যবহার

চীনে খাট্টা মাটি অর্থাৎ, পাথরের কয়লার ব্যবহার রয়েছে। এটি ওই কালো মাটির মতো হয়ে থাকে যাকে আন্দালুসে 'তিফল' বলা হয়। এর রংও সে

রকমই হয়। হাতির ওপর বহন করে এই মাটি আনা হয়। কয়লার মতো ছোট ছোট টুকরো করা হয়। এগুলো চুলায় দিলে কয়লার মতো জ্বলতে থাকে। এর ছাই বের করে শুকিয়ে আবার জ্বালানো হয়। একদম নিঃশেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে। এই মাটি দ্বারা চীনামাটির পাত্রও বানানো হয়। এর সঙ্গে পাথরও মেশানো হয়।

চীনের লোকদের শিল্প ও কারুকাজ

চীনের লোকজন শিল্প ও কারুকাজে দক্ষতার ক্ষেত্রে গোটা বিশ্বে প্রসিদ্ধ। তাদের শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যের কথা বিভিন্ন বইপত্রে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। ছবি আঁকার ক্ষেত্রে ফিরিঙ্গি কিংবা অন্য কোনো জাতি তাদের সমকক্ষ নয়। এই বিষয়ে তারা পূর্ণাঙ্গ। আমরা তাদের কোনো একটি শহরে যাওয়ার পর ফিরে আসার পথে দেয়ালে কাগজে আমাদের ছবি ঝুলে থাকতে দেখেছি। ওই বাজার দিয়ে যারা অতিবাহিত হয়েছে সবার ছবি তারা এঁকেছে। এমনকি কোনো মুসাফির কোনো কারণে পালিয়ে গেলে তাদের ছবি বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যাতে তাকে যেখানে পাওয়া যায় সেখান থেকে ধরে আনা যায়।

মুসাফিরদের জন্য সুযোগ-সুবিধা

যখন কোনো মুসলিম ব্যবসায়ী চীনে যান তিনি চাইলে কোনো মুসলিমের বাড়িতে থাকতে পারেন কিংবা সরাইখানায় থাকতে পারেন। চীনা কোনো মুসলিম ব্যবসায়ীর কাছে অবস্থান করলে তার মালপত্রের একটি তালিকা তৈরি করা হয়। সেই ব্যবসায়ীকে এসব মালপত্রের জামিনদার মনে করা হয়। চীনা ব্যবসায়ী এই মালপত্র থেকে যতটুকু প্রয়োজন খরচ করতে পারেন। যখন ওই মুসলিম ব্যবসায়ী চীন থেকে ফিরে যান তখন নিজের মালপত্রের হিসাব নেন। যদি মনে করেন চীনা ব্যবসায়ী তা থেকে কোনো কিছু খরচ করেছে, তাহলে তা পূরণ করে দেন। আর ওই ব্যবসায়ী সরাইখানায় থাকলে সব মালপত্র সরাইখানার তত্ত্বাবধায়কের কাছে সোপর্দ করে দেন। ওই ব্যবসায়ী কোনো ক্রীতদাসী রাখতে চাইলে সেটার ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়।

চীনে মুসাফিরদের নিরাপত্তাব্যবস্থা

এমনিভাবে তাকে নিজের অর্থকড়ি নষ্ট করতেও দেয় না। কেননা তারা বলে, আমরা এটা চাই না মুসলিমদের দেশে আমাদের বদনাম হোক। তারা এটা বলুক যে, অমুক ব্যবসায়ী চীনে গিয়েছিল, সে তার অর্থকড়ি খুইয়ে এসেছে।

চীনে মুসাফিরদের জন্য এই পরিমাণ নিরাপত্তা রয়েছে যে, সম্ভবত আর কোনো দেশে এটা নেই। যে কেউ একা একা অগণিত ধনসম্পদ নিয়ে মাসের পর মাস নির্ভয়ে সফর করতে পারে। এখানে প্রতিটি শহরে সরাইখানা আছে। এখানে একজন অফিসার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে অবস্থান করেন। মাগরিব অথবা ইশার পর ওই অফিসার সরাইখানায় আসেন। তার সঙ্গে একজন মুনশি (কেরানি) থাকেন। সরাইখানায় যত মুসাফির আছেন সবার নাম লেখেন। পরে সেই কাগজে সিলমোহর মারেন এবং সরাইখানা তালাবদ্ধ করে দেন। সকালে অফিসার আবার আসেন। সেই কেরানি তার সঙ্গে থাকেন। নাম ধরে ধরে সবাইকে ডাকেন এবং তাদের সঙ্গে থাকা অর্থকড়ি ও আসবাবপত্রের তালিকা করেন। পরে তার সঙ্গে কয়েকজনকে যুক্ত করে দেন এবং অন্য গন্তব্যে পাঠিয়ে দেন। সেখানকার সরাইখানার অফিসারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট আনতে হয় যে, আগন্তুকরা সবাই সেখানে পৌঁছেছে। গাইড ফিরে এসে সেই সার্টিফিকেট দেখাতে ব্যর্থ হলে তাকে এর জন্য দায়ী করা হয়।

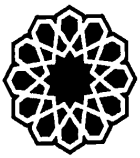

চীনের শহর-বন্দর

অভ্যাস ও প্রথা, অবস্থা ও ধরন, পন্থা-পদ্ধতি

প্রথম শহর যাইতুন

সমুদ্র পাড়ি দিয়ে যে শহরে আমরা প্রথম প্রবেশ করি সেটা যাইতুন। এই শহরে জাইতুনের (জলপাই) নামগন্ধও নেই। বরং সমগ্র চীন ও হিন্দুস্তানে জলপাই হয় না। এই শহরের নামই যাইতুন (জলপাই)। এটি অনেক বড় শহর। এই শহরে সিল্কের উন্নতমানের এক ধরনের কাপড় তৈরি হয়। এখানকার বন্দর বিশ্বের বড় বন্দরগুলোর একটি। সেখানে শ খানেক বড় জাহাজ নোঙর করা দেখেছি। আর ছোট জাহাজের কোনো হিসাব নেই। সমুদ্র থেকে একটি খাঁড়ি গিয়ে স্থলভাগে মিশেছে। গোটা চীনে প্রত্যেকের ঘরের সঙ্গে একটি বাগান ও ফাঁকা জায়গা রয়েছে। মধ্যখানে ঘর থাকে। এ কারণে চীনের শহরগুলো অনেক বড় বড়। মুসলিমরা পৃথক মহল্লায় বাস করে।

যখন আমি এই শহরে পৌঁছি তখন ওই আমিরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়ে যায়, যিনি বাদশাহর পক্ষ থেকে উপঢৌকন নিয়ে হিন্দুস্তানে গিয়েছিলেন এবং আমাদের সঙ্গে ফিরে এসেছিলেন। তার জাহাজও ডুবে গিয়েছিল। তিনি আমাকে সালাম করলেন এবং দেওয়ানের এক পরিচালকের কাছে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি দামি বাসস্থানে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কাজি তাজউদ্দিন আরাদবিলি, বিশিষ্ট বুযুর্গ শায়খুল ইসলাম কামালুদ্দিন আবদুল্লাহ ইস্পাহানি এবং বড় বড় ব্যবসায়ীরা এলেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। শারফুদ্দিন তাবরিযিও এলেন। তিনি ওই ব্যবসায়ীদের একজন যাদের হিন্দুস্তানে আমি যাদের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলাম এবং পরবর্তী সময়ে সেই ঋণ আদায় করেছিলাম। এই ব্যক্তি হাফেযে কুরআন ছিলেন এবং বেশির ভাগ সময় তেলাওয়াত করতে থাকতেন। যখন কোনো মুসলিম এসব ব্যবসায়ীর কাছে আসতেন তারা খুশিতে বাগবাগ হয়ে যেতেন। কেননা তারা অমুসলিম দেশে থাকেন এবং মুসলিম দেশগুলোর খবর শুনে উৎফুল্ল বোধ করেন। তারা মুসলিম দেশগুলো থেকে আগন্তুতকদের যাকাতের অর্থ দেন। তারা যখন নিজ দেশে ফিরে যায় তখন অনেক অর্থকড়ির মালিক হয়ে যান। এ সকল শায়েখের মধ্যে বোরহানুদ্দিন

কাযরুনিও আছেন। তার খানকা শহরের বাইরে। যেসব ব্যবসায়ী শায়খ আবু ইসহাক কাযরুনির জন্য মানত মানেন তারা তা শায়খ বোরহানুদ্দিনকে আদায় করেন। দেওয়ানের দায়িত্বশীল আমার পরিচয় জানতে পেরে তাদের সম্রাট কানকে লিখে পাঠালেন যে, আমি হিন্দুস্তানের বাদশাহর পক্ষ থেকে এসেছি।

জবাব আসা পর্যন্ত আমি ডাউয়েনের পরিচালককে বললাম, আমার সঙ্গে একজন গাইড দিন যিনি আমাকে সিনকালান[১] দেখাবেন, এটিও ওই এলাকাতেই ছিল। তিনি এই আবেদন মঞ্জুর করেন এবং একজন গাইড নিযুক্ত করে দেন। সেই গাইড আমাকে নিয়ে যান।

ক্যান্টন সফর

এভাবে আমরা ভ্রমণ করে সিনকালানে পৌঁছি, যাকে আরবিতে 'সিনুস সিন'ও বলা হয়। এখানে চীনামাটির পাত্র বানানো হয়। এখান থেকে 'আবে হায়াত' নদী গিয়ে সমুদ্রে মিশেছে। এটাকে 'দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থল' বলে। এটি চীনের শহরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়। এখানকার বাজারও অন্যান্য শহরের তুলনায় বড়। সবচেয়ে বড় বাজার চীনামাটির পাত্রের। এখান থেকে চীনামাটির পাত্র চীনের অন্যান্য শহর, হিন্দুস্তান ও ইয়েমেনে যায়।

শহরের মধ্যখানে একটি বড় মন্দির আছে। এর নয়টি দরজা। প্রত্যেক দরজার ভেতরে বেলকনি ও বারান্দা আছে, যেখানে ওই দরজার বাসিন্দারা বসে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দরজার মধ্যখানে অন্ধ ও অচলদের জন্য ঘর বানানো আছে। মন্দিরের আয় দিয়ে তাদের খাবার ও পোশাকের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে প্রত্যেক দরজার ভেতরে ঘর বানানো। ভেতরে গেলে রোগীদের চিকিৎসার জন্য একটি হাসপাতাল চোখে পড়ে। সেখানে একটি রান্নাঘরও আছে। হাসপাতালে চিকিৎসক ও কর্মচারী নিযুক্ত আছেন। আমি জেনেছি, যারা বার্ধক্যে উপনীত, কোনো উপার্জন করতে পারে না, এখান থেকে খাবার ও পোশাক পায়। এতিম ও বিধবারাও একই সুবিধা ভোগ করে।

এই শহরের এক পাশে মুসলিমরা বাস করে। তাদের জামে মসজিদ, খানকা ও বাজার পৃথক স্থানে। তাদের জন্য একজন কাজি ও শায়খুল ইসলামও

---

[১] ক্যান্টন।

নিযুক্ত আছেন। চীনের প্রতিটি শহরে 'শায়খুল ইসলাম' থাকেন। মুসলমানদের যাবতীয় দায়দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত থাকে। আর কাজি বিবাদ মীমাংসা করেন। আমি সেখানে আওহাদ উদ্দিন সানজারির বাড়িতে অবস্থান করছিলাম। এই ব্যক্তি অনেক সম্পদশালী ও গুণী মানুষ। তার কাছে চৌদ্দ দিন অবস্থান করি। কাজি ও মুসলিমরা প্রতিদিন আমার কাছে আসতেন এবং দাওয়াত করতেন। সেই দাওয়াতে কুরআনের কারী এবং গায়কদের ডাকা হতো। এই শহরের পরে মুসলিম বা অমুসলিম অধ্যুষিত কোনো শহর নেই। এখান থেকে ইয়াজুজ-মাজুজের[১] দেয়ালে যেতে ষাট দিন লাগে।

দুশো বছর বয়সী এক বিস্ময়কর ফকিরের সাক্ষাৎ

যখন আমি সিনকালায় ছিলাম, একদিন শুনলাম সেখানে একজন বৃদ্ধ লোক আছে যার বয়স দুশো বছর। তিনি খাবার খান না, কিছু পানও করেন না। প্রাকৃতিক প্রয়োজনও তার পূরণ করতে হয় না। জৈবিক চাহিদাও পূরণ করেন না। অথচ তার শক্তি-সামর্থ্য সবই আছে। তিনি শহরের বাইরে একটি গুহায় থাকেন। আমি সেখানে গেলাম। দেখলাম তিনি গুহার দরজায় বসে আছেন। শারীরিকভাবে হালকা-পাতলা, গায়ের রং একদম লাল। ইবাদতের (সাধনার) চিহ্ন তার চেহারায় ফুটে উঠছিল। আমি তাকে সালাম করলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন এবং ঘ্রাণ নিয়ে বলতে লাগলেন, তোমার কি মনে পড়ে, একটি দ্বীপে এক ব্যক্তির সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, যিনি দুটি মূর্তির মাঝখানে বসা ছিলেন। যিনি তোমাকে দশ দিনার দিয়েছিলেন। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমিই হলাম সেই বৃদ্ধ। আমি তার হাতে চুমু খেলাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গুহার ভেতর চলে গেলেন। আর বেরিয়ে এলেন না। আমারা অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর গুহার ভেতরে গেলাম, কিন্তু সেখানেও তাকে পাওয়া গেল না। পরে গুহার কাছে তার ঘনিষ্ঠ এক লোকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন, আপনারা চলে যান। আমরা বললাম, তার জন্য অপেক্ষা করব। তিনি বললেন, লাভ নেই, যদি বিশ বছরও অপেক্ষা করে তবুও তার সাক্ষাৎ আর পাবেন না।

---

[১] চীনের প্রাচীর।

আমি গিয়ে এই কথা শায়খুল ইসলাম, কাজি ও আওহাদ উদ্দিনকে বললাম। তারা বললেন, তিনি মুসাফিরদের সঙ্গে এমন আচরণই করেন। কেউ জানে না তার ধর্ম কী। আর যে ব্যক্তিকে আপনি তার ঘনিষ্ঠ লোক মনে করেছেন মূলত তিনি ওই ব্যক্তিই ছিলেন। তারা বলেন, এই ব্যক্তি পঞ্চাশ বছর এখান থেকে উধাও ছিলেন। গত এক বছর ধরে আবার এসেছেন। বাদশাহ, উযির ও আমিররা তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন। তিনি প্রাচীন যুগের কথাবার্তা বলেন। আমাদের নবীজির আলোচনাও করেন। তিনি বলেন, আমি যদি ওই যুগে থাকতাম তাহলে তাঁকে সাহায্য করতাম।

খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব ও খলিফা আলী ইবনে আবি তালিবের অনেক প্রশংসা করেন। তবে ইয়াযিদের অনেক সমালোচনা করেন। মুয়াবিয়াকেও ভালো জানেন না। তারা এই ফকির সম্পর্কে বিস্ময়কর সব তথ্য দিলেন। এই দেশের লোকদের বিশ্বাস হলো, ওই ফকির মুসলিম। তবে কেউ তাকে নামায পড়তে দেখেনি। রোযা তো বারো মাসই রাখেন। পরদিন আমি যাইতুন শহরে ফিরে আসি। ইতিমধ্যে সম্রাট কানের নির্দেশ এসে পৌঁছেছে যাতে আমাকে দরবারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে জলপথে হোক কিংবা স্থলপথে। আমি বললাম, আমি নৌপথেই যাব। আমার উপযোগী একটি জাহাজ প্রস্তুত করা হলো। গভর্নর আমার সঙ্গে লোক নিযুক্ত করে দিলেন। এখানকার কাজি ও অন্যান্য মুসলিম ব্যবসায়ীরা অনেক পাথেয় এবং উপঢৌকন দিলেন।

কানজানফু শহরে

দশ দিন সফরের পর আমরা কানজানফু শহরে পৌঁছি। এটি অনেক বড় শহর। বিস্তৃত এলাকাজুড়ে এর অবস্থান। এর চারপাশে বাগান আছে। যা দেখে দামেশকের ঘুতার (বাগানবেষ্টিত শহর) কথা মনে পড়ল। আমরা যখন সেখানে পৌঁছি সেখানকার কাজি, শায়খুল ইসলাম ও মুসলিম ব্যবসায়ীরা বাদ্যযন্ত্র ও গান-বাজনা সহকারে আমাদের স্বাগত জানান। বাহনের জন্য ঘোড়াও নিয়ে আসেন। কাজি ও শায়খুল ইসলাম ঘোড়ায় চড়লেন আর বাকিরা ছিল পদাতিক। শহরের গভর্নর ও কর্মকর্তারাও আমাদের অভ্যর্থনার জন্য এগিয়ে এলেন। কারণ তারা বাদশাহর মেহমানকে অনেক সম্মান ও মূল্যায়ন করেন। আমরা শহরে প্রবেশ করলাম। এই

শহরের চারটি প্রাচীর রয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রাচীরের মধ্যখানে বাদশাহর ক্রীতদাস ও চৌকিদাররা থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রাচীরের মধ্যখানে সেনাবাহিনী ও শহরের গভর্নর থাকেন। তৃতীয় প্রাচীরের ভেতরে মুসলমানদের বসবাস। সেখানে আমরা শায়খ জহিরুদ্দিন কারলানির বাড়িতে অবস্থান করলাম। চতুর্থ প্রাচীরের ভেতরে চীনারা থাকে। এটি সবচেয়ে বড় জনপদ। এই শহরের চারটি দরজা রয়েছে। প্রতিটি দরজার মধ্যখানে তিন মাইলের দূরত্ব। প্রত্যেকের বাগান, বাড়ি ও জমি একসঙ্গে।

এক দেশীয়র সঙ্গে চীনে সাক্ষাৎ

আমি একদিন জহিরুদ্দিন কারলানির বাড়িতে অবস্থান করছিলাম। এ সময় আলিশান একটি জাহাজ এসে ভিড়ল। এটির মালিক একজন ফকিহ। বলা হলো, কেউ আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চান। তার নাম কাওয়ামুদ্দিন সাবতি। আমি বিস্মিত হলাম, এই ব্যক্তি আবার কে! তিনি ঘরে এলেন এবং সালাম করলেন। তিনি যখন বসলেন তখন আমার মন বলছিল, তিনি আমার পূর্বপরিচিত। আমি গভীরভাবে তাকে দেখতে লাগলাম। তিনি বললেন, আমাকে এমনভাবে দেখছেন মনে হচ্ছে চিনেন! আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোন শহর থেকে এসেছেন? তিনি বললেন, সাবতা থেকে। আমি বললাম, আমি তাবকার অধিবাসী। এই কথা শুনে তিনি আমাকে নতুন করে সালাম দিলেন এবং কান্নায় ভেঙে পড়লেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি কখনো হিন্দুস্তানে গিয়েছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি দিল্লি গিয়েছিলাম। তার এই কথা শুনে আমার মনে পড়ে গেল। আমি বললাম, আপনি কি বুশরি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি দিল্লিতে তার মামা আবুল কাসিম মুরসির সঙ্গে এসেছিলেন। তিনি তখন যুবক বয়সী ছিলেন। তখনো দাড়ি গজায়নি। খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। মুয়াত্তা কিতাবটি মুখস্থ ছিল। আমি তাকে হিন্দুস্তানের বাদশাহকে সালাম দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলাম। বাদশাহ তাকে তিনশ দিনার হাদিয়া দিয়েছিলেন এবং তাকে দিল্লিতে অবস্থান করতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি সেখানে থাকতে সম্মত হননি। পরে চীনে চলে আসেন। চীনে এসে তিনি অনেক সম্পদ ও প্রতিপত্তির অধিকারী হন। আমাকে বলছিলেন, তার পঞ্চাশজন ক্রীতদাস আছে এবং একই পরিমাণ বাঁদিও আছে। তিনি দুজন ক্রীতদাস এবং দুজন বাঁদি আমার জন্য উপহার হিসেবে পাঠালেন। পরবর্তী সময়ে তার ভাইয়ের

সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে সুদানে। দুই ভাইয়ের মধ্যে এই পরিমাণ দূরত্বে আমি বিস্মিতবোধ করেছিলাম।

কানজানফু শহরে পনেরো দিন থেকে আমি সেখান থেকে চলে আসি। চীনের শহর যদিও অনেক সুন্দর, কিন্তু আমার মন বসেনি। সেখানে অমুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ঘরে থেকে বের হলে অনেক নোংরা দৃশ্য দেখতে হয়। এজন্য আমার মন বিতৃষ্ণা হয়ে যায়। আমি সেখানে অবস্থানকালে বেশির ভাগ সময় ঘরেই বসে থাকতাম। শুধু প্রয়োজনের মুহূর্তে বাইরে বের হতাম। কোনো মুসলিম দেখলে অন্তর খুশি হয়ে যেত। এই ফকিহ আমাকে (কাওয়ামুদ্দিন সাবতি) চার মঞ্জিল পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

খানসা শহর

সতেরো দিন সফরের পর খানসা শহরে পৌঁছি। এই শহরটি আরবের একজন নারী কবির নামে। জানা যায়নি, এই শব্দটি আরবি থেকে নেওয়া হয়েছে নাকি ঘটনাক্রমে একই শব্দ দুই ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে। এই শহরটি এত বড় যে, এমন বড় শহর আমি গোটা দুনিয়ায় কোথাও দেখিনি। এর দৈর্ঘ্য তিন মনজিল। দালান-কোঠাগুলো চীনের মতোই। প্রত্যেকের ঘরের সঙ্গে বাগান ও ক্ষেত-খামার আছে। এই শহরের ছয়টি অংশ। আমরা যখন সেখানে পৌঁছি সেখানকার কাজি ফখরুদ্দিন, শায়খুল ইসলাম, উসমান বিন আফফান মিশরির বংশধর যারা এখানকার মুসলিমদের নেতৃস্থানীয়, সাদা পতাকা ও বাদ্যযন্ত্রসহ আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসেন। শহরের গভর্নর সুসজ্জিত হয়ে আমাকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসেন। আমরা সবাই একসঙ্গে শহরে প্রবেশ করি। সীমানা প্রাচীরের ভেতর ছয়টি শহরের অবস্থান।

প্রতিটি শহরের প্রাচীর ভিন্ন ভিন্ন। প্রথম শহরে চৌকিদার, পাহারাদার ও তাদের সর্দার থাকেন। কাজি এবং অন্যরা আমাকে বলেছেন, তাদের সংখ্যা বারো হাজারের মতো। রাতে আমরা গভর্নরের বাসায় অবস্থান করি। পরদিন আমরা অন্য শহরে যাই। সেই শহরে ইহুদি, খ্রিস্টান এবং সূর্যের পূজা করে যারা তাদের সংখ্যা বেশি। সেই শহরের গভর্নর চীনা নাগরিক। দ্বিতীয় রাত আমরা তার কাছে অবস্থান করি।

আমরা তৃতীয় আরেকটি শহরে যাই। সেখানে মুসলিমরা বাস করে। এখানকার বাজার ও ঘরবাড়ি মুসলিম শহরের মতো বিন্যস্ত। শহরে অনেক মসজিদ রয়েছে। আমরা যখন শহরে প্রবেশ করি তখন মুয়াযযিন যোহরের আযান দিচ্ছিলেন। আমরা উসমান ইবনে আফফান মিশরির ঘরে অবস্থান করি। তিনি একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। এই শহরটি তার পছন্দ হয়। এখানেই তিনি বসবাস শুরু করেন। তার নামেই এই শহর পরিচিতি পায়। তার ছেলেও অনেক মর্যাদার অধিকারী। তিনিও তার বাবার মতো ফকির-মিসকিনদের অনেক দান-খয়রাত করেন। তাদের একটি খানকা আছে, যাকে উসমানিয়া বলা হয়। এর ইমারতগুলো অনেক আলিশান। এখানে সুফিরা অবস্থান করেন। এই উসমান শহরে জামে মসজিদও বানিয়েছেন। এই মসজিদের জন্য অনেক জমি ওয়াকফ করে দেন। এখানে অনেক মুসলিম বসবাস করে। আমি তাদের কাছে পনেরো দিন অবস্থান করি। প্রত্যেক দিন ও রাতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বাড়িতে মেহমানদারির ব্যবস্থা করা হয়। কেউ এক ধরনের খাবার খাওয়ালে অন্যরা ভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা করত। প্রতিদিন আমাদেরকে বাহনে চড়িয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে নিয়ে যেত।

একদিন আমরা ঘুরতে ঘুরতে চতুর্থ শহরে যাই। এটি রাজধানী। সেখানকার গভর্নর কুরতি এই শহরে থাকেন। এই শহরে যাওয়ার পর আমার সাথীসঙ্গীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। সেখানকার উযির আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং আমাকে কুরতির ঘরে নিয়ে যান। তিনি আমার কাছ থেকে সেই রুমালটি নিয়ে যান যা আমাকে শায়খ জালালুদ্দিন তাবরেযি দিয়েছিলেন। যার আলোচনা পেছনে করেছি। এই শহরে শুধু বাদশাহর ক্রীতদাস ও খাদেমরা থাকে। ছয়টি শহরের মধ্যে এই শহরটি সবচেয়ে সুন্দর। এই শহরের মধ্যখান দিয়ে তিনটি নদী প্রবাহিত হয়েছে। একটি বড় নদীর শাখা। এটা দিয়ে ছোট ছোট নৌকা শহরে প্রবেশ করে। এসব নৌকা দিয়ে খাদ্যসামগ্রী এবং জ্বালানির পাথর আনা হয়। ভ্রমণের জন্য এছাড়াও ছোট নৌকা রয়েছে। রাজমহলের চত্বর শহরের মাঝখানে। এই ময়দানটি অনেক প্রশস্ত। গভর্নরের ঘর মধ্যখানে আর চার দিকে খোলা ময়দান। এখানে দালান রয়েছে, যেখানে কারিগররা উন্নতমানের কাপড় ও অস্ত্র বানায়।

আমির কুরতি তাদের সংখ্যা ষোলশ বলেছিলেন। এটি শুধু উস্তাদদের সংখ্যা। প্রত্যেক উস্তাদের অধীনে তিন/চারজন করে শিষ্য রয়েছে। তারা

সবাই সম্রাট কানের ক্রীতদাস। তাদের পায়ে বেড়ি পরানো আছে। তাদের থাকার ঘর রাজপ্রাসাদের বাইরে। তারা বাজার পর্যন্ত যেতে পারে। কিন্তু দরজা পর্যন্ত যেতে পারে না। সেখানে থেকে প্রতিদিন একশ একশ করে আমিরের সামনে হাজির করা হয়। কেউ অনুপস্থিত থাকলে আমির তাকে তলব করেন। সেখানকার নিয়ম হলো, যখন কোনো ক্রীতদাস দশ বছর সেবা দেয় তখন তার পায়ের বেড়ি খুলে দেওয়া হয়। তখন তাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়, চাইলে মুক্ত অবস্থায় কাজ করতে পারবে চাইলে সম্রাটের আওতাধীন কোনো এলাকায় গিয়েও বসবাস করতে পারবে। তবে কোনোভাবেই সম্রাটের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার বাইরে যেতে পারবে না। পঞ্চাশ বছর বয়স হয়ে গেলে কাজ থেকে তাদের অবসর দিয়ে দেওয়া হয়। তাদের জন্য ভাতা নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। যখন কারো বয়স ষাট বছর হয়ে যায় তখন তাদের শিশুর মতো মনে করা হয় এবং তাদের ওপর কোনো নির্দেশ আরোপ করা হয় না।

চীনে প্রবীণদের অসম্ভব সম্মান করা হয়। তাদেরকে 'আতা' অর্থাৎ বাবা বলে সম্বোধন করে। আমির কুরতি চীনের আমিরদের আমির। তিনি তার বাড়িতে আমাদের দাওয়াত করেন। দাওয়াতকে তারা 'তুয়া' বলে। সেই দাওয়াতে শহরের বিশিষ্টজনেরা আসেন। মুসলিম বাবুর্চি ডাকা হয়। তাদের জবাই করা গোশত রান্না করা হয়। এই শীর্ষ আমির নিজ হাতে আমাদের খাইয়ে দেন। গোশত টুকরো টুকরো করে আমাদের পাতে তুলে দেন। তিনি তিন দিন পর্যন্ত আমাদের মেহমানদারি করেন এবং নিজের ছেলেকে আমাদের সঙ্গে নদীতে ভ্রমণে পাঠান। আমরা একটি নৌকায় চড়ি আর আমিরের ছেলে চড়েন আরেকটি নৌকায়। আমিরের ছেলের সঙ্গে গায়ক ও বাদ্যযন্ত্র ছিল। তারা চীনা, আরবি ও ফারসি ভাষায় গান গাইছিল। আমিরের ছেলে ফারসি গান পছন্দ করতেন। যখন গায়কেরা ফারসি গান গাইত তখন আমিরের ছেলে তাদের অনুরোধ করতেন আরেকবার গাওয়ার জন্য। ফারসি শের (কবিতা) যা তারা গাইত শুনতে শুনতে আমার মুখস্থ হয়ে যায়। সেই শেরের সুর খুবই মনোমুগ্ধকর।

নদীর সেই শাখায় অনেক নৌকা ছিল। সেগুলোর মাস্তুল ছিল রঙিন। আর দাঁড় ছিল রেশমের। নৌকায় নানা ধরনের কারুকাজ করা ছিল। নৌকার লোকেরা পরের ওপর লেবু ও নারিকেল ছুড়ে মারছিল। সন্ধ্যায় আমরা

আমিরের ঘরে ফিরে আসি এবং রাতে সেখানে আরাম করি। গায়কদের ডাকা হয়। তারা চমৎকার সব গান গায়।

পিকিং শহরে প্রবেশ

বিশার শহর, বিস্ময়কর সুবিধা, রাজপ্রাসাদ

খাকান: চীনের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব

সকালে আমরা পঞ্চম শহরে যাই। এটি সবচেয়ে বড় শহর। এখানে জনসাধারণ বসবাস করে। এখানকার বাজার অনেক উন্নত। এখানে সব ধরনের শিল্প রয়েছে। এই শহরে উন্নতমানের কাপড় তৈরি হয়। এখানে দারুণ প্লেট বানানো হয়, যাকে তাশত বলে।

চীনে বাঁশের বিস্ময়কর শিল্প

এই তাশত বানানো হয় বাঁশ দ্বারা। অনেক দক্ষতার সঙ্গে বাঁশের টুকরো জোড়া লাগানো হয়। পরে লাল চকচকে আঠাযুক্ত তেল এর ওপরে দেওয়া হয়। দশটি করে পাত্র একটির ওপরে আরেকটি রাখা হয়। এই পরিমাণ পাতলা হয় যে, দেখে মনে হয় একটি মাত্র পাত্র। বাঁশ দ্বারা প্লেট বানানো হয়। ওপর থেকে ফেলে দিলেও সেই প্লেট ভাঙে না। গরম খাবার রাখলেও রং পাল্টে যায় না। এই প্লেট হিন্দুস্তান, খুরাসান ও অন্যান্য দেশে রপ্তানি হয়।

আমরা যখন এই শহরে পৌঁছি তখন আমিরের পক্ষ থেকে আমাদের মেহমানদারি করা হয়। দ্বিতীয় দিন আমরা একটি দরজায় প্রবেশ করি যাকে 'কিশতিবানুর' দরজা বলা হয়। এটি ষষ্ঠ শহরের দরজা। এখানে মাঝিমাল্লা, মৎস্যজীবী, কামার, সিপাহি, তিরন্দাজ ও পদাতিক সেনারা থাকে। তারা সবাই পুরুষ এবং বাদশাহর ক্রীতদাস। তাদের ছাড়া এই শহরে আর কেউ থাকে না। তাদের সংখ্যাও অনেক। এই শহরটি একটি বড় নদীর তীরে। সেখানেও আমরা রাত কাটাই। আমিরের পক্ষ থেকে আমাদের মেহমানদারি করা হয়। আমির কুরতি আমাদের জন্য একটি জাহাজ প্রস্তুত করেন। প্রয়োজনীয় পাথেয় এবং অন্যান্য আসবাবপত্র সেখানে রাখেন। আমিরের চাকর সেখানে আমাদের মেহমানদারির জন্য অবস্থান করছিলেন। এই শহর থেকে আমরা দ্রুতই ফিরে আসি। এটি চীনের সর্বশেষ শহর।

এরপর আমরা খান বালিকে[১] পৌঁছি। এই শহরকে খানফুও বলা হয়। এই শহর কানের রাজধানী। আর কান চীন ও খাত্তার বাদশাহ। যখন শহর থেকে দশ মাইল দূরে আমরা নোঙর ফেলি এবং নৌপ্রধানকে আমাদের ব্যাপারে চিঠি পাঠানো হয়, তখন সেখান থেকে অনুমতি আসে। আমরা বন্দরে প্রবেশ করি এবং শহরে অবস্থান নিই। এটি দুনিয়ার বড় শহরগুলোর একটি। চীনের শহরের মতো এই শহর বিন্যস্ত নয়। অর্থাৎ, বাগান ও ক্ষেত শহরের মধ্যখানে নয়। বরং আমাদের শহরগুলোর মতো বাগান শহরের বাইরে এবং বাদশাহর রাজপ্রাসাদ মধ্যখানে।

আমি বোরহানুদ্দিন সাগেরজির কাছে অবস্থান করি। তিনিই ওই ব্যক্তি যার কাছে হিন্দুস্তানের বাদশাহ চল্লিশ হাজার দিনার পাঠিয়েছিলেন এবং তাকে হিন্দুস্তানে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শায়খ হিন্দুস্তানে যাওয়ার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। তবে উপহার গ্রহণ করে তা দ্বারা নিজের ধারকর্জ পরিশোধ করেন। পরে চীনে চলে আসেন। এখানে সম্রাট কান তাকে চীনের সব মুসলিমের শায়খ বানিয়ে 'সদরে জাহাঁ' উপাধিতে ভূষিত করেন। কান এখানে বাদশাহর উপাধি। যেমন লুরিস্তানের বাদশাহকে বলা হয় আতাবুক। কানের প্রকৃত নাম ছিল পাশায়ি। অমুসলিমদের মধ্যে আর কোনো বাদশাহর অধীনে এত রাষ্ট্র ও এলাকা ছিল না, যে পরিমাণ কানের ছিল। তার রাজপ্রাসাদ ছিল শহরের মধ্যখানে। বেশির ভাগ স্থাপনা রং করা এবং কারুকার্যময়। এগুলোর সাজসজ্জাও বিস্মিত হওয়ার মতো।

সাতটি দরজার পর প্রাসাদে প্রবেশ করতে হয়। প্রথম দরজায় কোতোয়াল বসা থাকে। তিনি প্রহরীদের প্রধান। দরজার ডান ও বাঁ পাশে চত্বর রয়েছে। সেখানে প্রহরীরা বসা থাকে। সংখ্যায় তারা পাঁচ/ছয়শ। শুনেছি আগে এই সংখ্যা ছিল এক হাজার। দ্বিতীয় দরজায় তিরন্দাজ সেনারা বসা। তাদের সংখ্যাও পাঁচশ। তৃতীয় দরজায় বর্শাধারীরা বসা। তাদের সংখ্যাও পাঁচশ। চতুর্থ দরজায় তলোয়ারধারীরা বসা। যাদের কাছে তলোয়ার ও ঢাল রয়েছে। পঞ্চম দরজায় উযিরের কার্যালয়। এখানে অনেক ইমারত ও কামরা রয়েছে। সবচেয়ে বড় কামরাটিতে একটি উঁচু শাহি আসনে উযির বসা থাকেন। তাকে 'মুসফাদ' বলা হয়। উযিরের সামনে স্বর্ণের একটি বড় দোয়াত রাখা থাকে। তার সামনে প্রাইভেট সেক্রেটারির কামরা। তার ডান পাশে দূতদের

---

[১] বর্তমান বেইজিং।

বিভাগীয় কার্যালয়। উযিরের কামরার ডান পাশে জেনারেল কর্মকর্তারা বসেন। এসব কামরার বিপরীতে আরো চারটি কামরা রয়েছে। এর একটিকে দেওয়ানুল আশরাফ বলা হয়। যেখানে মাশরাফ অর্থাৎ কন্ট্রোলার জেনারেল বসেন। দ্বিতীয় কামরাটি দেওয়ানে বাকায়া, যেখানে আমির ও আলেমদের থেকে জর্ডান এলাকার জায়গিরের বকেয়া আদায় করা হয়। তৃতীয় কামরাটি দেওয়ানে ইস্তেগাছা, সেখানে একজন বড় আমির ফকিহ ও মুনশিদের সঙ্গে বসা থাকেন। এখানে মজলুম লোকেরা ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য আসে। চতুর্থ কামরাটি ডাক বিভাগের কার্যালয়, এখানে ডাক বিভাগের অফিসার বসেন। ষষ্ঠ দরজায় পুলিশ ও এই বিভাগের অফিসাররা অবস্থান করেন। সপ্তম দরজায় ক্রীতদাসরা বসা থাকে। সেখানে তিনটি কামরা আছে। একটি হাবশি ক্রীতদাস, দ্বিতীয়টিতে হিন্দি ক্রীতদাস এবং তৃতীয়টিতে চীনা ক্রীতদাস বসা থাকে। তাদের প্রত্যেক গ্রুপের অফিসার হন চীনা নাগরিক।

খাকান : চীনের আকর্ষণীয় ও বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব

যখন আমরা খাকান বালিকে পৌঁছি তখন খাকান সেখানে ছিলেন না। তার চাচাতো ভাই ফিরোজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। যিনি রাজধানী থেকে তিন মাসের দূরত্বে ক্যাথির একটি এলাকা কারাকোরাম ও বিশ-বালিগে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

সদরে জাহাঁ বোরহানুদ্দিন সাগেরি আমাকে বললেন, যখন কান তার বাহিনী জড়ো করেন সেখানে একশ বাহিনী ছিল। এক একটি বাহিনীতে দশ হাজার অশ্বারোহী ছিল। প্রত্যেক বাহিনীর সর্দারকে 'আমিরে তোমান' বলা হয়। বাদশাহর বিশেষ বাহিনী এবং চাকরের সংখ্যা এর বাইরে। তারাও সংখ্যায় ছিল পঞ্চাশ হাজার। পদাতিক সেনাও ছিল পাঁচ লাখের মতো। যখন কান বাইরে বের হলেন বেশির ভাগ আমির তার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কারণ তিনি চেঙ্গিস খানের নীতিতে অনেক পরিবর্তন আনেন। এই সেই চেঙ্গিস খান যিনি মুসলিম দুনিয়াকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিলেন। বিদ্রোহী আমিররা তার চাচাতো ভাই ফিরোজের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হন এবং কানকে লিখে পাঠান, তিনি যেন সালতানাত থেকে দূরে সরে যান এবং ক্যাথিকে জায়গির হিসেবে মেনে নিয়ে সেখানে বসবাস করতে পারেন। সম্রাট কান তা মঞ্জুর করেননি। বরং তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং লড়াই করতে করতে মারা যান।

আমরা যখন রাজধানীতে পৌঁছি তখন সেখানে এই খবর এসে পৌঁছে। শহর সজ্জিত করা হয়। গান-বাদ্য বাজানো শুরু হয়। এক মাস পর্যন্ত নাচ-গান হতে থাকে। এরপর নিহত কান, তার ভাই, আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠজনদের লাশ আনা হয়, যাদের সংখ্যা প্রায় একশ। একটি বড় গর্ত খোঁড়া হয় এবং সেখানে দামি দামি বিছানা বিছানো হয়। সেখানে কানের লাশ তার অস্ত্রশস্ত্রসহ রেখে দেওয়া হয়। তার সোনা-রুপার পাত্র, চার বাঁদি, ছয় ক্রীতদাস, যাদের সঙ্গে পানি পানের পাত্র ছিল, তাদেরও ওই কবরে রাখা হয়। ওপরে একটি দরজা বানিয়ে তা মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এর ওপরে একটি উঁচু টিলা বানানো হয়। এরপর চারটি ঘোড়া আনা হয়। তাদেরকে এই কবরের চারপাশে এমনভাবে দৌড়ানো হয় যে, ঘোড়াগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়ে। পরে ঘোড়াগুলোকে কাঠের তৈরি লম্বা গোজ ভরে দিয়ে হত্যা করা হয়। সবশেষ সমাধির ওপরে ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে কানের আত্মীয়স্বজনদের জন্যও একই ধরনের কবর খনন করা হয়। সঙ্গে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও পাত্রও কবরে রাখা হয়। সেখানেও তিনটি ঘোড়া মেরে ঝুলিয়ে রাখা হয়। সেদিন শহরের সব নারী-পুরুষ, মুসলিম-অমুসলিম শোকের পোশাক পরে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অমুসলিমরা সাদা চাদর এবং মুসলিমরা সাদা পোশাক পরেছিল। কানের স্ত্রীরা ও ঘনিষ্ঠজনেরা চল্লিশ দিন পর্যন্ত কবরের পাশে তাঁবুতে অবস্থান করেন, কেউ কেউ বছরখানেক সেখানে থাকেন। তাদের জন্য সেখানে একটি বাজার বসে। যে জিনিসের প্রয়োজন হয় তারা সেখান থেকে কিনতে পারে।

এই রেওয়াজ তখন আর কোনো দেশে প্রচলিত ছিল না। ভারতীয় ও চীনা অমুসলিমরা তাদের মৃতদেহ জ্বালিয়ে দেয়। আর বাকি সব জাতি তাদের মরদেহ দাফন করে। কিন্তু জীবিত কাউকে তাদের সঙ্গে দাফন করে না।

যখন সম্রাট কান মারা গেলেন এবং তার চাচাতো ভাই ফিরোজ বাদশাহ হলেন তখন তিনি কারাকোরামকে রাজধানী করলেন। কেননা এই শহর তার চাচা মাওয়ারাউন নাহার ও তুর্কিস্তানের বাদশাহর রাজত্বের কাছাকাছি। কিছু দিন পর কানের প্রতি অনুগত কয়েকজন আমির ফিরোজের সঙ্গে বিদ্রোহ করেন এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। শায়খ বোরহানুদ্দিনসহ শোভাকাঙ্ক্ষীরা আমাকে বললেন, আপনি চীনে ফিরে যান। অন্যথায় বিশৃঙ্খলা আরো বাড়তে থাকবে। তখন ফিরে যাওয়া কঠিন হবে। তারা আমাকে বাদশাহ

ফিরোজের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি আমার সঙ্গে ত্রিশজনকে পাঠান এবং তাদেরকে আমার মেহমানদারি করার নির্দেশ দেন। আমি দ্রুত খাত্তার দিকে ফিরে আসি। সেখান থেকে খানসা, এরপর খানজানফু, সেখান থেকে যাইতুনে ফিরে আসি।

চীন থেকে জাওয়া এরপর কালিকোট

জাওয়ার সুলতানের স্থলাভিষিক্তের বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

জাহাজ হিন্দুস্তান সফরের জন্য প্রস্তুত ছিল। এর মধ্যে একটি জাহাজ ছিল মালিক জাহের শাহ জাওয়ার। জাহাজের নাবিকরা ছিলেন মুসলিম। তারা আমাকে চিনে ফেললেন। তারা আমাকে পেয়ে খুব খুশি হলেন। দশ দিন পর্যন্ত আবহাওয়া ছিল অনুকূলে। যখন আমরা তাওলিসির কাছে পৌঁছি তখন আবহাওয়া প্রতিকূল হয়ে যায় এবং চারদিক অন্ধকার হয়ে আসে। শুরু হয় ঝড়-বৃষ্টি। দশ দিন পর্যন্ত সূর্যের দেখা মিলেনি। পরে আমরা এমন সমুদ্রে প্রবেশ করি যে সমুদ্র আর কখনো দেখিনি। জাহাজের নাবিকরা ভয় পেয়ে গেল। তারা চীনের দিকে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করল। কিন্তু এটাও সম্ভব হলো না। তেতাল্লিশ দিন পর্যন্ত আমরা সমুদ্রে ভাসতে থাকলাম।

আরেকবার জাওয়ায় ফিরে আসা

দুই মাস পর আমরা জাওয়ায় ফিরে আসি এবং সুমাত্রায় অবতরণ করি। এখানকার বাদশাহ মালিক জহির জিহাদ করে ফিরে এসেছেন এবং যুদ্ধলব্ধ অনেক মালামাল পেয়েছেন। আমার জন্য দুজন বাঁদি এবং দুজন ক্রীতদাস পাঠিয়ে দেন। তার ছেলের বিয়েতে আমি শরিক হই। তার ভাইয়ের মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে হয়। রাজপ্রাসাদের মধ্যখানে একটি বড় স্টেজ নির্মাণ করা হয়। রেশমের কাপড় দিয়ে এটা ঢেকে দেওয়া হয়। কনেকে স্টেজে নিয়ে আসা হয় এবং তার মুখ খোলা ছিল। তার পাশে ছিল চল্লিশজন বেগম, যারা বাদশাহ ও আমিরদের স্ত্রী। তাদের সবার মুখ খোলা ছিল। তাদের প্রত্যেকের চেহারায় ছিল আভিজাত্যের ছাপ। সেখানকার নারীরা শুধু বিয়ের দিন চেহারা খোলা রাখে, অন্যান্য সময় চেহারা ঢেকে রাখে। কনে স্টেজে উঠে বসে গেলেন। তার সামনে গান-বাদ্য শুরু হলো। বর এলেন হাতিতে চড়ে। হাতি ছিল সজ্জিত। এর পিঠের ওপর একটি আসন পাতা ছিল। বরের মাথার ওপর গোল একটি ছাতা ছিল, যা কনের মুকুটের মতো। বরের ডানে

ও বাঁয়ে আমির ও বাদশাহদের শ খানেক শাহজাদা ছিলেন। তাদের সবার পোশাক ছিল সাদা। মাথায় ছিল জড়ি। সুসজ্জিত ঘোড়ার ওপর সবাই সওয়ার ছিলেন। তারা ছিলেন বরের সমবয়সী। তাদের কারো দাড়ি গজায়নি।

যখন বর প্রবেশ করলেন তখন উপস্থিত লোকজনের ওপর দিনার-দিরহামের বৃষ্টি বর্ষিত হলো। বাদশাহ এক জায়গায় বসে এসব দৃশ্য দেখছিলেন। তার ছেলে হাতির ওপর থেকে নেমে গিয়ে বাদশাহর পা ছুঁয়ে সালাম করলেন এবং এরপর স্টেজে গিয়ে বসলেন। তাকে দেখে কনে উঠে দাঁড়ালেন এবং তার হাতে চুমু খেলেন। পরে তারা পাশাপাশি বসলেন। বেগমরা পাখা দিয়ে বাতাস করছিলেন। পরে পান-সুপারি আনা হলো। পরে বর পানের কিলি নিয়ে কনের মুখে দিলেন এবং কনেও তাই করলেন। সবগুলো আনুষ্ঠানিকতাই ঘোষণা দিয়ে দিয়ে করা হচ্ছিল। পরে কনেকে পর্দা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। তারা স্টেজেই বসা রইলেন। স্টেইজসহ তাদের অন্দরমহলে নিয়ে যাওয়া হয়। খাওয়াদাওয়া শেষে লোকজন চলে যায়।

পরদিন অনেক লোক জড়ো হন। বাদশাহ তার ছেলেকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নির্বাচন করেন। লোকেরা তার হাতে বাইআত হন এবং তাকে কাপড় ও স্বর্ণ হাদিয়া হিসেবে দেন। সেই দ্বীপে আমি দুই মাস অবস্থান করি। বাদশাহ আমাকে অনেকগুলো উদ, কর্পূর, লং, চন্দন উপহার হিসেবে দেন। আমি জাহাজে চড়ে চল্লিশ দিন পর কুলিমে পৌঁছি। কাজি কুযাইনির বাড়ির পাশে অবস্থান করি। তখন ছিল রমযান মাস। আমি ঈদের নামায সেখানকার মসজিদে আদায় করি। সেখানকার লোকেরা রাত থেকে মসজিদে এসে বসে থাকে। সকাল পর্যন্ত যিকির করে। পরে সকাল থেকে নিয়ে ঈদের নামায পর্যন্ত যিকিরে ব্যস্ত থাকে। পরে নামায পড়ে এবং খুতবা শুনে চলে যায়। কুলিম থেকে আমি কালিকোটে আসি। এখানে কিছু দিন থেকে আমি দিল্লি যাওয়ার ইচ্ছা করি। কিন্তু আতঙ্ক বোধ করি এবং যাওয়ার ইচ্ছা বাদ দিই।[১]

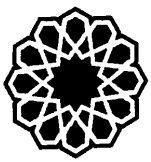

[১] হত্যাকারীর এলাকা অতিক্রমের সময় ভয় লাগারই কথা।

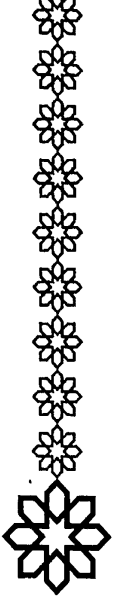

নতুন গন্তব্যের পথে যাত্রা

০

আরব, ইরান, শাম

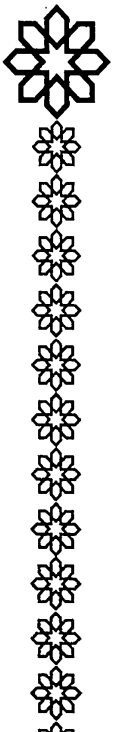

মাস্কাট ও অন্যান্য স্থান ভ্রমণ

৪৮ দিন পর জাফারে পৌঁছলাম সেটি ছিল ৭৪৮ হিজরির ১০ তারিখ। সেখানকার খতিব ঈসা তাঁতারের ঘরে অবস্থান করি। তখন সেখানকার বাদশাহ ছিলেন নাসির, যিনি মালিক মুঈদের ছেলে। যখন আমি প্রথমবার এখানে এসেছিলাম তখন তিনি (মুঈদ) ছিলেন এখানকার শাসক। বাদশাহর সহযোগী সাইফুদ্দিন উমর আমির জুনদার ছিলেন তুর্কি। বাদশাহ আমাকে কয়েক দিন রেখে দেন এবং অনেক খাতির-যত্ন করেন। সেখান থেকে সমুদ্রপথে মাস্কাট যাই। এটি একটি ছোট শহর। পরে আমরা কুরিয়াত (ওমান) যাই। সেখান থেকে বিভিন্ন স্থান হয়ে রাহবা শহরে পৌঁছি। এই শহরটি মালিক বিন তোসের নামে পরিচিত। রাহবা শহরটি ইরাকের ছোট শহরগুলোর একটি। এটি শামের প্রথম শহর। সেখান থেকে সাখনায় পৌঁছি। এটি মনোরম একটি শহর। এখানকার বেশির ভাগ অধিবাসী খ্রিস্টান। এখানে মাটি থেকে গরম পানি নির্গত হয়, এজন্য শহরের নাম হয়ে গেছে সাখনা। নারী-পুরুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গোসলখানা রয়েছে। রাতে পানি ধরে রাখা হয় এবং ঠান্ডা হওয়ার জন্য চৌবাচ্চায় রেখে দেওয়া হয়। সেখান থেকে আমরা পালমিরা (সিরিয়া) পৌঁছি। এই শহরটি জিন্নেরা হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের জন্য বানিয়েছিল। যেমন কবি নাবেগা বলেছেন,

بينون تدمر بالصفاح والعمد

অর্থাৎ, স্তম্ভগুলো পাথর ও ছাদ ইত্যাদি দ্বারা তৈরি হয়।

আরেকবার দামেশকে

পরে আবার দামেশকে আসি। এবার বিশ বছর পরে এখানে ফিরে আসি। এখানে আমি এক স্ত্রীকে রেখে গিয়েছিলাম। তখন সে গর্ভবতী ছিল। আমি যখন হিন্দুস্তানে ছিলাম তখন শুনেছিলাম আমার এক ছেলে জন্ম নিয়েছে। তার জন্য আমি হিন্দুস্তান থেকে তার নানার কাছে চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়েছিলাম। তিনি মিকনাসা শহরে বসবাস করতেন। দামেশকে আসার

পর আমি মনে মনে ভাবছিলাম, কারো কাছে আমার ছেলে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব। একদিন মসজিদে প্রবেশ করি এবং সেখানে মালেকী মাযহাবের ইমাম শায়খ নুরুদ্দিন সাখাবির সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি আমাকে চিনতে পারলেন না। আমি আমার পরিচয় দিলাম এবং আমার ছেলে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি জানালেন, ছেলেটি বারো বছর বয়সে মারা গেছে। কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বললেন, তোমার শহর তাঞ্জিয়ার এক ফকিহ মাদরাসায়ে জাহিরিয়ায় থাকেন। আমি খবর পেয়ে তার কাছে গেলাম, যাতে আমার বাবা-মায়ের খবর নিতে পারি। আমি তাকে গিয়ে সালাম করি এবং নিজের পরিবারের লোকদের খবর জানতে চাই। তখন তিনি বললেন, তোমার বাবা পনেরো বছর আগে মারা গেছেন। আর তোমার মা এখনো জীবিত আছেন।

ওই বছরটি আমি দামেশকে পূর্ণ করি। তখন সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সাত আদকিয়া রুটির দাম এক দিরহাম হয়ে যায়। সেখানে মালেকী মাযহাবের কাজি ছিলেন জামালুদ্দিন মাসলাকি। তিনি শায়খ আলাউদ্দিন তুনুরির মুরিদ ছিলেন। শাফেয়ী মাযহাবের প্রধান কাজি ছিলেন ইবনুস সাবাকি। তখন দামেশকের শাসক ছিলেন আরগুন শাহ।

আরব দেশগুলো সফর

দামেশক থেকে রওনা হয়ে আমরা হিমসের দিকে যাই। পরে হামার দিকে যাই। পরে মা'রাহর দিকে। পরে হালবে পৌঁছি। রবিউল আউয়াল ৭৪৯ হিজরির শুরুতে হালবে থাকাকালে আমাদের কাছে খবর পৌঁছে গাজায় প্লেগ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিদিন হাজারের বেশি মানুষ সেখানে মারা যাচ্ছে। আমি হিমসে চলে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি সেখানেও মহামারির প্রকোপ। যেদিন সেখানে পৌঁছি সেদিন তিনশ লোক মারা যায়। সেখান থেকে দামেশকে চলে যাই। বৃহস্পতিবার সেখানে পৌঁছি। সেখানে গিয়ে দেখলাম, সেখানকার লোকেরা তিন দিন ধরে রোযা রাখছে। জুমার দিন মসজিদুল আকদামে সবাই জড়ো হয়। আল্লাহ মহামারির প্রকোপ কমিয়ে দেন। সেখানে একদিনে ২৪ জন করে মারা যাচ্ছিল। পর আমি আজলুনের দিকে যাই। পরে বায়তুল মাকদিসে যাই। সেখান থেকে মহামারি দূর হয়ে গিয়েছিল। পরে আল কুদস থেকে বিদায় নিই। আমার সঙ্গে ছিলেন মুহাদ্দিস শরফুদ্দিন সুলাইমান মালয়ানি এবং মালেকী মাযহাবের শায়খ সুফি

তালহা আল আব্দুল ওয়াদি। আমরা খলিল শহরে পৌঁছি। আমরা ইবরাহিম খলিলুল্লাহ ও অন্যান্য পয়গাম্বরের কবর যিয়ারত করি। পরে আমরা গাজায় পৌঁছি। মহামারিতে এই শহর প্রায় বিরানভূমিতে পরিণত হয়েছিল।

পরে আমরা স্থলপথ ধরে অগ্রসর হই এবং দিময়াত পৌঁছি। সেখান থেকে নাহরারিয়া, আম্বার, দিমনাহুর হয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছি। মিশরে ওই সময় বাদশাহ ছিলেন মালিক নাসির হাসান বিন মালিক নাসির মুহাম্মাদ বিন মালিক মনসুর কালাদুন। পরবর্তী সময়ে তাকে বরখাস্ত করা হয়। তার ভাই মালিক সালেহ বাদশাহ হয়েছিলেন। কায়রোতে পৌঁছার পর সেখান থেকে সাইদ শহর হয়ে ইজাব পৌঁছি। সেখান থেকে জাহাজে চড়ে জেদ্দা যাই। সেখান থেকে ৭৪৯ হিজরিতে মক্কায় পৌঁছি। সেখানে মালেকী মাযহাবের শায়খ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ খলিলের কাছে গিয়ে অবস্থান করি। রমযান মাসের রোযা রাখি মক্কায়। প্রতিদিন শাফেয়ী মাযহাবের নিয়ম অনুযায়ী উমরা করতাম। সেখানকার বুযুর্গদের মধ্য থেকে শায়খ শিহাবুদ্দিন হানাফী, শিহাবুদ্দিন তাবারি, আবু মুহাম্মাদ ইয়াফিয়ি এবং নাজমুদ্দিন আসফুনি ও হারাজির সঙ্গে পরিচয় ছিল, তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সেই বছর হজ পালন করে শামের কাফেলার সঙ্গে মদিনা মুনাওয়ারার দিকে যাই। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারক যিয়ারত করি। মসজিদে নববীতে নামায পড়ি এবং জান্নাতুল বাকিতে সাহাবায়ে কেরামের কবর যিয়ারত করি। সেখানে শায়খ আবু মুহাম্মাদ বিন ফারাহুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সেখান থেকে আমরা আলা ও তাবুকে যাই। সেখান থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস, খলিল, গাজা হয়ে মানাজিলুর রুমালে পৌঁছি। এই সবগুলো জায়গার আলোচনা আমি পেছনে করেছি। সেখান থেকে কায়রোতে আসি।

জন্মভূমির দিকে

তিউনিসে প্রবেশ

কায়রোতে এসে আমি মাওলানা আমিরুল মুমিনিন আবু ইনানের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এব ন্যায় ও সাম্যের প্রশংসার কথা শুনলাম। এতে তার দরগায় কদমবুসি করার আগ্রহ জাগল। অন্যদিকে দেশের কথা মনে পড়ায় মন ছটফট করছে। কবির ভাষায়—

بلاد بها ينطت على تمائمى - واول ارض مس جلدى ترابها

'ওই দেশ যে আমার গলায় তাবিজ ঝুলিয়ে দিয়েছে। সর্বপ্রথম ভূমি যার মাটি আমার শরীরে লেগেছে।'

আমি একটি তিউনিসীয় ছোট নৌকায় আরোহণ করলাম। তখন ছিল ৭৫০ হিজরির সফর মাস। এই নৌকায় করে জারবায় অবতরণ করি। পরে নৌকাটি তিউনিসে চলে যায়। এ সময় নৌকাটি শত্রুর হাতে পড়ে। জারবা থেকে ছোট নৌকায় করে কাবিসে পৌঁছি। সেখানে আবু মারওয়ান ও আবু আব্বাসের মেহমান হিসেবে অবস্থান করি। পরে একটি জাহাজে চড়ে সাফাকাসে পৌঁছি। পরে নদীপথে বুলিয়ানায় যাই। সেখানে স্থলপথে আরবি এক কাফেলার সঙ্গে অনেক কষ্ট করে তিউনিস শহরে পৌঁছি।

ওই সময় শহরটি আরবিরা অবরোধ করে রেখেছিল। তখন তিউনিসের গভর্নর ছিলেন আমিরুল মুসলিমিন আবুল হাসান বিন মাওলানা আবু ইউসুফ বিন আবদুল হক। তিউনিসে পৌঁছার পর হাজি আবুল হাসান নামিসির যিয়ারতের জন্য যাই। তিনি আমাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেলেন। আমি তিউনিসের গভর্নর আবুল হাসানের হাতে চুমু খাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করি। তিনি আমাকে বসার অনুমতি দেন। আমি বসে গেলাম। আমার কাছে মিশর ও হেজাযের সুলতানের খোঁজখবর নেন। আমি সব খবরাখবর তাকে জানাই। পরে আমি চলে আসি। আসরের পর মাওলানা আমাকে আবার ডেকে পাঠান। তিনি একটি টাওয়ারে বসা ছিলেন, যেখান থেকে যুদ্ধের স্থান দেখা যেত। শায়খ আবু উমর উসমান বিন আবদুল ওয়াহেদ তানালাফতি, আবু হাসুন যাইয়্যান বিন আমরিয়ু উলুবি ও আবু যাকারিয়া বিন সুলাইমান আসকারিও তখন হাজি আবুল হাসান নামিসির কাছে বসা ছিলেন। তিনি আমার কাছে হিন্দুস্তানের খবরাখবর জানতে চাইলেন। আমি সবকিছু খুলে বলি। আমি তিউনিসে ছত্রিশ দিন অবস্থান করি। প্রায়ই মাওলানা আবুল হাসানের দরবারে যেতাম। তিউনিসে আমি খাতিমাতুল উলামা আবু আবদুল্লাহ আবলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। তা সত্ত্বেও আমার কাছে সফরের বিস্তারিত জানতে চান।

সারদানিয়া ও তিলমিসস্তানে অবতরণ

মাতলানার লোকদের সঙ্গে জাহাজে করে দানিয়া শহরের একটি দ্বীপে অবতরণ করি। এটি ভূমধ্যসাগরের একটি দ্বীপ। এই দ্বীপের বন্দরটি অনেক

বড়। বড় বড় জাহাজ এখানে নোঙর করা থাকে। এই বন্দরে আসা-যাওয়ার জন্য মাত্র একটি দরজা। এর ভেতরে দুর্গ রয়েছে। আমি সেই দুর্গেও গিয়েছি। এখানকার বাজার বেশ উন্নত। আমি মানত করি, এখান থেকে মুক্ত হলে দুই মাস রোযা রাখব। কেননা আমরা জানতে পারলাম, সেখানকার লোকেরা পরিকল্পনা করেছে, বন্দর থেকে বের হলেই তারা আমাদেরকে বন্দি করবে। তবে আমরা নিরাপদেই সেখান থেকে বেরিয়ে আসি এবং দশ দিন পর তিউনিসে পৌঁছি। সেখান থেকে মায়ুনায় যাই। সেখান থেকে মুস্তাগানিম। সেখান থেকে তিলমিস্তান। এখানে কয়েকজন সাধকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। শায়খ আবু মাদায়েনের সমাধি যিয়ারত করি এবং উপকৃত হই। এরপর রুমাগামী পথ ধরে আখানদাকানে পৌঁছি। সেখানে শায়খ ইবরাহিমের খানকায় অবস্থান করি। পরে সেখান থেকে রওনা দিয়ে আমরা আজগানগান পৌঁছি। পরে সেখান থেকে তাজি শহরে পৌঁছি।

ফেজ শহরে

সুলতান আবু ইনানের সঙ্গে সাক্ষাৎ

তাজি শহর থেকে রওনা দিয়ে জুমার দিন ৭৫০ হিজরির শাবানের শেষ দিন রাজধানী ফেজে (মরক্কোর একটি শহর) পৌঁছি। সেখানে আমিরুল মুমিনিন আবু ইনানের হাতে চুমু খাওয়ার সৌভাগ্য হয়। আল্লাহর ফযলে এই বাদশাহর মধ্যে সব ধরনের গুণ একত্রিত হয়েছে। ইরাকের বাদশাহর চেয়ে তার ব্যক্তিত্ব ওপরে। হিন্দুস্তানের বাদশাহর চেয়ে তার সৌন্দর্য বেশি। ইয়েমেনের বাদশাহর চেয়েও তিনি সদাচারে এগিয়ে। তার বীরত্ব তুর্কি বাদশাহর উর্ধ্বে। তুর্কিস্তানের বাদশাহর চেয়ে তার জ্ঞানানুরাগ বেশি। দীনদারিতে জাওয়ার রাজার চেয়ে তার প্রাধান্য রয়েছে। তার উযির হলেন জ্ঞানী-গুণী আবু জিয়ান বিন দুরার। তিনি আমার কাছে মিশরের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চান। তিনি মিশরে কিছুদিন থেকেছেন। তিনি আমাকে আমিরুল মুমিনিনের অনুগ্রহের বোঝায় ভারগ্রস্ত করেন। আমি আমিরুল মুমিনিনের দেশে থেকে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলাম। কারণ আমি প্রকৃত অর্থেই বুঝতে পারলাম, এই দেশ থেকে উত্তম দেশ দুনিয়ার কোথাও চোখে পড়ে না। এখানে প্রচুর পরিমাণে ফল উৎপন্ন হয়। খাবারদাবার অনেক সহজলভ্য। আর কোনো দেশে এখানকার মতো সব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না। জনৈক কবি যথার্থ বলেছেন—

الغرب حسين ارض

و لي دليل عليه

البدر يرقب منه

والشمس تسعى عليه

‘মাগরেব (মরক্কো অঞ্চল) সবচেয়ে ভালো দেশ। এই দাবির পক্ষে আমার কাছে দলিল আছে। চাঁদ সেখান থেকে উদয় হয়। আর সূর্য সে দিকে দৌড়ে যায়।’

মাগরেবে দ্রব্যমূল সবচেয়ে সস্তা। উর্বরতা ও ফসলের দিক থেকেও অন্যান্য দেশ থেকে এই দেশ এগিয়ে। পূর্বের চেয়ে পশ্চিমের সবচেয়ে বেশি অগ্রগামিতা এজন্য যে, এখানে মাওলানা আবুল ইনানের ন্যায় ও সাম্য দ্বারা সর্বত্র নিরাপত্তা রয়েছে। এখানে ন্যায়ের ঝরনাধারা প্রবাহিত। বিশৃঙ্খলার নামগন্ধও এখানে নেই। আমিরুল মুমিনিনের ন্যায়বিচার, শাসনকর্তৃত্ব ও বীরত্ব সম্পর্কে আমি যা কিছু শুনেছি তা এখানে বর্ণনা করছি।

আমিরুল মুমিনিনের ন্যায় ও সাম্যের কথা চার দিকে প্রসিদ্ধ। তা বিস্তারিত বলার জন্য একটি স্বতন্ত্র বই লিখতে হবে। আমিরুল মুমিনিন মজলুমদের অভিযোগ শোনার জন্য নিজে মজলিস কায়েম করেন। জুমার দিনটি তাদের জন্য নির্দিষ্ট। সেদিন প্রথমে নারীদের অভিযোগ শোনা হয়। কেননা তারা সবচেয়ে দুর্বল প্রকৃতির হয়ে থাকে। এরপর পুরুষদের অভিযোগ শোনা হয়। নামাযের পর আবার নারীদের অভিযোগ শোনা হয়। প্রত্যেক নারী নিজে আমিরুল মুমিনিনের সামনে দাঁড়িয়ে নিজে মজলুম হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করে। কেউ অত্যাচারিত হলে সঙ্গে সঙ্গে তার বিষয়টি বিহিত করা হয়। কেউ অভাবগ্রস্ত হলে তার অভাব দূর করে দেওয়া হয়। আসরের নামাযের পর পুরুষদের অভিযোগ শোনা হয়। একইভাবে তাদের প্রয়োজনও পূরণ করা হয়। সেখানে কাজি ও ফকিহ উপস্থিত থাকেন। শরিয়তের কোনো মাসআলা জানার প্রয়োজন হলে সেখানেই তাদের কাছ থেকে তা জেনে নেওয়া হয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ড আমি আর কোনো দেশে দেখিনি। হিন্দুস্তানে বাদশাহ অভিযোগ শুনেন বটে, তবে তা আমিরদের মাধ্যমে। আমিররা অভিযোগের সারমর্ম বাদশাহর কাছে পাঠান। কোনো অভিযোগকারীকে বাদশাহর মুখোমুখি করা হয় না।

যত গুণ আছে সবই তিনি এককভাবে ধারণ করেন

আমিরুল মুমিনিনের নির্দেশনাও বিস্ময়কর। তিনি এমন অনেক ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিয়েছেন যারা তার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে কিংবা তার বিরোধিতা করেছে। বড় বড় অপরাধীদের ক্ষমা করেন না। তবে যারা তাওবা করে এবং যাদের ব্যাপারে আমিরুল মুমিনিন আশ্বস্ত হন তাদের তিনি ক্ষমা করে দেন। এই সফরনামার বিন্যাসকারী ইবনে জুযাই বলেন, আমি আমিরুল মুমিনিনের দরবারে এসেছি চার বছর হয়েছে। অর্থাৎ ৭৫৩ হিজরি থেকে ৭৫৭ হিজরি পর্যন্ত আমি কাউকে দেখিনি শরয়ি হুদুদ অর্থাৎ হত্যার বদলে হত্যা ছাড়া কাউকে মারা হয়েছে। এটি ওই সালতানাতের কথা যেখানে নানা গোষ্ঠীর লোকজন বাস করে। এটি খুবই বিস্ময়কর। আমি আর কোথাও এ ধরনের দৃশ্য দেখিনি বা শুনিনি। আমিরুল মুমিনিনের বীরত্বের অবস্থা হলো, বেশির ভাগ সংকটপূর্ণ মুহূর্তে তিনি দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। ইবনে জুযাই বলেন, আগেকার রাজা-বাদশাহ বাঘ মারতে পেরে বীরত্ব প্রকাশ করতেন। কিন্তু আমিরুল মুমিনিনের কাছে বাঘকে হত্যা করা এর চেয়েও বেশি সহজ, যেমন বাঘের জন্য একটি ছাগল হত্যা করা। একবার ওয়াদি নাজারিনে একটি বাঘ এলো। বাঘ দেখে বড় বড় বীর চুপসে গেল। কেউ বাহনে চড়ে কেউ দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। আমিরুল মুমিনিন একা বাঘের সঙ্গে মোকাবেলা করতে গেলেন। বাঘের কপাল লক্ষ করে বর্শা নিক্ষেপ করলেন। বাঘটি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। শত্রুদের সঙ্গে লড়াইয়ে বাদশাহ বেশির ভাগ সময় নিজে বাহিনীর সঙ্গে থাকতেন এবং তাদেরকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতেন। এমন ঘটনাও ঘটেছে, পুরো বাহিনী পিছু হটেছে কিন্তু আমিরুল মুমিনিন দৃঢ়তার সঙ্গে একা লড়ে গেছেন। এতে শত্রুবাহিনীর ওপর এত ভয় ছেয়ে বসে যে, তারা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়।

আমিরুল মুমিনিনের ইলমের প্রতি ঝোঁক এবং অস্বাভাবিক মাযহাবপ্রীতি

আমিরুল মুমিনিনের ইলমের প্রতি এই পরিমাণ ঝোঁক যে, প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর রাজপ্রাসাদের মসজিদে একটি ইলমি মজলিস বসে। বড় বড় ফকিহ ও তালিবুল ইলম এতে শরিক হয়। তাফসির, হাদীস, মালেকী মাযহাবের ফিকাহ ও ইলমে তাসাউফের ওপর আলোচনা হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমিরুল মুমিনিনের এই পরিমাণ যোগ্যতা যে, কঠিন কঠিন সমস্যা

আল্লাহপ্রদত্ত মেধার দ্বারা সমাধান করেন। বিস্ময়কর মুখস্থশক্তি দ্বারা তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বিষয়গুলো উপস্থাপন করেন। ইলমের প্রতি এ ধরনের ঝোঁক দীনের ইমাম, খুলাফায়ে রাশেদিন ছাড়া আর কারো মধ্যে লক্ষ করা যায়নি। হিন্দুস্তানের বাদশাহও বিদ্যানুরাগী। কিন্তু তার মজলিস যা সকালে অনুষ্ঠিত হতো সেখানে শুধু গবেষণালব্ধ বিষয়ের ওপর আলোচনা হতো। জাওয়ার বাদশাহর মজলিসে শুধু ফিকহে শাফেয়ীর ওপর আলোচনা হতো। যখন আমি তুর্কিস্তানের বাদশাহকে মাগরিব, ইশা ও ফজরের নামায জামাতের সঙ্গে পড়তে দেখেছি তখন বিস্মিত হয়েছি। কিন্তু আমিরুল মুমিনিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই মসজিদে এসে জামাতের সঙ্গে আদায় করেন। রমযানে তারাবিও জামাতের সঙ্গে আদায় করেন।

আমিরুল মুমিনিন একজন দূত এবং দুটি কাসিদা (সঙ্গীত) রওযায়ে মুনাওয়ারায় পাঠান। সেই কাসিদা এমন নির্বাচিত হস্তলিপির মাধ্যমে লেখানো হয় যা দেখে ফুলের সৌন্দর্যও লজ্জিত হতে বাধ্য। এই গৌরব আর কোনো বাদশাহ লাভ করতে পারেননি। তার ভাষার অলংকার ও বিশুদ্ধতার অবস্থা হলো, তার জারি করা ফরমান পড়লে বোঝা যায়, এই বাদশাহকে আল্লাহ নিজে বিরল সব যোগ্যতা দান করেছিলেন।

আমিরুল মুমিনিনের দান-দক্ষিণার দাস্তান

দান-দক্ষিণার অবস্থা হলো, তিনি গোটা দেশে সদকা করতে থাকেন। বিভিন্ন স্থানে খানকা নির্মাণ করেন। যেখানে মুসাফিররা খাবার পায়। সুলতান আহমাদ আতাবুক ছাড়া আর কোনো বাদশাহ এমনটা করেননি। আমিরুল মুমিনিন বাড়তি যে কাজটি করেন সেটা হলো, মিসকিনদের মধ্যে প্রতিদিন সদকা করতেন। পর্দানশীন নারীদের জন্য দৈনন্দিন ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। ইবনে জুযাই বলেন, সদকা ও দান-খয়রাতের ব্যাপারে আমিরুল মুমিনিন যে পদ্ধতি নিজের উর্বর মস্তিষ্ক দ্বারা বের করেন এর কোনো দৃষ্টান্ত কোনো বাদশাহর যুগে যাওয়া যায় না। মিসকিন, দুর্বল, বৃদ্ধ, মসজিদের খাদেম সবাইকে কাপড় দিতেন। ঈদুল আযহার দিন তাদের পক্ষ থেকে কুরবানি দিতেন। রমযানের ২৭ তারিখ পুরো উপার্জন যা দরজার সামনে স্তূপ আকারে থাকত, তা গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। প্রিয়নবীর জন্মের রাতে গোটা দেশে গরিব-মিসকিনদের খাওয়াতেন, মৌলুদ শরিফের আয়োজন করতেন। আশুরার দিন এতিম ছেলেদের খতনা

করাতেন এবং তাদের নতুন কাপড় উপহার দিতেন। দুস্থ-অচলদের গরু দান করতেন, যাতে তারা তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। রাজধানীতে লোকদের ঘুমানোর জন্য নরম নরম বিছানার ব্যবস্থা করে দিতেন। প্রতিটি শহরে হাসপাতাল বানিয়ে দেন। রোগীদের চিকিৎসা এবং চিকিৎসকদের বেতন-ভাতার জন্য জমি ওয়াকফ করে দেন। মানুষের কল্যাণের কথা তিনি কতটা ভাবতেন সেটা শুধু এর দ্বারাই অনুমান করা যায় যে, রাস্তাঘাট থেকে যে ট্যাক্স আদায় করা হতো তা একদম ক্ষমা করে দেন। এখান থেকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অনেক বড় আর্থিক সহযোগিতা আসত। কিন্তু আমিরুল মুমিনিন এটা নিয়ে একটুও ভাবেননি। তিনি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সবসময় এই নসিহত করতেন যে, প্রজাদের ওপর জুলুম করবে না। এ ব্যাপারে তিনি খুবই তাগিদ দিতেন। কোনো কাজি বা বিচারক জুলুম করেছেন আমিরুল মুমিনিন সেই খবর পেলে দৃষ্টান্তমূলক সাজা দিতেন। আন্দালুসের লোকদের জিহাদের জন্য এবং ইসলামি সীমান্তের সুরক্ষায় যে সহযোগিতা, অস্ত্র-সরঞ্জাম ও বাহিনী দিয়ে যে সহায়তা করেছেন তা গোটা দুনিয়ায় দৃষ্টান্তহীন।

নিজ দেশ

আমিরুল মুমিনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তার অনুগ্রহের দ্বারা সিক্ত হওয়ার পর মায়ের কবর যিয়ারতের ইচ্ছা পোষণ করি। আমি আমার নিজ শহর তানজায়[১] পৌঁছি। মায়ের কবর যিয়ারত করে সাবতা[২] শহরে যাই। সেখানে কয়েক মাস অবস্থান করি। তিন মাস পর্যন্ত লাগাতার অসুস্থ ছিলাম।

আন্দালুস ও জাবালুত তারিক

সাবতা থেকে জাহাজে করে আন্দালুসে পৌঁছি। যেখানে থাকা এবং অবস্থান করাও সওয়াবের। আমি যখন সেখানে যাই আডফুনাস[৩] মারা গেছেন। তিনি জামালে তারিক[৪] (জিব্রাল্টার) দশ মাস পর্যন্ত অবরোধ করে রাখেন। তার ইচ্ছা ছিল মুসলিমদের আন্দালুস থেকে বের করে দেওয়া। কিন্তু আল্লাহ তার

---

[১] তানজাকে তানজিরও বলা হয়। এটা জাবালে তারিক (জিব্রাল্টার) প্রণালীতে অবস্থিত।

[২] স্পেনের একটি শহর।

[৩] আডফুনাস, স্পেনের বাদশা, যিনি আন্দালুস থেকে মুসলিমদের জোরপূর্বক বের করে দেন এবং হত্যা করেন।

[৪] জাবালুত তারিক, যা বর্তমানে ইংরেজদের কবলে।–রইস আহমাদ জাফরি।

নিকৃষ্ট ইচ্ছাকে মাটিতে দাফন করে দেন। তিনি নিজেই মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। আন্দালুসের সর্বপ্রথম শহর যা আমি দেখি সেটা হলো, জাবালুল ফাতাহ (জিব্রাল্টার)। সেখানে আমি এই শহরের খতিব আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন সিরাজ রান্দি এবং সেখানকার কাজি ঈসা বারবারির সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। কাজির বাসায় আমি অবস্থান করি এবং তার সঙ্গে গোটা পাহাড়ের আশপাশে ঘুরে বেড়াই। আমাদের শাসক আবুল হাসান যেসব দালান-কোটা সেখানে বানান এবং যে সাজসরঞ্জাম সেখানে জমা করেন, তা দেখে বিস্মিত হই। এর সঙ্গে আমিরুল মুমিনিন যা কিছু যুক্ত করেছেন সেটাও দেখি। আমি চাচ্ছিলাম জিহাদের জন্য এখানে স্থায়ীভাবে থেকে যাই।

ইবনে জুযাই বলেন, জাবালুত তারিক ইসলামের আশ্রয়স্থল। মুশরিক গোষ্ঠীর জন্য প্রতিবন্ধক। আবুল হাসানের কল্যাণকর উদ্যোগের নমুনা হলো, তিনি সেখানে জিহাদের জন্য বাহিনী প্রস্তুত রাখতেন। সেনাদের সবসময় উদ্বুদ্ধ করতেন। এ কারণে স্পেনবাসী ভয়ের তিক্ততার পর নিরাপত্তার মিষ্টতা লাভ করেছে। ইসলামি শক্তির বিজয়ও সেখান থেকেই শুরু হয়। তারিক বিন জিয়াদ যিনি মুসা বিন নুসাইরের আজাদ করা ক্রীতদাস ছিলেন, ইউরোপ অতিক্রম করার সময় এখানে এসে থামেন। এজন্য এই পর্বতটির নাম জাবালুত তারিক, জাবালুল ফাতাহ বলা হয়। যে প্রাচীর তিনি বানিয়েছিলেন এর ধ্বংসাবশেষ আজও বাকি আছে। সেটা বর্তমানে 'আরবের দেয়াল' নামে প্রসিদ্ধ।

মুসলিমদের জিব্রাল্টার দখল এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলো

এই শহর বিশ বছর ধরে ফিরিঙ্গিরা দখল করে রেখেছিল। আবুল হাসান ছয় মাস অবরোধ করে রাখার পর এটি জয় করেন। এই শহর অবরোধ করার জন্য নিজের ছেলে আবু মালিককে সশস্ত্র বাহিনী এবং অগণিত সম্পদ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। সে সময় এই শহর এমন আকৃতিতে ছিল না। আগে শুধু একটি দুর্গ ছিল, যা ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা আঘাত করলে হেলে পড়ত। আবুল হাসান পাহাড়ের চূড়ায় একটি মজবুত দুর্গ নির্মাণ করেন। এর ওপরে অস্ত্র বানানোর একটি কারখানাও প্রতিষ্ঠা করেন। আগে সেখানে অস্ত্র বানানোর কারখানা ছিল না। অস্ত্রাগার থেকে টাইলইয়ার্ড পর্যন্ত লাল মাটির প্রাচীর চার দিকে নির্মাণ করেন। আমিরুল মুমিনিন তার শাসনামলে এগুলো মেরামত

করেন। জাবালে ফাতাহর দিকেও একটি প্রাচীর নির্মাণ করেন। এই প্রাচীরটি সবচেয়ে বেশি উপকারী। আর দুর্গে অনেক আসবাবপত্র, খাদ্যশস্য ও হাতিয়ার পাঠান। আল্লাহ তাআলা আমিরুল মুমিনিনকে তার পরিশুদ্ধ নিয়ত ও ইখলাসের বদলা দিন। ৭৫৬ হিজরিতে জাবালুল ফাতাহর গভর্নর ঈসা বিন হাসান বিন আবু মিনদিল কাফেরদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বিদ্রোহ করেন। লোকদের ধারণা ছিল, এই ফেতনা নিবারণের জন্য একটি অনেক বড় বাহিনী এবং বিপুল ধনসম্পদের প্রয়োজন পড়বে। কিন্তু আমিরুল মুমিনিনের সত্যবাদিতা ও আল্লাহর ওপর ভরসা সব কাজ সম্পন্ন করে দেয়। অল্প কিছুদিন পর জাবালুল ফাতাহর লোকদের দেখিয়ে দেয়, এই বিদ্রোহের ফলাফল কী হবে। তারা ঈসা ও তার ছেলেকে ধরে বেঁধে আমিরুল মুমিনিনের দরবারে হাজির করে। আমিরুল মুমিনিন তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেন। এর মাধ্যমে তার অনিষ্টতা থেকে সৃষ্টিকুলকে রক্ষা করেন।

এই ফেতনা নির্মূল হয়ে যাওয়ার পর আমিরুল মুমিনিন আন্দালুসের অধিবাসীদের সঙ্গে অনেক মহান আচরণ করেন যা তাদের স্বপ্ন কিংবা ধারণায়ও ছিল না। জাবালুত তারিকে নিজের প্রিয় ছেলে আবু বকর সাঈদকে গভর্নর নিযুক্ত করেন। তার সঙ্গে অভিজ্ঞ ও সাহসী সর্দারদের পাঠান। তাদের জন্য জায়গির দান করেন এবং ভাতা নির্ধারণ করে দেন। আর তাদের সব কর ক্ষমা করে দেন। জাবালুত তারিকের ব্যাপারে আমিরুল মুমিনিন এতটা ভাবতেন যে, তিনি নিজ মহলে সেখানকার একটি মডেল বানিয়ে রেখেছিলেন। যেখানে সব প্রাচীর, দেয়াল, পাহাড়, টাওয়ার, দুর্গ, অস্ত্রাগার, দরজা, মসজিদ, ক্ষেত, পাহাড়, লাল মাটির ভূমি; মোটকথা ছোট ছোট জিনিসগুলোও স্পষ্ট দেখা যেত। কারিগররা এই চিত্রটি এতটা নিপুণতার সঙ্গে বানান, যারা জাবালুত তারিক ও সেখানকার দুর্গগুলোর দৃশ্য সরাসরি দেখেছেন তারা এই নকল চিত্রকে হুবহু মনে করতে বাধ্য হয়েছেন। আমিরুল মুমিনিন এটা বানানোর কারণ হলো, তিনি জাবালুত তারিককে আরো মজবুত করতে চেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে সবসময় ভাবতেন। আন্দালুসে ইসলামের সহায়তা এবং খ্রিস্টানদের সব চক্রান্ত নিষ্ফল করার ক্ষেত্রে এমন কোনো পদক্ষেপ নেই যা তিনি নেননি।

জাবালুল ফাতাহের পর আমরা রান্দাহ শহরে পৌঁছি। এটিও মুসলিমদের একটি শক্তিশালী ও সুন্দর দুর্গ। ওই সময় এই দুর্গের অধিপতি ছিলেন শায়খ

আবুয যাবি সুলাইমান বিন দাউদ আসকারি। আমার চাচাতো ভাই মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন বতুতা ছিলেন সেখানকার খতিব। আবু ইসহাক ইবরাহিম যিনি সুন্দরুখ নামে বেশি পরিচিত ছিলেন, তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই শহরে আমি পাঁচ দিন অবস্থান করি। সেখান থেকে আমি মারবালা শহরে পৌঁছি। রাস্তায় অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়। মারবালা একটি সবুজ-শ্যামল ও মনোরম শহর। সেখানে মালাকা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত একটি অশ্বারোহী দলের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। পরদিন তাদের সঙ্গে আমি মালাকা চলে যাই।

আন্দালুসের শহর মালাকা

মালাকা আন্দালুসের একটি রাজধানী। এটি একটি মজবুত শহর। জল ও স্থল উভয় পথের সুবিধা এই শহর ভোগ করে। এখানে অনেক বেশি ফলমূল উৎপন্ন হয়। এখানকার বাজারে এক দিরহামে আট রিতিল আঙুর পাওয়া যায়। এখানকার ডালিম যাকে ইয়াকুতি বলা হয়, গোটা দুনিয়ায় নজিরবিহীন। এখানকার ডুমুর ও বাদাম প্রাচ্যের সব শহরে যায়।

মালাকা শহরে সোনালি গিলটি করা চীনা মাটির পাত্র বানানো হয়, যা দেখতে খুবই চমৎকার। এই পাত্র বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। এই শহরে একটি বড় মসজিদ আছে। যার আঙিনা এত প্রশস্ত যে, আমি এত প্রশস্ত ও সুন্দর আঙিনা আর কোথাও দেখিনি। সেখানে নারিকেলের গাছ লাগানো রয়েছে। যেদিন আমি মালাকায় পৌঁছি সেদিন দেখলাম, সেখানকার কাজি আবু আবদুল্লাহ বিন কাজি আবু জাফর তানজানি জামে মসজিদে বসে আছেন। লোকেরা কয়েদিদের[১] ছাড়িয়ে আনার জন্য অর্থ জমা করছে। সেখানকার খতিব আবু আবদুল্লাহ সাহেলিও আমাকে দাওয়াত করেন। সেখান থেকে আমি বালাশ শহরে গেলাম। মালাকা থেকে এই শহর চব্বিশ মাইল দূরে। এখানে খুবই বিস্ময়কর একটি মসজিদ রয়েছে। মালাকার মতো এখানেও আঙুর ও ডুমুর অনেক বেশি উৎপন্ন হয়। সেখান থেকে আমরা হামায় গেলাম। এটি একটি ছোট শহর। কিন্তু এর মসজিদ খুবই বিরল ও মনোরম।

---

[১] খ্রিস্টানদের কাছে বন্দি মুসলিমরা।

আন্দালুসের শহর
ঘারনাতা ও মারাকাশ

সেখান থেকে আমি ঘারনাতা (পরবর্তী সময়ে গ্রানাডা) গেলাম। এটি আন্দালুসের রাজধানী। সব শহরের বধূ। এর দৈর্ঘ্য ও মনোরম পরিবেশ গোটা দুনিয়ায় নজিরবিহীন। শহরটি চল্লিশ মাইল দীর্ঘ। বিখ্যাত শানিল নদী বয়ে গেছে শহরের পাশ দিয়ে। এছাড়াও আরো অনেকগুলো ধারা প্রবাহিত হয়েছে। শহরের চার দিকে বাগান, প্রাসাদ ও আঙুরের ক্ষেত্র এত বেশি যে, এমন দৃশ্য আর কোথাও দেখিনি। ইবনে জুযাই বলেন, পক্ষপাতিত্বের কথা চিন্তা না করলে এই শহরের প্রশংসায় একটি দীর্ঘ কবিতা লিখতাম। কিন্তু যেহেতু এই শহর গোটা দুনিয়ায় প্রসিদ্ধ এজন্য বেশি কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করি না। ঘারনাতার অধিবাসী শায়খ মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন শিরিন সাবাতি কতই না চমৎকার বলেছেন,

رعى الله من غرناطة متبوا

يسر حزينا او يجير طريدا

'আল্লাহ ঘারনাতার ঘরের হেফাজত করুন। যার দ্বারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তরা প্রফুল্ল হয়ে যায়, যে শহর পলাতককে আশ্রয় দেয়।'

ওই সময় ঘারনাতার বাদশাহ ছিলেন আবুল হুজ্জাজ ইউসুফ বিন সুলতান ইসমাইল বিন ফারাজ বিন ইসমাইল বিন ইউসুফ বিন নসর। তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। এজন্য তার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি। তার মা অত্যন্ত নেককার ও বিদুষী, তিনি আমার কাছে কিছু স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়ে দেন। ঘারনাতায় সেখানকার কাজি আবুল কাসিম মুহাম্মাদ বিন আহমাদ হুসাইনি সাবাতি এবং খতিব মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম বায়ানি ও খতিব আবু সাঈদ ফারাজ ওরফে ইয়ায়িনলাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। কাজি আবুল বারাকাত মুহাম্মাদ সালামি আল-বালাবিসি ওই সময় সেখানে এসেছিলেন মারিয়া থেকে। তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় ফকির আবু কাসিম মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আসেমের বাগানে। সেখানে আমি তার কাছে দুই দিন ও এক রাত অবস্থান করি। (ইবনে জুযাই, যিনি এই সফরনামা সংকলক, তিনি বলেন, ইবনে বতুতার সঙ্গে আমার সাক্ষাতও তখনই হয়। সেখানে তখন

তার মুখ থেকে সফরের কাহিনি শুনি। শায়খের সফরকালে যেসব বুযুর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাদের নাম আমি লিখে রাখি। সেখানে ঘারনাতার অনেক বুযুর্গ ও বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। প্রখ্যাত কবি আবু জাফর আহমাদ বিন রেযওয়ান জুযামিও আমাদের সঙ্গে সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। এই কবির অবস্থা ছিল বিস্ময়কর। তিনি একদম পড়াশোনা করেননি। মরুভুমিতে বেড়ে ওঠেন। কিন্তু এত উন্নতমানের কবিতা বলতেন যে, অনেক বড় বড় আলেম ও ভাষাবিদেরাও তাতে বিস্ময়বোধ করতেন।)

ঘারনাতায় শায়খুশ শুয়ুখ ওয়াস সুফিয়া উমর বিন শায়খুস সালেহ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন মাহরুকের সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ হয়। তার খানকা ঘারনাতা শহরের বাইরে। সেখানে আমি কয়েকদিন অবস্থান করি। তিনি আমার সঙ্গে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয়ী আচরণ করেন। তার সঙ্গে আমি রাবেতা উক্কাব খানকা যিয়ারতের জন্য যাই, যাকে অনেক বরকতময় জায়গা বলে মনে করা হয়। উক্কাব ঘারনাতার বাইরে একটি পাহাড়। শহর থেকে আট মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এর কাছেই একটি আলোহীন শহর তিরার ধ্বংসাবশেষ। এরপর আমি তার ভাতিজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তার নাম ফকিহ আবুল হাসান আলী বিন আহমাদ বিন মাহরুক। তিনি একটি খানকায় থাকেন, যা একটি উঁচু টিলায় অবস্থিত। এর নাম লুজাম। এই শহর ফকিরদের উপার্জনের জায়গা। ঘারনাতায় অনারবি অনেক ফকির রয়েছে। যেহেতু এটি তাদের দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এজন্য এখানে বাড়িঘর বানিয়েছে। এর মধ্যে হাজি আবু আবদুল্লাহ সমরকন্দি, হাজি আহমাদ তাবরিযি, হাজি ইবরাহিম কাউনাবি, হাজি হোসাইন খুরাসানি, হাজি আলী হিন্দি ও হাজি রশিদ হিন্দি বেশি প্রসিদ্ধ।

ঘারনাতা থেকে বিদায় নিয়ে আমি হামায় আসি। এরপর সেখান থেকে বালাশ, মালাকা হয়ে হিসনে যাকওয়ানে পৌঁছি। এই দুর্গটি বেশ উন্নত। এখানে পানির প্রচুর ধারা রয়েছে। ফলমূলও অনেক বেশি উৎপন্ন হয়। সেখান থেকে রওনা দিয়ে আমি রান্দা শহরে পৌঁছি। সেখান থেকে বনি রাইয়্যাহ গ্রামে আসি। এখানে শায়খ আবুল হাসান আলী সুলাইমান রাইয়্যাহির মেহমান হই। এই শায়খ অনেক দানশীল ও গুণী ব্যক্তিত্ব। মুসাফিরদের খাবার খাওয়ান। তিনি আমাকে ভরপুর মেহমানদারি করান। সেখান থেকে আবার জাবালুল ফাতাহ বা জাবালুত তারিকে পৌঁছি। যে জাহাজে আসি সেটাতে চড়েই সাবতা শহরে পৌঁছি। এই জাহাজটি ছিল

আসিলার অধিবাসীদের। ওই সময় সেখানকার দুর্গের অধিপতি ছিলেন শায়খ আবু হিন্দা ঈসা বিন মনসুর। আর সেখানকার কাজি ছিলেন আবু মুহাম্মাদ যাজানদারি। পরে আমি আসিলা শহরে পৌঁছি। এখানে কয়েক মাস অবস্থান করি।

আসিলা থেকে রওনা করে সিলা শহরে পৌঁছি। আর সিলা থেকে মারাকাশ[১] শহরে পৌঁছি। এই শহরটি অনেক সুন্দর ও প্রশস্ত। এখানে অনেক ভালো কাজ হয়। বড় বড় আলিশান মসজিদ রয়েছে। কাবনিদের মসজিদ অনেক বড়। এর মিনার অনেক উঁচু ও বিস্ময়কর। এর চূড়া থেকে পুরো শহর দেখা যায়। এই শহর বাগদাদের সঙ্গে অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে বাগদাদের বাজারগুলো এখানকার বাজারের চেয়ে সুন্দর। মারাকাশ শহরে একটি চমৎকার মাদরাসা রয়েছে, যা স্থাপত্যশৈলিতে বিরল। এই মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আমিরুল মুমিনিন আবুল হাসান। মারাকাশ থেকে আমরা প্রথমে সিলা, পরে মাকনাসায় পৌঁছি। এই শহরটি অনেক সবুজ-শ্যামল। এর চারপাশে বাগান রয়েছে। যাইতুন গাছের বন চার দিকে চোখে পড়ে। পরে আমরা রাজধানী ফাসে পৌঁছি। সেখানে আমি আমিরুল মুমিনিনের কাছ থেকে বিদায় নিই এবং সুদান সফরের ইচ্ছা করি।

সুদান সফর

এই অঞ্চলের অবস্থা ও দেশ ও নগরগুলোর বর্ণনা

ফাস থেকে সিজিলমাসা শহরে পৌঁছি। এটি অনেক ভালো একটি শহর। এখানে অনেক খেজুর উৎপন্ন হয়। খেজুরের আধিক্যের দিক থেকে বসরার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে সিজিলমাসার খেজুর বসরার খেজুরের চেয়ে কয়েক গুণ ভালো। এক ধরনের খেজুর আছে যাকে ইরার বলা হয়, গোটা দুনিয়ায় এই খেজুরের তুলনা হয় না। এই শহরে ফকিহ আবু মুহাম্মাদ বিশরির বাড়িতে আমি অবস্থান করি। তিনি ওই ব্যক্তি যার ভাইয়ের সঙ্গে চীনের শহর কানচুনফুতে সাক্ষাৎ হয়েছিল। আবু মুহাম্মাদ বিশরি আমাকে অত্যন্ত খাতির-যত্ন করেন। এই শহর থেকে আমি উট কিনি এবং এর দ্বারা চার মাসের পাথেয় বহন করি। ৭৫৩ হিজরির মুহাররম মাসের প্রথম দিন আবু মুহাম্মাদের নেতৃত্বাধীন একটি কাফেলার সঙ্গে মাসুফিতে চলে যাই।

---

[১] এই শহরে ফ্রান্সের ওপনিবেশ ছিল, এখন স্বাধীন হয়েছে।

আমাদের সঙ্গে সিজিলমাসার অনেক ব্যবসায়ীও ছিলেন। পঁচিশ দিন পর আমরা তাগাজিতে পৌঁছি। এই গ্রামটি খুবই আকর্ষণহীন। এর ঘর ও মসজিদের দেয়ালগুলো পাথরের এবং ছাদ উটের চামড়া দ্বারা বানানো। এই দেশে একমাত্র রমল ছাড়া আর কোনো গাছ জন্মায় না। এই শহরে লবণের খনি আছে। মাটি খুঁড়লে লবণের ব্লক পাওয়া যায়। যেন কেউ এনে এখানে ব্লকগুলো রেখে দিয়েছে। এক একটি উটের ওপর দুটি করে ব্লক রাখা হয়। লবণ তোলার কাজে শত শত ক্রীতদাস নিয়োজিত। তবে কেউ এখানে থাকে না। তাদের প্রধান খাবার হলো খেজুর। যা দারআ ও সিজিলমাসা থেকে আসে। এ ছাড়া উটের গোশত ও সুদানি চনা তাদের খাদ্য। হাবশিরা এখানে আসে এবং লবণ নিয়ে যায়। আইওয়ালাতানে এক উট বোঝাই লবণ দশ থেকে আট মিসকালে বিক্রি হয়। আর মালি শহরে বিশ থেকে ত্রিশ মিসকালে। অনেক সময় এর দাম চল্লিশ মিসকালেও ওঠে।

সুদানে লবণ নগদ অর্থের মতো কাজে আসে। অনেক সময় সোনা-রুপার মতো কাজেও আসে। লবণের ব্লকগুলো ছোট ছোট টুকরা করে নেয় এবং এর দ্বারা কেনাকাটা করে। তাগাযি গ্রামটি যদিও অনেক অনুন্নত কিন্তু সেখানে স্বর্ণের স্তূপ পড়ে যায়। আমরা অনেক কষ্টে সেখানে দশ দিন কাটাই। কেননা সেখানকার পানি লবণাক্ত। মাছিও অনেক বেশি। মরুপ্রান্তরে প্রবেশ করার আগে এখান থেকে পানি নিয়ে যেতে হয়। কেননা সামনে দশ দিনের পথজুড়ে পানি পাওয়া খুবই দুষ্কর। তবে বৃষ্টির কারণে আমরা কয়েক জায়গায় পুকুরে পানি পেয়েছি। অনেক জায়গায় পাথরের টিলার মধ্যখানে স্বচ্ছ পানি পেয়েছি, যা আমি পেট ভরে পান করেছি। সেখানে কাপড়-চোপড় ধুয়েছি এবং পানিও সংগ্রহ করেছি। এই মরুভূমিতে ছত্রাক ও উঁকুনের দৌরাত্ম্য অনেক বেশি। এ থেকে বাঁচার জন্য অনেকে মার্কারি ভরা তারের নেকলেস পরে। আমরা কাফেলার আগে আগে চলতাম। যেখানেই চারণভূমি পেতাম সেখানে উটকে ছেড়ে দিতাম।

আইওয়ালাতান : সুদানের প্রথম শহর

পরে আমরা আইওয়ালাতানে পৌঁছি রবিউল আউয়ালের প্রথম দিন। সিজিলমাসা থেকে রওনা দিয়ে এখান পর্যন্ত পুরো দুই মাস সফরে ছিলাম। এটি সুদানের প্রথম শহর। বাদশাহর পক্ষ থেকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করা হয় ফারয়া হোসাইনকে। সুদানের ভাষায় ফারয়া বলা হয় সহকারীকে।

যখন আমরা সেখানে পৌঁছি ব্যবসায়ীরা নিজেদের মালপত্র একটি আঙিনায় সুদানিদের কাছে সোপর্দ করেন এবং সবাই মিলে বাদশাহর সহকারীর কাছে যান। তিনি একটি দালানে বিছানা বিছিয়ে বসা ছিলেন। তার সেনারা সামনে তির ও বর্শা হাতে নিয়ে দাঁড়ানো ছিল। আর তাদের পেছনে ব্যবসায়ীরা। এত কাছাকাছি সত্ত্বেও তিনি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ভাষ্যকার দ্বারা কথা বলছিলেন। আর সেটা এ কারণে যে, তিনি তাদেরকে নিজের সমকক্ষ মনে করেন না। তখন আমার মনে আফসোস লাগল, আমরা এমন মানুষের দেশে কেন এলাম! তারা মূলত শ্বেতাঙ্গ মানুষদের প্রতি সম্মান দেখায় না। আমি ইবনে বাদার ঘরে গেলাম। তিনি সিলা শহরে থাকতেন। অনেক জ্ঞানী-গুণী মানুষ। আমি তাকে আগেই লিখে পাঠিয়েছিলাম যে, আমার জন্য একটি জায়গা ভাড়া করবেন। তিনি এর ব্যবস্থা করেন। এরপর আইওয়ালাতানের তত্ত্বাবধায়ক যাকে সেখানকার লোকেরা মানশাজো বলে, কাফেলার সবাইকে দাওয়াত করেন। আমি যাব না বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু কাফেলার লোকেরা যেতে বাধ্য করল। শেষ পর্যন্ত আমিও গেলাম। সেখানে অর্ধেক কদুর খোল আকৃতির বড় পাত্রে আমাদেরকে কিছু মধু ও দুধের সঙ্গে ভুট্টার গুঁড়া গুলিয়ে খেতে দেওয়া হয়। সবাই এটা পান করে সেখান থেকে চলে আসেন। আমি বললাম, এই কালো লোকটি আমাদেরকে এটা খাওয়ানোর জন্য দাওয়াত দিল! তারা জানাল, অতিথি আপ্যায়নের এটাই সর্বোচ্চ পদ্ধতি।

আমি তখন বুঝে গেলাম, এখানে কোনো আশা নেই। ইচ্ছা করলাম, আইওয়ালাতান থেকে হাজিদের কাফেলার সঙ্গে চলে যাব। কিন্তু পরে ভাবলাম, দেশটির রাজধানী দেখা দরকার। আইওয়ালাতানে পঞ্চাশ দিন অবস্থান করি। সেখানকার অধিবাসীরা আদর-আপ্যায়ন করেন। সেখানকার বেশিরভাগ বুযুর্গ, বিশেষ করে কাজি মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নিউমার ও তার ভাই ফকিহ ইয়াহইয়া মাদরাস আমাদের আপ্যায়ন করেন। এই শহরে প্রচুর গরম পড়ে। খেজুরের কিছু গাছ আছে। সেই গাছের ছায়ায় তরমুজের চাষ হয়। পানির পুকুর রয়েছে। ছাগলের গোশত প্রচুর পাওয়া যায়। এখানকার অধিবাসীরা মিশরীয় এক ধরনের কাপড় পরে। বেশিরভাগ অধিবাসী মাসুফা উপজাতি। নারীরা অত্যন্ত সুশ্রী হয়। এখানে অনেকগুলো প্রথা রয়েছে। পুরুষদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধের নামগন্ধও নেই। কেউ নিজেকে বাবার সন্তান বলে না, বরং মামার ভাগিনা বলে। ছেলেরা তাদের

বাবার উত্তরাধিকারী হয় না, বরং ভাগিনারা উত্তরাধিকারী হয়। এই রীতি আমি দুনিয়ার আর কোথাও দেখিনি, এই জাতি ও মালাবার সম্প্রদায়ের হিন্দুদের ছাড়া।

বিস্ময়কর বিষয় হলো, এই লোকেরা মুসলিম এবং নিয়মিত নামায-রোযা আদায় করে। এখানে কুরআনে হাফেয ও বড় বড় ফকিহও রয়েছেন। নারীরা নামাযের ব্যাপারে পাবন্দ হলেও পুরুষদের থেকে পর্দা করে না। কেউ তাদের বিয়ে করতে চাইলে বিয়ে করে নেয়। তারা স্বামীদের সঙ্গে বাইরে বের হয় না। আর গেলেও পরিবারের মুরব্বিদের জানায় না। এখানকার নারীরা পরপুরুষদের বন্ধু বানিয়ে নেয়। এমনিভাবে পুরুষদের বন্ধুও হয় অপরিচিত নারীরা। কোনো পুরুষ ঘরে গিয়ে তার স্ত্রীর কাছে অপরিচিত কোনো ব্যক্তিকে দেখলে এটাকে খারাপ মনে করা হয় না।

সুদানের নারীদের সীমাহীন স্বাধীনতা

আমি একদিন সেখানে অনুমতি নিয়ে কাজির ঘরে প্রবেশ করলাম। তার কাছে যুবতী এক নারী বসা ছিলেন। আমি তাকে দেখে ফিরে আসতে চাচ্ছিলাম। এটা দেখে ওই নারী হাসতে লাগলেন এবং একদমই লজ্জিত হলেন না। কাজি বললেন, আপনি চলে যাবেন না। এই নারী আমার বন্ধু। আমি এ কারণে বিস্মিত হলাম যে, কাজি একজন ফকিহ ও হাজি সাহেব। আমাকে কেউ কেউ এটাও বলেছেন, কাজি হজে যাওয়ার সময় এই বান্ধবীকে নিয়ে যেতে বাদশাহর কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন। তবে বাদশাহ অনুমতি দেননি। একদিন আমি আবু মুহাম্মাদের কাছে গেলাম। তিনি বিছানায় বসা ছিলেন। তার ঘরের মধ্যখানে একটি চৌকি বিছানো ছিল। সেখানে এক নারী বসা ছিল এবং এক পুরুষের সঙ্গে গল্প করছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই নারী কে? তিনি বললেন, আমার স্ত্রী। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই পুরুষ কে? বললেন, তার বন্ধু। আমি বললাম, আপনি তো আমাদের দেশে থেকেছেন এবং শরিয়তের বিধিনিষেধ সম্পর্কেও আপনার জানাশোনা আছে। তিনি জবাব দিলেন, আমাদের দেশে নারী-পুরুষের বন্ধুত্ব পবিত্র। অপবাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এটাও বললেন, আমাদের নারীরা আপনাদের নারীদের মতো নয়। তার এই দাম্ভিকতায় আমি বিস্মিত হলাম এবং চলে এলাম। আমি আর তার কাছে যাইনি। তিনি কয়েকবার আমাকে ডেকে পাঠান কিন্তু আমি যাইনি।

যখন আমি মালির দিকে সফর করলাম তখন মাসুফা উপজাতির এক লোক আমার সঙ্গী হলেন। মালি আইলাতান থেকে চব্বিশ মঞ্জিল দূরত্বে। এই রাস্তাটি অত্যন্ত নিরাপদ। এজন্য কাফেলার সঙ্গে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। আমার সঙ্গে আরো তিন বন্ধু ছিলেন। রাস্তায় ছায়াদার বড় বড় গাছ রয়েছে। এত বড় বড় গাছ যে, এক একটি গাছের নিচে কয়েকটি কাফেলা অবস্থান করতে পারে। কোনো কোনো গাছ এমন যে গাছের ডালপালাও নেই, পাতাও নেই। কিন্তু মূল গাছের ছায়াই এত দীর্ঘ যে, এতে অনায়াসে লোকজন বসতে পারে। অনেক প্রাচীন গাছের ভেতরে ফাঁকা জায়গায় পানি জমে থাকে। মুসাফিররা সেই পানি ব্যবহার করতে পারে। অনেক গাছে মৌমাছি বাসা বেঁধেছে। কাফেলার লোকেরা মৌমাছি সরিয়ে সেখান থেকে মধু সংগ্রহ করে থাকে। একটি গাছের ভেতর দেখলাম, এক তাঁতি বসে কাপড় বুনছেন। সেই লোক আমাকে দেখে হতচকিত হয়ে যায়।

মালি

সুদানের রাজধানী এবং সেখানকার বাদশাহ

মালিতে কারো অনুমতি ছাড়া যাওয়ার ব্যবস্থা নেই। আমি সেখানে যাওয়ার আগে শ্বেতাঙ্গদের কয়েকজনের কাছে চিঠি লিখেছিলাম। তাদের মধ্যে রয়েছেন মুহাম্মাদ বিন ফকিহ জাযাওয়ালি ও শামসুদ্দিন বিন তাকবিশ মিশরি। তারা আমার জন্য একটি বাড়ি ভাড়া করে রেখেছিলেন। আমি সানসারা নদী একটি নৌকায় করে পার হই। আমাকে কেউ বাধা দেয়নি। এরপর মালি শহরে পৌঁছি, যা সুদানের রাজধানী। আমি গিয়ে কবরস্থানের কাছে অবস্থান নিই। এরপর শ্বেতাঙ্গ লোকদের মহল্লায় যাই। সেখানে মুহাম্মাদ বিন ফকিহের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার জন্য নিজের বাড়ির সামনের একটি বাড়ি ভাড়া করেছিলেন। আমি সেই বাড়িতে উঠি। তার জামাতা ফকিহ কারী আবদুল ওয়াহেদ আমার জন্য আলোর ব্যবস্থা করলেন এবং খাবার নিয়ে এলেন। পরদিন ইবনে ফকিহ, শামসুদ্দিন ও আলি মারাকেশি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এলেন। আলী মারাকেশি একজন তালিবুল ইলম ছিলেন। মালির কাজি আবদুর রহিমও এলেন। তিনি ছিলেন হাবশি, হজ করে এসেছিলেন। আলেম, জ্ঞানী এবং অনেক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একজন মানুষ। তিনি আমাদের আপ্যায়নের জন্য একটি গরু পাঠান। তাদের দোভাষী দোগার সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি হাবশিদের মধ্যে একজন অমায়িক মানুষ। তিনিও আমাদের কাছে আপ্যায়নের জন্য একটি গরু পাঠান। ফকিহ আবদুল ওয়াহিদ, ইবনে ফকিহ ও শামসুদ্দিনও আমাদের জন্য খাবার পাঠান। তারা সবাই আমাদের যথাযথ আদর-আপ্যায়ন করেন। ইবনে ফকিহ বিয়ে করেছিলেন বাদশাহর চাচাতো বোনকে। তিনিও আমাদের জন্য খাবার পাঠাতেন। অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও পাঠাতেন। কাজি সাহেব আমাদের জন্য 'আজিদা' (ঘি ও আটা দিয়ে তৈরি হালুয়া) পাঠান। স্থানীয়রা এই খাবারটিকে উত্তম খাবার বলে মনে করেন। কিন্তু এই খাবার খেয়ে আমরা সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমরা মোট ছয়জন ছিলাম। এই অসুস্থতায় একজন মারাও যান। আমি সকালে নামায পড়তে গিয়েছিলাম। সেখানেই বেহুঁশ হয়ে পড়ি। আমি এক মিশরীয় ব্যক্তির কাছে এর প্রতিকার কী জানতে চাইলাম। তিনি 'বাইদার' নামে একটি ওষুধ আনলেন। সেটা ছিল কোনো গাছের শিকড়, সেটা মৌরি ও

চিনি মিশিয়ে পানিতে গুলিয়ে আমাকে খেতে দিলেন। এটা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যা খেয়েছিলাম সবকিছু বমির সঙ্গে বেরিয়ে গেল। এতে আমি বেঁচে গেলাম। তবে দুই মাস পর্যন্ত অসুস্থ ছিলাম।

মালির বাদশাহর নাম মানসা সুলাইমান। মানসা বলা হয় বাদশাহকে, আর সুলাইমান তার নাম। এই বাদশাহ খুবই কৃপণ প্রকৃতির। তার কাছ থেকে বড় উপহারের আশা করা বৃথা। ঘটনাক্রমে এই পুরো সময়ে অসুস্থতার কারণে আমি বাদশাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারিনি। তিনি আমিরুল মুমিনিন আবুল হাসানের স্মরণে একটি বড় দাওয়াতের আয়োজন করলেন। সেখানে ধর্মবেত্তা, ফকিহ, কাজি ও খতিবদের আমন্ত্রণ জানালেন। প্রত্যেককে কুরআনে কারিমের এক চতুর্থাংশ করে দেওয়া হয়। যখন তা খতম হয় তখন আবুল হাসানের রুহের মাগফেরাতের জন্য দোয়া হয়। পরে মানসা সুলাইমানের জন্য সবাই দোয়া করেন। যখন এই আয়োজন সম্পন্ন হয় তখন আমি সামনে এগিয়ে বাদশাহকে সালাম করি। কাজি, খতিব ও ইবনে ফকিহ বাদশাহর কাছে আমার পরিচিতি তুলে ধরেন। তিনি তার ভাষায় জবাব দেন। তারা বললেন, বাদশাহ আপনাকে বলেছেন, আল্লাহর প্রশংসা করুন। আমি 'আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল' (সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা' বললাম। আমি যখন ঘরে চলে এলাম বাদশাহ আমার জন্য খাবার পাঠালেন। প্রথম সেই খাবার কাজির ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি তার লোক দিয়ে তা পাঠিয়ে দেন ইবনে ফকিহের ঘরে। ইবনে ফকিহ এটা শুনে পায়ে হেঁটে আমার ঘরে আসেন এবং বলেন, উঠেন, বাদশাহ আপনার জন্য হাদিয়া পাঠিয়েছেন। আমি ভাবলাম, সেটা হয়ত খিলআত (বিশেষ পোশাক) এবং নগদ অর্থকড়ি হবে। কিন্তু পরে জানতে পারলাম তিনটি রুটি এবং সামান্য গরুর গোশতের তরকারি। আর কদুর একটি খোল ভর্তি টক দই। আমি এটা দেখে খুব হাসলাম। এই লোকদের স্বল্পবুদ্ধি এবং অল্প জিনিসে এত খুশি হওয়ার বিষয়টি আমাকে বিস্মিত করল।

দুই মাস সেখানে থাকলাম। বাদশাহ আমার জন্য কিছুই পাঠালেন না। ইতিমধ্যে রমযান মাস এসে গেল। আমি বাদশাহর রাজমহলে প্রায়ই আসা-যাওয়া করতাম। কাজি ও খতিবের কাছে গিয়ে বসতাম। দোভাষী দোগার সঙ্গে কথাবার্তা হতো। তিনি একদিন বললেন, আপনি যা বলার আমাকে বলুন, আমি ভাষান্তর করে বাদশাহকে শোনাব। রমযানের শুরুতে একদিন

বাদশাহ বসা ছিলেন। আমি সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, আমি গোটা দুনিয়া সফর করেছি এবং সবখানে স্থানীয় বাদশাহদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। আপনার শহরে এসেছি চার মাস হয়ে গেছে। আপনি আমাকে কিছু উপহারও দেননি, দাওয়াত করে খাওয়াননিও। আমি ফিরে গিয়ে আপনার কথা কী বর্ণনা করব! বাদশাহ বললেন, আমি তোমাকে দেখিনি এবং তোমার আসার কথাও আমার জানা ছিল না। কাজি ও ফকিহ দাঁড়িয়ে বললেন, হুজুর (বাদশাহ) আপনাকে তিনি সালাম করেছেন এবং আপনি তার জন্য খাবারও পাঠিয়েছেন।

পরে বাদশাহ আমার জন্য ঘর বরাদ্দ দেন এবং দৈনিক ভাতা নির্ধারণ করে দেন। রমযানের ২৭ তারিখ রাতে যখন কাজি, খতিব ও ফকিহদের জন্য নগদ অর্থ বণ্টন করছিলেন তখন আমার জন্যও ৩৩ মিসকাল সোনা পাঠান। আমি যখন চলে আসি তখনো একশ মিসকাল সোনা দিয়েছিলেন। বাদশাহ বেশির ভাগ সময় একটি উঁচু প্রাসাদে বসেন, যার দরজা ঘরের ভেতর দিকে। চত্বরের দিকে এই প্রাসাদের কোয়ার্টার রয়েছে, যা কাঠের তৈরি। এর নিচে তিনটি জানালা রয়েছে। এর পাল্লাগুলো সোনায় আবরিত অথবা রুপার ওপর সোনার প্রলেপ দেওয়া। দরজায় রেশমের কাপড় ঝুলানো থাকে। বাদশাহ যখন প্রাসাদে এসে বসেন তখন পর্দা উঠিয়ে দেওয়া হয়। যখন পর্দা উঠে যায় তখন এটা প্রমাণ করে যে, বাদশাহ প্রাসাদে এসেছেন। বাদশাহ যখন এসে বসেন জানালার পাল্লার জালিতে একটি রেশমি পতাকা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এতে মিশরীয় কারুকাজ করা একটি রুমাল বাঁধা থাকে। যখন লোকজন রুমালটি দেখে তখন বাদ্যযন্ত্র বেজে ওঠে। তখন রাজপ্রাসাদ থেকে তিনশ ক্রীতদাস বেরিয়ে আসে। তাদের কারো হাতে ধনুক আবার কারো হাতে বর্শা থাকে। কারো হাতে ঢালও থাকে। বর্শাধারীরা ডান ও বাম দিকে দাঁড়িয়ে যায়। তিরধারীরা দুই পাশে বসে যায়। এরপর দুটি ঘোড়া আনা হয়, যার মধ্যে বসার গদি ও লাগাম লাগানো থাকে। এগুলোর সঙ্গে দুটি ভেড়া থাকে। বলা হয়ে থাকে, এর কারণে ঘোড়াগুলো দেখা যায় না।

বাদশাহ যখন বসে যান তখন তিনজন ক্রীতদাস বাইরে আসেন এবং দৌড়ে গিয়ে বাদশাহর সহযোগী কানজা মুসাকে ডাকেন। এরপর ফেরারিরা আসেন। এখানে ফেরারি বলা হয় আমিরদের। এরপর আসেন কাজি ও খতিব। তারা সবাই অস্ত্রধারীদের সামনে ডান ও বাঁ পাশে বসে যান।

দোভাষী দোগা চত্বরের দিকে দরজায় দাঁড়িয়ে যান। তিনি হলুদ রঙের উন্নত কাপড় পরেন। তার মাথায় পাগড়ি বাঁধা থাকে। সেই পাগড়িতে নানা ধরনের কারুকাজ করা। স্বর্ণের খাপযুক্ত একটি তরবারি তার কোমরে ঝুলানো থাকে। পায়ে মোজা ও স্লিপার পরা থাকে। সেদিন দোভাষী ছাড়া আর কারো মোজা পরার অনুমতি নেই। তার হাতে দুটি বর্শা থাকে। একটি স্বর্ণের, আরেকটি রুপার। এর মূল অংশ লোহার। চত্বরের দিকে দরজার সামনে একটি বড় রাস্তা রয়েছে, যাতে সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগানো। সেখানে নিরাপত্তা কর্মী, ক্রীতদাস ও ভৃত্যরা বসে।

প্রত্যেক আমিরের সামনে তার একজন সাথী থাকে। যাদের হাতে বর্শা ও ধনুক থাকে। সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রও থাকে। সেই বাদ্যযন্ত্র হাতির দাঁতের তৈরি। কারো কারো হাতে বাঁশ ও লোহা দিয়ে তৈরি গান-বাজনার সরঞ্জাম থাকে। হাত দ্বারা সেগুলো বাজানো হয় এবং চমৎকার শব্দ বেরিয়ে আসে। প্রত্যেক আমিরের কাঁধে একটি তূণ ঝুলানো থাকে। তাদের হাতে থাকে তির। তারা ঘোড়ায় আরোহণরত অবস্থায় থাকেন। তাদের সঙ্গীরা কেউ পদাতিক আবার কেউ বাহনে চড়া অবস্থায় থাকেন। চত্বরের ভেতরে প্রাসাদের গেইটের কাছে এক ব্যক্তি দাঁড়ানো থাকে। বাইরে থেকে কেউ বাদশাহর কাছে কিছু নিবেদন করতে এলে তিনি দোভাষী দোগার কাছে এসে তা বলেন। দোভাষী গিয়ে বাদশাহকে তার কথা বলেন, পরে ওই ব্যক্তি বাদশাহর সঙ্গে কথা বলতে পারেন। বাদশাহ অনেক সময় প্রাসাদের চত্বরেও বসেন। চত্বরে একটি গাছের নিচে একটি প্যাভিলিয়ন আছে। এর তিনটি দরজা। এটাকে 'নিপতি' বলা হয়। সেখানে রেশমের কাপড় বিছানো থাকে এবং হেলান দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়। রেশমের তৈরি গম্বুজ আকারের একটি ছাতা টানিয়ে দেওয়া হয়। চত্বরে বাজপাখির মতো দেখতে একটি প্রাণী রয়েছে, যা স্বর্ণের তৈরি। বাদশাহ প্রাসাদের কোণার একটি দরজা দিয়ে বের হন। তার হাতে ধনুক থাকে। কাঁধে তূণ ঝুলানো থাকে। আর মাথায় শোভা পায় স্বর্ণখচিত রাজমুকুট। যা স্বর্ণখচিত চামড়ার তৈরি একটি ফিতা দ্বারা গলার নিচে বাঁধা থাকে। যার দুই পাশ ধাঁরালো ছুরির মতো তীক্ষ্ণ। লম্বায় যা এক বিঘতের চেয়ে বেশি। বাদশাহর গায়ে থাকে লাল রঙের একটি রোমান কাপড়, যা অনেক কারুকাজ করা। বাদশাহর সামনে থাকে গায়কেরা। তাদের হাতে সোনা-রুপার তৈরি বাদ্যযন্ত্র থাকে। আর বাদশাহর পেছনে থাকে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত তিনশ ক্রীতদাস।

বাদশাহ ধীরপদে হাঁটেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকদের দিকে তাকিয়ে দেখেন। পরে আস্তে আস্তে প্যাভিলিয়নে আরোহণ করেন, খতিব যেভাবে মিম্বরে চড়েন। তিনি যখন বসেন সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র বাজতে শুরু করে। পরে তিনজন ক্রীতদাস দ্রুত বাইরে আসে এবং বাদশাহর সহকারী ও আমিরদের ডাকতে থাকে। সবাই একে একে এসে বসে যান। পরে দুটি ঘোড়া আনা হয়, যার সঙ্গে দুটি ভেড়াও থাকে। দোভাষী দোগা দরজায় দাঁড়িয়ে যান। আর অন্যরা গাছের নিচে বড় রাস্তার পাশে বসে যান। হাবশিদের ছাড়া নিজেদের বাদশাহকে এত সম্মান করে আর কোনো জাতিকে দেখিনি। তারা বাদশাহর নামে কসম খায়। বাদশাহ যখন প্রাসাদে বসেন, যার আলোচনা আমি ইতিমধ্যে করেছি, আর কোনো ব্যক্তিকে ডেকে পাঠান তখন ওই ব্যক্তি শরীর থেকে কাপড় খুলে পুরোনো কাপড় পরেন। মাথা থেকে পাগড়িও খুলে ফেলেন। মলিন একটি টুপি মাথায় পরেন। পাজামা হাঁটু পর্যন্ত তুলে নেন। অত্যন্ত জীর্ণ-শীর্ণভাবে মাটিতে কনুই দিয়ে ভর করতে করতে বাদশাহর সামনে যান এবং রুকুসদৃশ অবস্থায় বাদশাহর কথা শোনেন।

যখন তাদের কেউ বাদশাহর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং বাদশাহ তার কথার জবাব দেন তখন ওই ব্যক্তি কোমর থেকে কাপড় সরিয়ে ফেলেন। কোমর ও মাথায় মাটি ঢেলে দেন যেভাবে গোসলের সময় পানি ঢেলে দেওয়া হয়। আমি বিস্মিত হই, এই মাটি তাদের চোখে পড়ে না। বাদশাহ যখন মজলিসে কথা বলেন তখন উপস্থিত সবাই তাদের মাথা থেকে পাগড়ি খুলে ফেলেন এবং চুপ হয়ে বাদশাহর কথা শোনেন। অনেক সময় উপস্থিত লোকদের থেকে কেউ বাদশাহর সামনে দাঁড়ান এবং নিজের কাজের বর্ণনা দেন। আর বলেন, আমি অমুক দিন অমুক কাজ করেছি। অমুক দিন অমুক লড়াই করেছি। যারা এই কাজ সম্পর্কে অবগত তারা এই কথার সত্যায়ন করেন। আর এই সত্যায়নের আলামত হলো, তারা ধনুক দ্বারা এমন শব্দ করেন যা তির ছোড়ার সময় বের হয়। যখন বাদশাহ বলেন, তুমি সত্য বলেছ, তখন তারা এর জন্য কৃতজ্ঞতা আদায় করেন। তখন সেই ব্যক্তি কাপড় খুলে শরীরে মাটি ঢালেন। তাদের প্রথা অনুযায়ী এটাই সর্বোচ্চ আদবকেতা।

সুদানের বাদশাহর অসন্তোষ

চাচাতো বোন ও রানির ওপর

আমি যখন মালিতে ছিলাম বাদশাহ তার বড় স্ত্রীর ওপর অসন্তুষ্ট হন। তিনি ছিলেন বাদশাহর চাচাতো বোন। তার উপাধি ছিল 'কাসা'। তাকে বাদশাহর সঙ্গে শাসনক্ষমতায় অংশীদার মনে করা হতো। মিম্বরে খুতবা দেওয়ার সময় বাদশাহর সঙ্গে তার নামও উচ্চারণ করা হতো। এই রেওয়াজ সুদানের সব রাষ্ট্রেই প্রচলিত। বাদশাহ তার রানিকে কোনো আমিরের কাছে বন্দি করেন। তার স্থলে 'বানজু' নামে এক নারীকে রানি বানিয়ে নেন।

এই নারী শাহজাদি ছিল না। এজন্য লোকদের মধ্যে তাকে নিয়ে শোরগোল পড়ে যায়। অসন্তোষও ছড়িয়ে পড়ে। যখন 'কাসা' অর্থাৎ প্রথম রানি বন্দিদশা থেকে মুক্ত হলেন তখন তিনি 'বানজু'র কাছে গেলেন তাকে মুবারকবাদ জানাতে। তখন সারা শরীরে বালু ঢাললেও মাথায় ঢাললেন না। 'বানজু' এ ব্যাপারে বাদশাহর কাছে অভিযোগ করলেন। কারণ তাদের রেওয়াজ অনুযায়ী এটা অবমূল্যায়ন। এই কথা শুনে বাদশাহ রাগ করলেন। 'কাসা' জামে মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। বাদশাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। তাকে রাজমহলে ডেকে পাঠালেন। সেখানকার রেওয়াজ হলো, যখন বাদশাহর সামনে যাবে তখন গায়ের সব কাপড় খুলে একদম নগ্ন হয়ে যাবে। 'কাসা'ও এটাই করলেন। বাদশাহ এতে খুশি হলেন। তিনি রেওয়াজ অনুযায়ী সাত দিন সকাল-সন্ধ্যা বাদশাহর সামনে হাজির হলেন। 'কাসা'ও তার ক্রীতদাস ও বাঁদিদের নিয়ে প্রতিদিন ঘোড়ায় সওয়ার হতেন। তাদের সবার মাথায় মাটি থাকত এবং নেকাব খুলে শাহি মহলের চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এদিকে 'কাসা'র বিষয়টি নিয়ে লোকদের মধ্যে আলোচনা-সমালোচনা অব্যাহত রইল। একপর্যায়ে বাদশাহ লোকদের জড়ো করলেন। বাদশাহর পক্ষ থেকে তার দোভাষী দুগা বললেন, আপনাদের মধ্যে 'কাসা' সম্পর্কে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে। কিন্তু আপনারা জানেন না তিনি কী মারাত্মক অন্যায় করেছেন। এরপর দুগা এক বাঁদিকে আনলেন, যার পায়ে শিকল পরানো ছিল। তাকে বলা হলো, তুমিই বিষয়টি বর্ণনা করো। সেই বাঁদি বলল– আমাকে 'কাসা' পালিয়ে যাওয়া বাদশাহর চাচাতো

ভাই হাতিলের কাছে পাঠান। তাকে এই বার্তা দেওয়া হয়, তুমি চলে এসো, বাদশাহকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পুরো বাহিনী তোমাকে সহযোগিতা করবে। যখন আমিররা এই কাহিনি শুনলেন তখন তারা বললেন, নিঃসন্দেহে কাসা মৃত্যুদণ্ডের মতো অন্যায় করেছেন। এটা শুনে 'কাসা'র ভয় হলো। তিনি খতিবের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এই দেশের রেওয়াজ হলো, মসজিদে যাওয়া সম্ভব না হলে কোনো অপরাধী খতিবের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

সুদানিদের অভ্যাস ও প্রথা

সুদানি অর্থাৎ হাবশিদের যে কাজগুলো আমার পছন্দ হয়েছে সেগুলো হলো, তা অত্যাচার-নিপীড়নকে একদম প্রশ্রয় দেয় না। তাদের বাদশাহ খুবই ন্যায়বিচারক। কাউকে ছাড় দেন না। এখানে নিরাপত্তাও রয়েছে সর্বোচ্চ পর্যায়ে। মুসাফির কিংবা স্থানীয় কারো চোর-ডাকাতের কোনো ভয় নেই। কোনো শ্বেতাঙ্গ এখানে মারা গেলে তার সম্পদে হাতও লাগানো হয় না। চাই যত বেশি সম্পদই হোক না কেন। প্রকৃত উত্তরাধিকারী না এলে এই সম্পদ কোনো নির্ভরযোগ্য শ্বেতাঙ্গ লোকের কাছে রেখে দেওয়া হয়। নামাযের ব্যাপারে এখানকার লোকেরা বেশ আন্তরিক। তারা নামায আদায় করে জামাতের সঙ্গে। কোনো ছেলে বা মেয়ে নামায না পড়লে তাকে মারধর করা হয়। জুমার নামাযে এত বেশি ভিড় হয় যে, সকাল সকাল গিয়ে জায়গা না নিলে জায়গা পাওয়া কঠিন হয়ে যায়। স্থানীয়রা তাদের ক্রীতদাসদের জায়নামায দিয়ে পাঠিয়ে দেন। তারা গিয়ে মসজিদে জায়গা দখল করে। এখানকার জায়নামায এক ধরনের গাছের পাতা দ্বারা বানানো, যা অনেকটা খেজুর পাতার মতো। তবে এসব গাছে ফল হয় না।

এখানকার লোকেরা জুমার দিন সাদা ও পরিষ্কার কাপড় পরে। কারো কাছে পুরোনো জামা থাকলে সেটা জুমার নামাযের জন্য পরিষ্কার করে পরে। এই দেশের লোকেরা কুরআনে কারিম হিফয করতে প্রচুর শ্রম দিয়ে থাকে। কোনো শিশু কুরআন মুখস্থ করায় অলসতা করলে তার দুই পায়ে বেড়ি পরানো হয়। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছি, তোমরা এই শিশুদের ছাড়ো না কেন? তারা বলেছে, যতক্ষণ কুরআনে কারিম হিফয সম্পন্ন না করবে ততক্ষণ তাদের ছাড়া হবে না। একদিন আমি সুদর্শন এক যুবককে দেখলাম। সে অনেক উন্নতমানের কাপড় পরেছে। কিন্তু তার পায়ে বেড়ি

পরানো। আমি আমার সাথীসঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলাম, এই ছেলে কি কাউকে হত্যা করেছে? তারা এই প্রশ্ন শুনে হাসলেন। বললেন, কুরআনে কারিম হিফয না করার কারণে তাদের পায়ে এই বেড়ি পরানো হয়েছে।

হাবশিদের যেসব কাজ আমার কাছে অপছন্দ হয়েছে সেগুলো হলো বাঁদি, চাকরানি ও ছোট ছোট মেয়েদের সম্পূর্ণ নগ্ন ছেড়ে দেয়। রমযান মাসে রাস্তাঘাটে এ ধরনের মেয়েদের বেশি দেখা যায়। কারণ সেখানকার নিয়ম হলো, প্রত্যেক আমির রাজপ্রাসাদে গিয়ে রোযা ভাঙেন। প্রত্যেক আমিরের জন্য খাবার নিয়ে আসে বিশজনের বেশি বাঁদি। তারা সবাই নগ্ন অবস্থায় থাকে। যখন কোনো নারী বাদশাহর সামনে হাজির হয় তখন তাকেও পুরো নগ্ন হতে হয়। বাদশাহর মেয়েরাও নগ্ন অবস্থায় আসে। রমযানের ২৭ তারিখ রাতে আমি দেখেছি, বাদশাহর মহল থেকে শতাধিক নারী খাবার নিয়ে বের হয়েছে, তাদের সঙ্গে বাদশাহর দুই মেয়েও রয়েছে, তাদের সবাই ছিল নগ্ন। তাদের আরেকটি দোষ হলো, আদবকেতা দেখাতে গিয়ে মাথার ওপর মাটি ঢেলে দেয়। কবিরা কবিতা পাঠের সময় স্বীয় আকৃতি হাবশি কৌতুকীদের মতো করে। আরেকটি দোষ হলো, অধিকাংশ হাবশি মৃত প্রাণী, কুকুর ও গাধা ভক্ষণ করে।

সুদানের মানুষখেকো অধিবাসীরা

হাজি ফারবা মাঘা আমাকে বলেছেন, যখন মানসা মুসা এই নদীর তীরে পৌঁছেন তার সঙ্গে সাদা চামড়ার একজন কাজি ছিলেন, যার নাম ছিল আবুল আব্বাস দাকালি। বাদশাহ তাকে চার হাজার মিসকাল সোনা দান করেন। যখন তিনি মায়মায় পৌঁছেন তখন বাদশাহ অভিযোগ করেন, চার হাজার মিসকাল সোনা তার ঘর থেকে চুরি হয়ে গেছে। বাদশাহ মায়মার গভর্নরকে ডেকে পাঠালেন। তাকে বললেন, চোরকে খুঁজে বের করতে না পারলে তাকে হত্যা করা হবে। গভর্নর অনেক তথ্য-তালাশ করলেন, কিন্তু চোরের সন্ধান পেলেন না। তিনি কাজির বাড়িতে গেলেন এবং সেখানকার চাকর-বাকর ও ক্রীতদাসদের ওপর অনেক কঠোরতা আরোপ করেন। এক বাঁদি বলল, কাজির কাছ থেকে সোনা চুরি হয়নি, তিনি এই সোনা অমুক জায়গায় মাটিতে পুঁতে রেখেছেন। আমির সেই সোনা বের করে বাদশাহর দরবারে নিয়ে গেলেন।

বাদশাহ এতে কাজির ওপর ক্ষিপ্ত হলেন এবং তাকে ওই দেশে পাঠিয়ে দিলেন যেখানে মানুষকে কাঁচা খেয়ে ফেলে। কাজি ওই দেশে চার বছর ছিলেন। কিন্তু তাকে কেউ খায়নি। পরে তাকে ফিরিয়ে আনা হয়। সেখানকার লোকদের ভাষ্য, সাদা চামড়ার মানুষদের খাওয়া ক্ষতিকর। এর প্রমাণ হলো, তারা কাঁচা হয়ে থাকে, এখনো পোক্ত হয়নি। নিগ্রোরা পোক্ত হয়ে থাকে, এজন্য তাদের খাওয়া হয়। মানসা সুলাইমানের কাছে মানুষখেকো ওই লোকদের একটি দল এলো। সেখানে তাদের দলনেতাও ছিল। তারা কানে বড় বড় লকেট পরে। প্রতিটি লকেট আধা বিঘতের কম নয়। তারা সিল্কের গাউন পরে। তাদের দেশে সোনার খনি আছে।

বাদশাহ তাদের অনেক আদর-যত্ন করেন। তাদের সঙ্গে একজন মানুষও দেন, যাকে তারা জবাই করে খায়। সেই লোকের রক্ত তারা চেহারা ও গায়ে মেখে বাদশাহর কাছে আসে কৃতজ্ঞতা জানাতে। তারা যখনই আসত বাদশাহ একজনকে দিতেন তাদের আপ্যায়নের জন্য। আমাকে জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, মানুষের হাত ও সিনার গোশত তাদের কাছে বেশি প্রিয়।

টিম্বুকটু

এই শহরের অধিবাসীদের বিস্ময়কর সব প্রথা

পরে আমরা টিম্বুকটু পৌঁছি। এই শহর নীলনদ থেকে চার মাইল দূরত্বে। এই শহরের অধিকাংশ নাগরিক মাসুফা উপজাতীয়। যারা নিচ থেকে নিয়ে মুখ পর্যন্ত চেহারা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখে। সেখানকার গভর্নর ফারবা মুসা। আমি একদিন তার কাছে গেলাম। তখন এক মাসুফা নেতা এলেন নিজ সম্প্রদায়ের লোকজনসহ। ফারবা মুসা তাকে খিলআত হিসেবে একটি চাদর, একটি পায়জামা ও একটি পাগড়ি দিলেন। সবগুলো কাপড়ই রঙিন। সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের নেতাকে একটি ঢালের ওপর বসায় এবং ঢালসহ তাকে মাথায় তুলে নেয়। এই শহরে বিখ্যাত কবি আবু ইসহাক সাহেলি গারনাথির কবর। তিনি নিজ শহরে তুয়াইজিন নামে বেশি পরিচিত ছিলেন। সেখানে সিরাজুদ্দিন বিন কুয়িকের কবরও আছে। এই ব্যক্তি আলেকজান্দ্রিয়ার বড় ব্যবসায়ী ছিলেন।

যখন মানসা মুসা হজের জন্য গেলেন তখন মিশরের বাইরে সিরাজুদ্দিনের একটি বাগানে যাত্রাবিরতি করেছিলেন। ওই বাদশাহর কিছু খাজনার প্রয়োজন পড়ে। তখন তিনি ও তার আমিররা সিরাজুদ্দিনের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। সিরাজুদ্দিন তাদের সঙ্গে নিজের প্রতিনিধি পাঠান। সেই লোক মালিতে অবস্থান করেন। এরপর সিরাজুদ্দিনও নিজের ছেলেকে নিয়ে আসেন। যখন টিম্বুকটুতে পৌঁছলেন তখন আবু ইসহাক সাহেলি তাকে দাওয়াত দিলেন। ঘটনাক্রমে সেই রাতেই তিনি মারা যান। এটা নিয়ে লোকদের মধ্যে শোরগোল শুরু হলো এবং তারা আবু ইসহাকের ওপর অপবাদ আরোপ করল যে, তিনি সিরাজুদ্দিনকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছেন। কিন্তু তার ছেলে বললেন, আমিও তো বাবার সঙ্গে একই খাবার খেয়েছি। যদি সত্যিই খাবারে বিষ মেশাত তাহলে তো আমিও মারা যেতাম। মূলত সিরাজুদ্দিনের সময় শেষ হয়ে এসেছিল। তার ছেলে মালিতে গেলেন এবং ঋণ ফেরত চেয়ে মিশরে চলে গেলেন।

টিম্বুকটু থেকে একটি ছোট নৌকায় চড়ে, যা শুধু একটি কাঠ খোদাই করে বানানো হয়েছে, নীলনদ পেরিয়ে চললাম। রাতের বেলা কোনো গ্রামে

অবস্থান করতাম। সেখান থেকে খাবার ও পানীয় কিনতাম কাঁচের অলংকারাদি ও সুগন্ধির বিনিময়ে। একটি শহরে আমরা পৌঁছলাম, যার নাম আমি ভুলে গেছি। এই শহরের গভর্নর ছিলেন ফারইয়া সুলাইমান। এই ব্যক্তি ছিলেন জ্ঞানীগুণী, তিনি হাজিও ছিলেন। বীরত্ব ও রাজনীতিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কেউ তার ধনুক চালাতে পারত না। আমি তার চেয়ে লম্বা ও স্বাস্থ্যবান কোনো হাবশিকে দেখিনি। এই শহরে আমার কিছু ভুট্টার প্রয়োজন দেখা দেয়। আমি আমিরের কাছে গেলাম। সেদিন ছিল মিলাদুন্নবীর দিন। আমি গিয়ে সালাম করলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় থেকে এসেছেন? তখন তার কাছে এক ফকিহ বসে লিখছিলেন। আমি তার কাছ থেকে কাঠ টুকরো নিয়ে তাতে লিখে দিলাম—হে ফকিহ! আপনার আমিরকে বলুন, আমাদের পাথেয়ের জন্য কিছু ভুট্টার প্রয়োজন। আপনাকে সালাম।

কাঠ টুকরোটি আমি ফকিহের হাতে দিলাম। তিনি এটা নিয়ে চুপি চুপি পড়লেন এবং নিজ ভাষায় আমিরের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। এরপর তিনি এটা শব্দ করে পড়লেন। আমির বুঝে গেলেন। তিনি আমাকে হাতে ধরে নিজ প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। তার কাছে প্রচুর পরিমাণ ঢাল, ধনুক ও বর্শা ছিল। ইবনে জাওযির কিতাব মাদহাশও ছিল। আমি তা পড়তে লাগলাম। এরপর এক ধরনের পানীয় নিয়ে আসা হলো, যাকে 'দাকনু' বলা হয়। ভুট্টার ছাতু পানিতে মিশিয়ে মিশিয়ে মধু ও দুধের সংমিশ্রণে তৈরি খাবার পানি দ্বারা খেতে হয়। এরপর একটি তরমুজ আনা হয়। আমি সেটা থেকে কিছু অংশ খাই। এরপর অল্প বয়সী একটি ক্রীতদাস এলো। আমির আমাকে এই ক্রীতদাসটি দিয়ে বললেন, এর মালিকানা বুঝে নিন। তাকে দেখে রাখবেন যেন পালিয়ে যেতে না পারে। আমি তাকে নিয়ে চলে যেতে চাচ্ছিলাম। বলা হলো, একটু অপেক্ষা করেন, আপনার জন্য খাবার আসছে। ইতিমধ্যে দামেশকের এক বাঁদি এলো। সে আমার সঙ্গে আরবিতে কথাবার্তা বললো। আমি তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতেই ঘরের ভেতর থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে এলো। বাঁদি ভেতরে গেল কী হয়েছে তা জানতে। সে ফিরে এসে আমিরকে জানাল, আপনার মেয়ে মারা গেছে। আমির বললেন, কান্নার আওয়াজ আমার অপছন্দ। চলুন, নদীর তীরে। সেখানে আমার ঘর রয়েছে। আমার জন্য আমির ঘোড়া আনালেন। আমাকে ঘোড়ায় চড়তে বললেন। আমি বললাম, আপনি পায়ে হেঁটে যাবেন আর আমি ঘোড়ায় চড়ব এটা হতে

পারে না। পরে আমরা সবাই পায়ে হেঁটে চললাম এবং নদী তীরবর্তী আমিরের বাড়িতে পৌঁছলাম। সেখানে আমাদের জন্য খাবার এলো। আমি খাবার খেয়ে আমিরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আমি সুদানে এই আমিরের চেয়ে উদার মনের আর কাউকে দেখিনি। তিনি যে ক্রীতদাস আমাকে দিয়েছিলেন সে এখনো আমার কাছে রয়েছে।

বার্বার জাতির বিচিত্র সব বৈশিষ্ট্য

পরে আমরা বারদামায় পৌঁছলাম। এখানে বার্বার জাতি বাস করে। তাদের পুরো কাফেলা নিজস্ব হেফাজতে থাকে। এক্ষেত্রে তারা পুরুষের তুলনায় নারীদের প্রতি বেশি খেয়াল রাখে। এই লোকজন বেদুইন। কোনো এক জায়গায় বেশি দিন থাকে না। তাদের তাঁবুগুলোও বিচিত্র। কাঠের খুঁটি দিয়ে এর ওপর চাঁটাই বিছিয়ে দেয়। পরে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে কাঠ দিয়ে এর ওপর চামড়া বা কাপড় বিছিয়ে দেয়। তাদের নারীরা অনেক সুন্দরী। শারীরিকভাবে স্থূল ও গায়ের রং সাদা। এই সম্প্রদায়ের নারীদের চেয়ে মোটা দেহের নারী আমি কোথাও দেখিনি। তাদের প্রধান খাদ্য গাভীর দুধ। সকাল-সন্ধ্যা ভুট্টার ছাতু পানিতে মিশিয়ে খায়। কেউ তাদের বিয়ে করতে চাইলে করে নেয়। তবে এই শর্তে বিয়ে করে যে, তাদের এলাকায় বা আশপাশে বসবাস করতে হবে। নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে তারা যেতে চায় না।

এখানে প্রচণ্ড গরম এবং পীত (দেহের তেঁতো পদার্থ) বেড়ে যাওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমি দ্রুত সফর করে তাগাদ্দায় পৌঁছি। সেখানে শায়খ সাঈদ বিন আলী জাযুলির ঘরের পাশে অবস্থা করি। কাজি আবু ইবরাহিম জানাতি আমার মেহমানদারি করেন। জাফর বিন মাসুফিও মেহমানদারি করেন। তাগাদ্দার ঘরবাড়ি লাল রঙের পাথরের তৈরি। সেখানকার পানি তামার খনি হয়ে আসে। এজন্য পানির রং ও স্বাদ পাল্টে যায়। এখানে ফসল খুব কম হয়। কিছু গম হয়। তা বহিরাগত ব্যবসায়ী ও আগন্তুকরা খায়। এক মিসকাল স্বর্ণের বিনিময়ে বিশ মুদ গম পাওয়া যায়। সেখানকার মুদ আমাদের দেশের মুদের এক তৃতীয়াংশ। এখানে বিচ্ছু অনেক বেশি। তবে এখানকার বিচ্ছুর দংশনে শিশুরা মারা যায়। যদিও বয়স্কদের মারা যাওয়ার ঘটনা খুবই বিরল।

আমি থাকাকালে একদিন শায়খ সাদি বিন আলীর ছেলেকে বিচ্ছু দংশন করে। সে সকালে মারা যায়। আমিও তার জানাযায় শরিক হই। এই শহরের অধিবাসীরা ব্যবসা ছাড়া আর কোনো কাজ করে না। প্রতি বছর তারা মিশরে যায় এবং সেখান থেকে কাপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে আসে। তবে এখানকার লোকেরা বিলাসিতাপ্রিয়। তাদের কাছে অনেক ক্রীতদাস ও বাঁদি থাকে। একই অবস্থা আইলাতান ও মালির অধিবাসীদের। শিক্ষিত বাঁদি খুব কম বিক্রি হয়। সেগুলোর দামও বেশি।

তাগাদ্দায় থাকাকালে আমি একটি শিক্ষিত বাঁদি কিনতে চাইলাম। কিন্তু পাচ্ছিলাম না। পরে কাজি আবু ইবরাহিম তার এক বন্ধুর একটি বাঁদি আমার কাছে পাঠালেন। আমি সেটা পঁচিশ মিসকালে কিনে নিলাম। কিন্তু পরে এর বিক্রেতা অনুতপ্ত হলেন এবং তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানালেন। আমি বললাম, তাকে এই শর্তে ফেরত দিতে পারি যে, আপনি আমাকে আরেকটি এ ধরনের বাঁদির সন্ধান দেবেন। তিনি বললেন, আলী আগিউলের কাছে একটি বাঁদি আছে। তিনি ওই মাগরেবি যিনি আমার বোঝা বহনে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং আমার পিপাসার্ত ক্রীতদাসকে পানি দিয়েছিলেন। আমি সেই বাঁদি কিনে নিলাম। আগে যে বাঁদি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম সেটার চেয়ে এটা বেশি ভালো ছিল। এই মাগরেবিও বিক্রির পর আফসোস করতে লাগলেন। ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমাকে খোশামোদও করলেন। আমি আগের কর্মকাণ্ডের কারণে তার প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলাম, এজন্য সেই আচরণের প্রতিশোধ নিতে বাঁদি ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানালাম। কিন্তু যখন সে এই বাঁদির জন্য পাগলপ্রায় হয়ে গেল এবং মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গেল তখন আমি তাকে বাঁদিটি ফিরিয়ে দিলাম।

তাগাদ্দায় শহরের বাইরে তামার খনি রয়েছে। মাটি খনন করে তামা উঠিয়ে তা শহরে নেওয়া হয়। সেগুলো গলিয়ে তামার আসবাবপত্র বানানো হয়। এখানকার বাঁদি-গোলামরাও সেই কাজই করে। তামা গলানোর পর যখন তা লাল বর্ণের হয়ে যায় তখন তা অনেক বড় বড় টুকরো করা হয়। এর মধ্যে কিছু টুকরো মোটা, আবার কিছু টুকরো পাতলা হয়ে থাকে। এগুলো মুদ্রা হিসেবেও চলে। পাতলা টুকরো দ্বারা গোশত, ছাগল ইত্যাদি কেনা হয়। আর মোটা টুকরো দ্বারা ক্রীতদাস, বাঁদি, গম-যব এগুলো কেনা হয়। এখান থেকে তামা কাওবারে যায়, যা অমুসলিম অধ্যুষিত দেশ। জাগানি ও

বারনাওয়ায়ও নিয়ে যায়, যা তাগাদ্দা থেকে চল্লিশ মনজিল দূরত্বে। বারনাওয়ার অধিবাসীরা মুসলিম। তাদের বাদশাহর নাম ইদরিস। তিনি কারো সামনে আসেন না, পর্দার পেছনে থেকে কথা বলেন। সেখান থেকে সুন্দরী বাঁদি, ক্রীতদাস, লাল রঙের কাপড় ও তামার বিভিন্ন পণ্য নিয়ে আসে।

আমি যখন তাগাদ্দায় ছিলাম, কাজি ইবরাহিম, খতিব মুহাম্মাদ, শিক্ষক আবু হাফস, শায়খ সাঈদ বিন আলী বাদশাহর কাছে যাচ্ছেন। এই লোক বার্বার সম্প্রদায়ের। তার নাম আজার। তাগাদ্দা থেকে সেটা এক দিনের পথ। আরেক বার্বার বাদশাহ, যার নাম ছিল তিকরিকরি, তার সঙ্গে ছিল এই বাদশাহর বিরোধ। লোকেরা তাদের মধ্যে সন্ধি করাতে যাচ্ছিল। আমিও একটি কাফেলা নিয়ে গেলাম। যারা আগে গিয়েছিল তারা বাদশাহকে আমার আসার খবর দিলেন। তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গবিবিহীন ঘোড়ায় চড়ে চলে এলেন। এখানকার লোকেরা ঘোড়ার ওপর গদি রাখে না। গদির পরিবর্তে শুধু লাল রঙের একটি চাদর ঘোড়ার ওপর বিছিয়ে দেয়। বাদশাহ একটি চাদর, পায়জামা ও নীল রঙের একটি পাগড়ি পরা ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তার ভাতিজা। এই সম্প্রদায়ে ভাতিজা হয় উত্তরাধিকারী। তিনি যখন এলেন আমরা সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং বাদশাহর সঙ্গে মুসাফাহা করলাম।

বাদশাহ আমার খোঁজখবর নিলেন। আমি সবকিছু খুলে বললাম। বাদশাহ তার অনুসারীদের একজনের বাড়িতে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমার জন্য খাবারও পাঠালেন। আমি যেখানে অবস্থান করি এর পাশেই বাদশাহর মা ও বোনের ঘর। তারা উভয়েই আমার কাছে আসেন এবং আমাকে সালাম করেন। তার মা আমার জন্য রাতের বেলা দুধ পাঠাতেন। তারা রাতের বেলা দুধ দোহন করে এবং তা রাতে ও সকালে পান করে। এখানকার লোকেরা তরিতরকারি একদমই খায় না। এমনকি তরিতরকারি চিনেও না। তাদের কাছে আমি ছয় দিন ছিলাম। বাদশাহ প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় আমার জন্য একটি করে ভেড়া ভুনা করে পাঠাতেন। বিদায়ের সময় একটি উটনি ও দশ মিসকাল সোনা উপহার হিসেবে দেন। সেখান থেকে বিদায় নিয়ে তাগাদ্দার শহরে পৌঁছি।

দেশের প্রতি অনুরাগ

যখন আমি তাগাদ্দায় ফিরে আসি মুহাম্মাদ বিন সাঈদ সাজালমাসির এক ক্রীতদাস এলো এবং আমিরুল মুমিনিনের একটি চিঠি আমাকে দিল। সেখানে আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে, রাজধানীতে এসো। আমি চিঠিতে চুমু খেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ বাস্তবায়ন শুরু করলাম। বাহনের জন্য এক তৃতীয়াংশ ও সাঁইত্রিশ মিসকাল সোনায় দুটি উট কিনলাম এবং তাওয়াতের দিকে রওনা করলাম। সঙ্গে সত্তর দিনের পাথেয় নিলাম। কেননা তাগাদ্দা ও তাওয়ার মধ্যখানে কোনো তরিতরকারি পাওয়া যায় না। শুধু গোশত, দুধ, ঘি ও কাপড় পাওয়া যায়।

মুসাফির ফিরে আসে নিজ দেশে

আমি ১১ শাবান বৃহস্পতিবার তাগাদ্দা থেকে একটি বড় কাফেলার সঙ্গে রওনা করি। এই কাফেলায় জাফর তাওয়াতিও ছিলেন। তিনি অনেক বড় আলেম। এ ছাড়া আমাদের সঙ্গে তাগাদ্দার কাজি ফকিহ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহও ছিলেন। এই কাফেলায় প্রায় ছয়শ বাঁদি ছিল। সেখান থেকে আমরা কাবির শহরে পৌঁছি, যা কিরকিরির সুলতানের এলাকা। এখানে ভেষজ অনেক হয়। এখানকার লোকেরা বার্বার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছ থেকে ছাগল কিনে এবং এর গোশত শুকিয়ে তাওয়াতে নিয়ে যায়। সেখান থেকে আমরা একটি মরুপ্রান্তরে প্রবেশ করি। তিন দিন পর্যন্ত কোনো জনপদ চোখে পড়েনি। কোথাও পানির কোনো উৎসও নেই।

এরপর পনেরো দিন আরেকটি মরুপ্রান্তরে চলি। সেখানে অবশ্য পানির উৎস ছিল। কিন্তু সেখানেও কোনো জনপদ নেই। পরে এমন একটি জায়গায় পৌঁছি যেখানে রাস্তা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একটি তাওয়াতে গেছে, আরেকটি গায়ত হয়ে মিশরে। এখানে পানির পুকুর রয়েছে। এই পানি লোহার খনি হয়ে আসে। সাদা কাপড় এই পানি দ্বারা ধৌত করলে তা কালো হয়ে যায়।

সেখান থেকে দশ দিন সফর করে হাকারে পৌঁছি। এখানকার অধিবাসীরাও বার্বার সম্প্রদায়ের। তারা মুখ ঢেকে রাখে। এই লোকেরা ভালো নয়। এক সর্দার আমার সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করেন। তিনি কাফেলা আটকে দেন। কাপড় ও মালামাল ছিনিয়ে নেওয়া পর্যন্ত আমাদের সামনে এগোতে দেননি। আমরা রমযান মাসে তাদের দেশে পৌঁছি। তারা রমযান মাসে রাস্তায় লুটপাট চালাত না এবং কাফেলাকে কিছু বলত না। কোনো চোরও রাস্তায় মালামাল পড়ে থাকতে দেখে তা ওঠাত না। একই অবস্থা গোটা বার্বার সম্প্রদায়ের। হাকারে আমরা পুরো এক মাস পর্যন্ত সফর করি। এখানে সবজি অনেক কম। পাথর অনেক বেশি। রাস্তা খুবই দুর্গম। ঈদের দিন আমরা বার্বারদের দেশে পৌঁছি। তাদের মুখ ঢাকা ছিল। তারা আমাদের কাছে আমাদের দেশের অবস্থা সম্পর্কে খবর দেয়। বলে, বনি খারাজ ও বনি ইয়াগমোর বিদ্রোহী হয়ে গেছে। তারা তাওয়াতের তাসাবস্ত এলাকায় অবস্থান করছে। এই খবর শুনে কাফেলার লোকদের মধ্যে আশঙ্কা দেখা দেয়।

পরে আমরা বোদায় পৌঁছি। এটি তাওয়াতের বড় একটি গ্রাম। এখানকার ভূমি পাথুরে। অনেক খেজুর উৎপাদন হয়। কিন্তু এখানকার খেজুর খুব একটা ভালো নয়। যদিও এখানকার লোকেরা তাদের খেজুরকে সাজালমাসার খেজুরের চেয়েও ভালো মনে করে। এখানে খাদ্যশস্য যেমন উৎপাদন হয় না, তেমনি ঘি ও তেলও পাওয়া যায় না। এসব জিনিস তারা অন্য দেশ থেকে আনে। এখানকার অধিবাসীরা খেজুর ও পঙ্গপাল খেয়ে বাঁচে। এখানে পঙ্গপাল অনেক হয়। এগুলো দ্বারা ঘর ভরে যায় এবং সকাল হওয়ার আগেই সংরক্ষণ করে। কেননা পঙ্গপাল রাতের বেলা ঠান্ডার কারণে উড়তে পারে না। বোদায় আমরা কয়েক দিন ছিলাম। সেখান থেকে একটি কাফেলার সঙ্গে রওনা করি। যিলকদের মাঝামাঝি সময়ে সাজালমাসা শহরে পৌঁছে যাই। সেখান থেকে রওনা দিই যিলহজের ২ তারিখে। সেটা প্রচণ্ড শীতের সময় ছিল। রাস্তায় প্রচুর পরিমাণে ররফ পড়ে। সমরকন্দ, বুখারা, খুরাসান ও তুর্কিস্তানের রাস্তায় প্রচণ্ড বরফ পড়তে দেখেছি। কিন্তু উম্মে জানিবার রাস্তা এর চেয়েও কয়েক গুণ বেশি দুর্গম পেয়েছি। ঈদুল আযহার রাতে আমরা দারুত তামাআয় পৌঁছি। ঈদের দিন সেখানে থাকি। সেখান থেকে রওনা দিয়ে আবার রাজধানী ফাসে পৌঁছি। আমিরুল মুমিনিনের হাতে চুমু খাওয়া এবং তার দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জিত হয়। অনেক দূর-দূরান্ত

সফর সম্পন্ন করে তার প্রশান্তির ছায়ায় আশ্রয় নিই। আল্লাহ তাআলা তার ছায়া আমাদের ওপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত অব্যাহত রাখুন।

***

ভ্রমণবৃত্তান্ত এখানেই সম্পন্ন হলো। ৩ যিলহজ ৭৫৬ হিজরি আজকের এই দিনে লেখা সম্পন্ন হয়। –ইবনে বতুতা

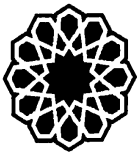

প্রিয় পাঠক! ইতোমধ্যে আপনারা ইবনে বতুতার সফরনামার প্রথম অংশ পড়েছেন। এবার আপনার হাতে দ্বিতীয় অংশ। এই অংশে সাতশো বছর আগের ভারতীয় উপমহাদেশের পাশাপাশি ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া ও চীনের বৈচিত্র্যপূর্ণ আলোচনা উঠে এসেছে। তখনকার উপমহাদেশ ছিল সুলতান মুহাম্মাদ তুঘলকের শাসনাধীন। ইবনে বতুতার মনে এদেশের প্রতি প্রবল অনুরাগ জেগে উঠেছিল। তিনি এখানে থিতু হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন; কিন্তু তুঘলকের প্রবল ও প্রকট শাসনের কারণে তিনি সবসময় ভীত থাকতেন।

ইবনে বতুতার অভ্যাস ছিল, যেখানেই মন লেগে যেত বিয়ে না করে ফিরতেন না। হিন্দুস্তানে এসেও তিনি কয়েকটি বিয়ে করেন। বেশ কয়েকটি দাসীও কিনেন। ঘটনাক্রমে যেসব দাসী ছিল বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর। তিনি মারাঠা ও মালদ্বীপের নারীদের আলোচনা বেশি করেছেন।

ইবনে বতুতার ভ্রমণকাহিনির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, তাকে একজন ভবঘুরে টাইপের মানুষ বলে মনে হবে। বড় বড় শঙ্কাও তাঁর ইচ্ছাপূরণের পথে প্রতিবন্ধক হতে পারেনি। কোথাও তিনি ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেছেন। কোথাও [illegible] শিকার হতে হতে রক্ষা পেয়েছেন। কোথাও ডাকাত ও দস্যুদের কবলে পড়েছেন, কিন্তু শেষতক বেঁচে গেছেন। এতকিছু সত্ত্বেও তাঁর ভ্রমণের ইচ্ছায় একটুও ছেদ পড়েনি। সব প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে সামনে অগ্রসর হয়েছেন। এই গুণটি তাঁর মধ্যে পুরো মাত্রায় না থাকলে আজ ইতিহাসে তিনি এত বড় মর্যাদাপূর্ণ আসন অর্জন করতে পারতেন না।

MAKTABATUL AZHAR
মাকতাবাতুল আযহার

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা,
ঢাকা-১২১২। 01924076365

বাংলাবাজার শাখা-১
১ আন্ডার গ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা। 01715023118

বাংলাবাজার শাখা-২
কওমি মার্কেট, ৬৫/১ প্যারিদাস রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা। 01687183012

www.maktabatulazhar.com

Cover Design : Abul Fatah • 01914783567